প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক: ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ISSN 0971-9792

মানবমন

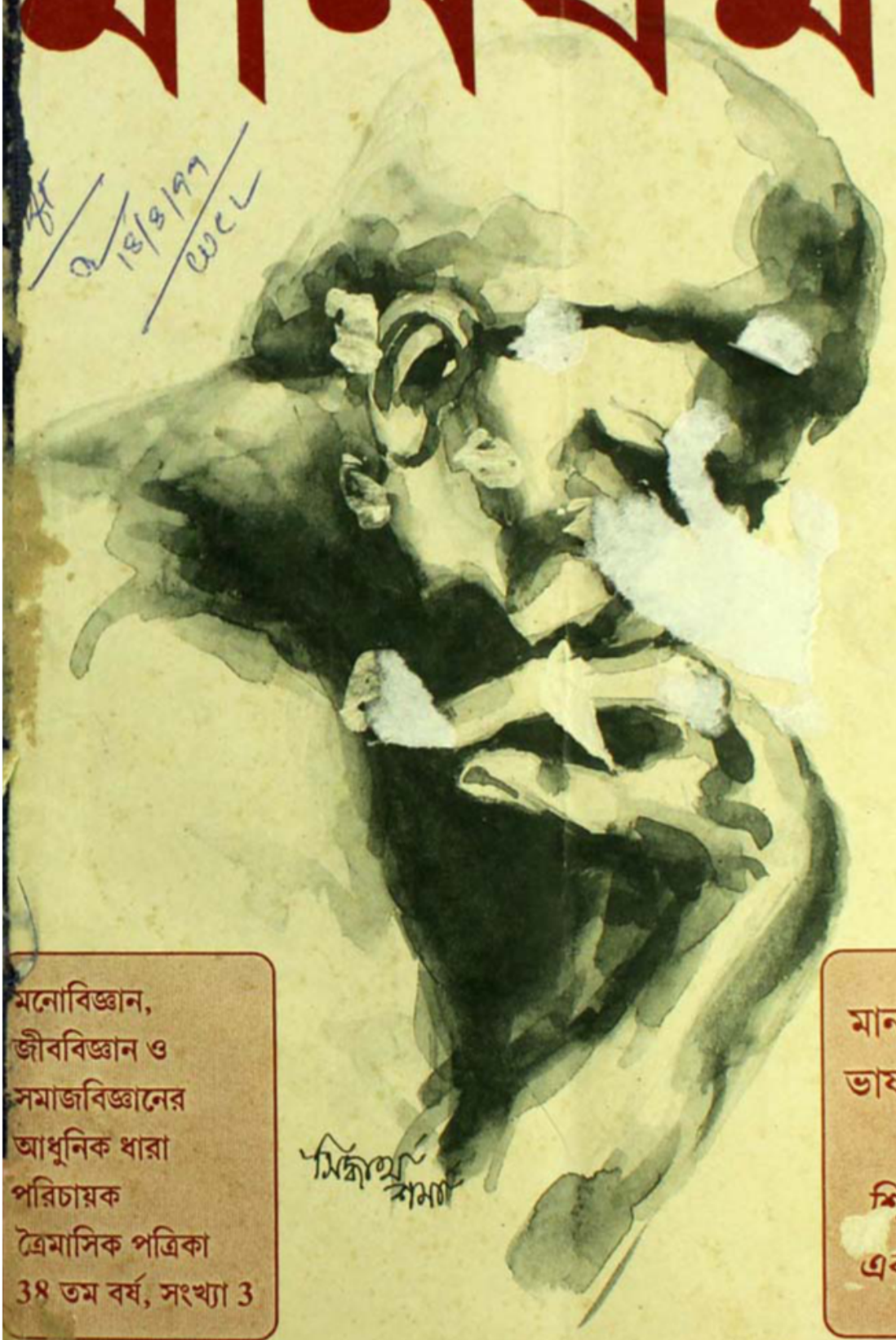

মনোবিজ্ঞান,
জীববিজ্ঞান ও
সমাজবিজ্ঞানের
আধুনিক ধারা
পরিচায়ক
ত্রৈমাসিক পত্রিকা
৩৪ তম বর্ষ, সংখ্যা 3

মানবিক চেতনা
ভাষাবিজ্ঞান চর্চা
আর
শিক্ষাসংক্রান্ত
একগুচ্ছ লেখা

With Best Compliments of :

D.D.PHARMACEUTICALS

Calcutta • Jaipur

Makers of :

D.D. PRAMINE Tablets
Clomipramine HCl B.P. 10/25mg.

D.D. LAM Tablets
Alprazolam USP. 0.25/0.50 & 1 mg.

FLOXIN Tablets
Fluoxettine HCl 20 mg.

NIRA Tablets
Nitrazepan HCl 5/10mg.

সূচিপত্র

● সম্পাদকীয়	—		
● মানবমনের পাঠকসত্তা	—		3
● মানবিক চেতনার স্বরূপ সন্ধানে	—	ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার	5
মানবীয় যোগাযোগ-আচরণের বিবর্তন (2)	—	বাসুদেব মুখোপাধ্যায়	9
● চিত্তবিদের ডায়েরি	—	চিত্তবিদ	12
● রবীন্দ্রনাথ-যদুনাথ শিক্ষাবিতর্ক	—		15
● প্রাথমিক শিক্ষা - একটি সমীক্ষা	—	তাপসী বিশ্বাস	22
● সাক্ষরতার ভাবনা	—	জয়ন্ত ঘোষাল	25
● উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা	—	নির্মলেন্দু নাথ	30
● ছাত্র বনাম শিক্ষক	—	পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	35
● ভাষা : দৃষ্টিহীনের চোখে	—	সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	40
● পুস্তক আলোচনা	—		42
● মনোজগৎ - প্রশ্নোত্তর	—		44
● চিঠিপত্র	—		46

নিয়মাবলী

1. মানবমন ত্রৈমাসিক পত্রিকা। জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।
2. প্রতি সংখ্যা দশ টাকা। বিশেষ বইমেলা সংখ্যা কুড়ি টাকা। বার্ষিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সডাক পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দেয়। বছরের যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
3. চেক কেবলমাত্র কলকাতার জন্য। ড্রাফট, মনিঅর্ডার ইত্যাদি PAVLOV INSTITUTE & HOSPITALS অথবা MANABMON-এর নামে প্রদেয়।
4. এজেন্সি বা ব্যবসা সংক্রান্ত শর্তাদির জন্য কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। কমিশন 25%। অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি খরচ না দিলে গ্রাহকদের কাগজ বুকপোস্টে পাঠানো হয়।
5. দূষিত, অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

রেজিস্টার্ড অফিস
পাভলভ ইনস্টিটিউট
132/1A, বিধান সরণী,
কলকাতা—700 004

কার্যালয়
পাভলভ মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার
98, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—700 007
ফোন : 241-2935 (সকাল দশটা থেকে রাত্রি আটটা)

সম্পাদকের দায়িত্ব, পাঠকের দায়

মানবমনের পাঠকরা মানবমনের লেখার বিষয় নিয়ে নানা মতামত ব্যক্ত করেন। কেউ বলছেন পত্রিকা তার চরিত্র হারাচ্ছে, কেউ বলছেন পত্রিকা আরও সহজ হওয়া উচিত, লেখাগুলি বড় দুর্বোধ্য। কেউ বলছেন মন নিয়ে লেখা বড় কম থাকছে, আবার কেউ বলছেন এ যুগে এমন পত্রিকার কোন দাম নেই, কেননা লোকের পড়াশোনার অভ্যাসই কমে গেছে। আবার কারো কারো অভিমত, মানবমনকে মানসিক স্বাস্থ্য পত্রিকায় রূপান্তরিত করা উচিত - যা আজকের যুগের দাবি। এমন অসংখ্য মতামতের মাঝে পড়ে আমরাও একটু নড়েচড়ে বসছি, ভাবনাচিন্তা করছি আমাদের অক্ষমতা ও ভুল-ত্রুটিগুলো নিয়ে। যেমন অনেকে অভিযোগ জানিয়েছেন পত্রিকায় অসংখ্য ছাপার ভুল থাকে। আমরা এ ব্যাপারে সচেতন এবং আমরা এই ছাপায় ভুল অবশ্যই সংশোধন করবো।

এবার মানবমনের বিষয় ও চরিত্র নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন যাতে পত্রিকা সম্পর্কে পাঠকরা একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারেন। এই পত্রিকার প্রাণপুরুষ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করেছি, এই ধরণের একটি পত্রিকা মাতৃভাষায় বার করার কথা উনি কেন ভেবেছিলেন। উনি খুব সহজ সরলভাবে বলতেন, এখানকার এগিয়ে থাকা বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সবাই কম্যুনিস্ট, কিন্তু সমাজবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তাভাবনাকে বাদ দিয়ে যাঁরা নিজেদের অগ্রগামী বাহিনী বলে দাবী করেন, তাঁরা একাজটা করবেন কি ভাবে? তাই মনে হল আমরা একটা কাজ করতে পারি, সমাজকে বদলে দেবার কথা যাঁরা ভাবছেন সেই অগ্রগামী বাহিনীর হাতে অস্ত্র তুলে দিতে পারি, যাতে তাঁদের কাজটা সুসাধ্য হয়ে যায়। আর লেনিনের কাছে আমরা শিখেছিলাম, একটা পত্রিকা একটা সংগঠনের ভূমিকা পালন করতে পারে। মনের কাজটা পাভলভ ল্যাবরেটরিতে পরিমাণগত পরিমাপ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, আমাদের দায়িত্ব সেটা ব্যক্তিমনে প্রয়োগ করে দেখানো। তাই এই পত্রিকা।

আশা করছি পুরানো পাঠকরা প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের এই ভাবনাচিন্তাকে বুঝতে পারছেন। নতুন পাঠকদের কাছে কোন মানুষের এমন জীবন-আদর্শ বাতুলতা মনে হতে পারে। কিন্তু সবিনয়ে জানাচ্ছি, আজও মানবমনের অন্তরের এই আদর্শে এতটুকু চিড় ধরেনি, শুধু সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটা পাল্টেছে। অর্থাৎ আজ আর অগ্রগামী বাহিনী বলে আলাদা করে কাউকে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব কাজ। তাই আমাদের পাঠকদের কাছে নিবেদন এই যে, সামাজিক পরিবর্তনের গতিমুখ যে দিকেই থাক, এই প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য এবং একে আরও উন্নত স্তরে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য মানবমন যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তার জন্য বহু জটিল ও দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করতেই হবে—সেটা মানবমনের দায়বদ্ধতারই অঙ্গ।

আমরা যখন আমাদের আদর্শের দায়বদ্ধতা ঘোষণা করছি তখন আমরা দাবি করবো আমাদের পাঠকরাও কিছু দায়বদ্ধতা পালন করবেন। যেমন, মানবমনের লেখার ভাষা দৈনিক সংবাদপত্রের ভাষা থেকে আলাদা হবে, সুতরাং অসুবিধা হলেও তা কষ্ট করে পড়তে হবে—দরকার হলে পড়ার মাঝে অভিধানও দেখতে হতে পারে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে মানবমন বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার পত্রিকা এবং এ যুগটা বিজ্ঞানের, সুতরাং বিজ্ঞানের আধুনিকতম চিন্তা-ভাবনাগুলি মোটেই সহজ সরল হবে না। কাজেই সেসব ভাবনাচিন্তাকে কষ্ট করে বারবার পড়ে বুঝে ওঠার চেষ্টা তাঁরা করবেন, এমন দাবি আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি। কেননা যিনি এ পত্রিকায় কিছু লেখেন তিনি অনেক খেটেখুটে, বিনা পারিশ্রমিকে, অর্থাৎ আপাত কোন পাওনা ছাড়াই এ কাজটা করেন। পাঠকের পরিশ্রমী মনোযোগই তাঁর একমাত্র পাওনা।

তবে আমরা এমন দাবি স্বভাবতই করছি না যে আমাদের কোন ভুল ত্রুটি হবে না, সবসময় আমরা সঠিক কাজটা করে যাবো। এটাও আমাদের পাঠকদের দায় যে তাঁরা আমাদের ভুল ত্রুটি দেখলে তা সংশোধনের জন্য জানাবেন। আশা করছি মানবমনের দায়িত্বশীল পাঠকরা এই সামান্য দায়টুকু বহন করবেন।

মানবমনের পক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্বশীল পাঠকদের জানাচ্ছি, সমাজের ঝড়ঝঞ্ঝা জোয়ারভাটার মধ্যে বাতিঘরের আলোর মত মানবমনের আলো আমরা জ্বালিয়ে রাখবো।

এ সংখ্যার মানবমন *বিশেষ শিক্ষা সংখ্যা* হবে এইরকমই আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাল লেখার অভাবে এ সংখ্যা সম্পর্কে এমন দাবি আমরা করছি না। তবে পরের সংখ্যা *বিশেষ পাভলভ সংখ্যা*-ই হবে।

মানবমনের পাঠকসভা

সকলে যে কষ্টস্বীকার করে এসেছেন এই কথা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে জানিয়ে সম্পাদক আলোচনা শুরু করেন পাঠকসভা আয়োজনের উদ্দেশ্য দিয়ে।

গত 13ই জুন রবিবার বিকাল তিনটেয় কলকাতার মৌলালির কাছে জর্জভবনে মানবমনের পাঠকসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। চিঠি পেয়ে, মুখের কথায় প্রায় পঁয়ত্রিশ জন পাঠক উপস্থিত হয়েছিলেন। আলাপচারিতার পর্ব শুরু হতে সকলেই জানালেন মানবমন, পত্রিকা পড়ে আকৃষ্ট হয়ে তারা এই পত্রিকার সহমর্মী। অবশ্য পুরানো পাঠকদের সবাই স্বীকার করলেন যে কোন না কোনভাবে তাঁরা এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসেছেন। দীর্ঘদিন তাঁরা পত্রিকা পড়ছেন ও পত্রিকার নানা পর্যায়ের সাক্ষী। কেমন করে ডাঃ গাঙ্গুলি বহু বড় ঝঞ্ঝার মধ্যে পত্রিকাটির একটি সংখ্যার প্রকাশও বন্ধ হতে দেননি, পত্রিকাটি টিকিয়ে রেখেছেন সে কথাও তাঁরা জানালেন।

সম্পাদক জানালেন পত্রিকার আর্থিক অবস্থা এখন খারাপ নয় যা কিছুকাল আগেও ছিল। কিন্তু সমস্যা প্রধানতঃ দুটি বিষয় নিয়ে : ভালো লেখা পাওয়া ও প্রান্তীয় বিভিন্ন স্থানে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া। এছাড়া ঠিক কি ধরনের লেখা পত্রিকায় ছাপা হবে এই নিয়েও নানা বিতর্ক রয়েছে। এই সব কিছু নিয়ে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানাই এই আলোচনাসভার উদ্দেশ্য।

এরপর পত্রিকার প্রকাশক পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে বলেন এই পত্রিকার প্রচার না থাকার জন্য আমাদের ভাবতে হবে এতদিনের একটি পুরানো চেনা নামের পত্রিকা সম্পর্কে কেন মানুষ জিজ্ঞাসা করেন — মানবমন কি এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকা নিয়মিতভাবে মানুষের কাছে না পৌঁছালে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। এরজন্য আমরা পাঠকদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। কেন না তাঁরা আমাদের জানাবেন কোথায় কোথায় পত্রিকা পৌঁছে দিলে মানুষ হাতের কাছে একে পেতে পারেন।

আলোচনায় অংশ নেন প্রবীন পাঠক সত্যপ্রিয় ঘোষ। তিনি জানান এই পত্রিকাকে ঘিরে কেমন করে বাংলার বহু বিদগ্ধ মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে ডাঃ গাঙ্গুলির নাটকগুলির কথাও তিনি জানান যার অভাবনীয় সাহিত্যগুণ রয়েছে। মঞ্চস্থ করতে পারলে এই নাটকগুলি থেকে বর্তমান প্রজন্ম সামাজিক মানসিক বহু সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত পেত। মানবমনের অসংখ্য ছাপার ভুল সম্পর্কে তিনি সম্পাদককে মনে করিয়ে দেন যে দরকার হলে এই বয়সেও তিনি প্রুফ দেখার কাজটা করে দিতে পারবেন।

এসেছিলেন প্রখ্যন সাহিত্যিক শরৎ মুখোপাধ্যায়। তিনি সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশ নেন। তিনি বলেন মানবমন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ হয়ে আছে বহুদিন ধরে তাই পত্রিকাটিকে ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর অভিমত 'মন' সম্পর্কে আরও-বেশি আলোচনা থাকা প্রয়োজন কেননা আজকের মানুষ তাঁর শরীর ও মন কি করে ঠিক থাকবে এটা জানতে ভীষণ আগ্রহী। মনের স্বাস্থ্য রক্ষা, মনের চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে তোলাই মানবমনের আদর্শ হওয়া উচিত। প্রয়োজন হলে পাণ্ডিত্যের প্রকোষ্ঠ থেকে মানবমনকে বেরিয়ে আসতে হবে।

অন্য অনেকেই বলেন মানবমন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মুখপত্র হবার সংকীর্নতায় যেন না ভোগে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদক আলোচনা করেন ডাঃ গাঙ্গুলি এই পত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কোন উদ্দেশে। সমাজকে আমূল পাল্টে দেবার স্বপ্ন যাঁরা দেখতেন তাদের হাতে অত্যাধুনিক মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অস্ত্র তুলে দেবার জন্য, যাতে তাঁরা আরও ভালোভাবে সমাজ বদলাবার কাজটা করতে পারেন। কিন্তু এখন তেমন কোন সমাজপরিবর্তনের উৎসাহী গোষ্ঠী নেই কিন্তু সমাজের সমস্যাগুলি পাল্টায়নি। তাই যারা এ ব্যাপারে ন্যূনতম আদর্শ পোষণ করেন মানবমন তাঁদের সহযোদ্ধা হয়ে কাজ করবে।

মানবমন নামের মধ্যে 'মন' থাকায় অনেকেই বলেন পত্রিকায় লেখাগুলির মধ্যে মনোবিজ্ঞানের প্রাধান্য বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর লেখা আরও বেশি বেশি করে থাকা উচিত। প্রকাশক বললেন পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন মতের সমাবেশের কথা। তাঁরা যে এইসব মতামতগুলিকে একটা সূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করছেন এ কথাও তিনি জানালেন। তবে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেন পত্রিকার নিজস্ব কিছু পাঠকীয় কেন্দ্র গড়ে তোলার ওপর যার ওপর ভিত্তি করে পত্রিকা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা

করে চলবে : ফলে মানবমনের স্পন্দন আমাদের পাঠকরা পাবেন এবং আমারাও পাঠকদের ফিডব্যাক পাবো। একমাত্র তাহলেই পত্রিকা জীবন্ত হয়ে উঠবে। এই পত্রিকায় ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা নিয়ে নানান মতান্তরের কথাও তিনি উল্লেখ করেন এবং বলেন পত্রিকা সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা উচিত।

পত্রিকায় ভাল লেখা পাওয়ার সমস্যার জন্য কেউ কেউ প্রস্তাব দেন পারিশ্রমিক দিয়ে লেখা জোগাড় করার ওপর। এতে কেউ কেউ আদর্শের জায়গা থেকে আপত্তি তোলেন যে এই পত্রিকায় যদি কেউ ভালবেসে নিজের মনে করে না লেখেন তাহলে সে লেখা আমাদের পত্রিকার উপযোগী হবে না, তা হবে বাজারী প্রফেশনাল লেখা - এটা আমরা মোটেই চাই না। শরৎবাবু প্রস্তাব দেন অনেকে লিখতে পারেন না কিন্তু ভালো বলতে পারেন। সুতরাং তাদের সাক্ষাৎকারগুলি গুছিয়ে লেখা তৈরি করা যেতে পারে যাতে সবদিক রক্ষা পাবে।

পত্রিকাটির আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য এক একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে এক একটি বিশেষ সংখ্যা করার প্রস্তাবও কেউ কেউ দেন। সেই প্রস্তাব যে ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে সে কথা সম্পাদক জানান। কেউ একে মাসিক পত্রিকা করারও প্রস্তাব দেন।

সবাই একটি ব্যাপারে একমত যে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা যেন পুঁথিগত না হয় তাহলে পাঠকপাঠিকাদের আগ্রহ আরও বাড়াবে। মানুষ আজও ভালো লেখা, সিরিয়াস লেখা, প্রয়োজনীয় লেখা পড়তে চায় জানতে চায়।

আলোচনার শেষে সম্পাদক সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সন্ধ্যা ছ'টায় সভা শেষ হয়।

মনোরোগ ও মনোরোগীদের কথা

ডা: বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

অন্যমন

দাম 25 টাকা

মনোরোগের সামাজিক সচেতনতা নিয়ে একমাত্র বাংলা বই

পাভলভ ইনস্টিটিউট সংকলন

মনোরোগ ও আমাদের কর্তব্য

দাম 25 টাকা

বিজ্ঞান ও হিউম্যানিটিজ-এর সম্পর্ক নিয়ে একমাত্র বাংলা বই

আশীষ লাহিড়ীর

সংস্কৃতির দ্বিখণ্ডন

দাম 25 টাকা

সামনের বইমেলায় আমাদের নতুন বই

ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের

গ্রামীণ স্বাস্থ্য

ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নানা লেখা

আশীষ লাহিড়ীর

কার্ল পপার

মানবিক চেতনার স্বরূপ সন্ধানে

ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার

পঞ্চম পর্ব

প্রাণীগত বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ

[বস্তুবিক-ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এ'পর্যন্ত যা বলেছি তা সংক্ষেপে এরকম : বস্তু-জাগতিক প্রতিক্রিয়া- ধর্মিতা → আদিম প্রাণীগত উত্তেজনধর্মিতা → সংবেদনতার ক্রমবিকাশ → প্রত্যক্ষণগত চৈতন্যের বিকাশ → অভ্যাসলব্ধ ক্রিয়া এবং স্মৃতিশক্তির উন্মেষ।। বর্তমান পর্বে আমরা প্রাণীগত বুদ্ধিবৃত্তির পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে প্রবেশ করছি।]

1. উন্নততর প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট

পূর্ববর্তী (4র্থ) পর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি — কীভাবে পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে — বিশেষ করে চতুষ্পদ প্রাণীদের ক্ষেত্রে, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়গুলোর বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে গুরুমস্তিষ্কের উন্নতির মাধ্যমে, প্রত্যক্ষণ-ক্ষমতা ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। বস্তুত, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার সাহায্যে অভ্যাসলব্ধ-ক্রিয়া এবং স্মৃতিশক্তি বিকাশের অধ্যায়টি উন্নততর প্রত্যক্ষণের পর্বেই সম্ভব। অধিকাংশে স্তন্যপায়ী প্রাণীর চৈতন্য এই পর্বেই রয়ে গিয়েছে। এর পরের পর্বটি হল — প্রাণীগত বুদ্ধিবৃত্তির স্তর। কিন্তু, সেই পর্বের বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে-আসলে যাওয়ার জন্যেই — উন্নততর প্রত্যক্ষণধর্মী প্রাণী চৈতন্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট সম্পর্কে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলা দরকার :

সংবেদনগত চৈতন্যের পর্যায় থেকে প্রত্যক্ষণগত চৈতন্যের পর্যায়ে উত্তরণের ক্ষেত্রে মূলত যে পরিবর্তনটি ঘটেছে সেটি হল — বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে পৃথগীকরণ (ডিফারেনসিয়েশন) এবং একই জাতীয় বিষয়বস্তুগুলোকে নিয়ে সামান্যীকরণ (জেনেরালিজেশন) সংক্রান্ত ক্ষমতার ক্রমবিকাশ। এভাবেই, প্রাণীগত অভিজ্ঞতা এবং ক্রিয়াকর্মের সমন্বয়ে — বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়বস্তুগুলোর সাধারণ সমন্বয়ে — বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়বস্তুগুলোর সাধারণ গুণগুলোকে 'ছেঁকে নিয়ে' তাদের সম্বন্ধে ক্রমশ সরল থেকে জটিল প্রতিরূপ-গঠন সম্ভব হয়ে উঠেছে।

এইভাবে ক্রমশ উন্নত পর্যায়ে উত্তীর্ণ-হওয়া প্রাণীদের মধ্যে বাস্তব জগতের যে-ধরণের উন্নততর প্রতিফলন ঘটেছে, তার মধ্যে —নানা রকম পরস্পর - সংবদ্ধ দ্বৈত প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় : একদিকে—বস্তুগতভাবে সমতুল্য একটি পরিস্থিতির থেকে অনুরূপ অন্য একটি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বিশিষ্টক্রিয়ার সঞ্চার (ট্রান্‌স্‌ফার) ঘটে। আরেকদিকে—সব বিশিষ্ট ক্রিয়াগুলোর বারাবাহিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পৃথগীকরণ - সামান্যীকরণের দ্বৈত-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে — বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এক একটা প্রতিরূপ যা "প্রতিচ্ছবি" গড়ে ওঠে। বাস্তব পরিবেশের মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন ঘটার ফলে, আগে-থেকে আয়ত্ত-করা কর্মকৌশলের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে, এবং তারই মধ্যে দিয়ে প্রতিরূপগুলোও নানা ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সে জন্যই উন্নততর প্রাণীরা পরিবেশের রদবদলের সঙ্গে তাদের আচরণকে নোতুন-নোতুন উপায়ে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

পৃথগীকরণ এবং সামান্যীকরণের—অর্থাৎ, বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের — এই যুগ্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ল্যাজ-বিহীন নর-বানর গোষ্ঠীর মতো অনেক বেশি উন্নত প্রাণীদের মধ্যে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তির উদ্ভব ঘটতে পেরেছে।

2. নর-বানর গোষ্ঠীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ

প্রাইমেট বর্গের, অর্থাৎ বানরজাতীয় সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষণগত চৈতন্য—অন্যান্য উন্নততর প্রাণীদের চেয়েও অনেক বেশি বিকাশ লাভ করেছে। তার কারণ, মূলত বৃক্ষবাসী হওয়ার ফলে, গাছ-থেকে-গাছে লাফিয়ে বেড়ানোর প্রক্রিয়ায় — প্রথমত, এদের দৃষ্টিশক্তি আর পর্যবেক্ষণক্ষমতা বংশপরম্পরায় বেড়ে গিয়েছে, এবং সামনের পা-দুটোকে এরা অনেকটাই হাতের মত ব্যবহার করতে পারে।

এই বর্গের অন্তর্গত 'পংগিডাই' পরিবারের সদস্যেরা — ওরাংওটাং এবং গিবন প্রজাতির প্রাণীরা — সকলেই লাঙ্গুলবিহীন। সেজন্যই এদের "হাতের কাজ" অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে, সাধারণভাবে এদের — নরবানর বা 'এপ' আখ্যা দেওয়া হয়। 'অ্যান্থ্রোপয়েড এপ' বা 'নরাকৃতি বানর' বলেও এরা পরিচিত। এদের মধ্যেই 'বুদ্ধিবৃত্তি' জাতীয় শক্তিটি বিকাশ লাভ করেছে। অবশ্য, এদের 'ইনটেলেক্ট' বা বুদ্ধিবৃত্তিকে বিজ্ঞানীরা — "কাবিক চিন্তন" বা "ম্যানুয়্যাল থিংকিং" আখ্যা দিয়েছেন। কারণ — পরে আমরা বিশদভাবে দেখাব — মানুষের যুক্তিবুদ্ধি বা রিজন-এর সঙ্গে এইসব প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তির একটা গুণগত পার্থক্য রয়েছে। আপাতত, আমরা এই প্রাণীগত বুদ্ধি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেবার জন্যে বলে নিচ্ছি : এই রকম বুদ্ধি হল নোতুন - নোতুন অজানা পরিস্থিতিতে নানারকম সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতা। একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার : এভাবে সমস্যাসমাধানের কাজগুলো করার ব্যাপারে আলোচ্য প্রাণীরা আগে থেকে কিছু শেখেনি। অর্থাৎ এই সব সমস্যা সমাধানের কাজগুলোকে শিক্ষনলব্ধ বা অভ্যাসজাত কাজকর্ম বলা যাবে না। এর বেশি বিশ্লেষণে এখুনি না-গিয়ে কতক গুলো উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে।

3. শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

নরবানরদের মধ্যে শিম্পাঞ্জিরা হল মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি, এবং এরা সহজেই পোষ মানে। সে কারণেই এদের নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

গেস্টাল্ট সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সদস্য, ভোল্‌ফ্‌গাং কোয়েলারই সর্বপ্রথম — সুশৃঙ্খলভাবে শিম্পাঞ্জিদের শিক্ষণ (লার্নিং) সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে, এদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি-জাতীয় একটা ক্ষমতার কথা দাবী করেন। তাঁর গেস্টাল্টপন্থী ব্যাখ্যার যাবার আগে আমরা প্রথমে একটা সরল পরীক্ষণের বিবরণটি বর্ণনা করে নিচ্ছি :

একটি প্রাপ্তবয়স্ক শিম্পাঞ্জিকে — বেশ খানিকটা ক্ষুধার্ত অবস্থায় — একটা খাঁচার আটকে রাখা হল। খাঁচার বাইরে — এমন একটা দূরত্বে কলা বা আপেল ঝুলিয়ে রাখা হল, যে-পর্যন্ত শিম্পাঞ্জির হাত পৌঁছোয় না। কিন্তু খাঁচার মধ্যে এমন একটা মাঝা - বাঁকানো লাঠি রেখে দেওয়া হল, যেটা দিয়ে খাবারের নাগাল পাওয়া যায়।... প্রথম দিকে শিম্পাঞ্জিটি খাঁচার শিকের মধ্যে দিয়ে হাত বের করে ফলগুলো ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে রইল।...তারপর, খাঁচার মধ্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে লাঠিটা দেখতে পেল এবং সেটা তুলে নিয়ে ফলগুলোর দিকে বাড়িয়ে দিল। এভাবে দু-একবার চেষ্টা করেই সে একটি একটি করে ফল খাঁচার মধ্যে টেনে নিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করল।...

এই ধরনের পরীক্ষণের ক্ষেত্রে যে সাধারণ নীতিটি গৃহীত হয়েছে, সেটা হল এ'রকম : এ'সব পরীক্ষণে শিম্পাঞ্জি প্রভৃতিকে দিয়ে যে সমস্ত সমস্যা সমাধান করাতে চাওয়া হয়েছে, সেগুলি এমনই যে — সমাধান সূত্রটি দেওয়া থাকলেও, বারবার চেষ্টা এবং আকস্মিকভাবে ভুল সংশোধনের মাধ্যমে যান্ত্রিকভাবে সমাধানটি বেরিয়ে আসছে না, এবং এ'সব ক্ষেত্রে আগে থেকে বিশেষ কিছুই শেখানো হচ্ছে না। যেমন, আরেকটু জটিল একটি পরীক্ষণে : একটা বেশ উঁচু ঘরের ছাদ থেকে ফলগুলো এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, যাতে শিম্পাঞ্জিরা লাফিয়েও সেগুলো ধরতে পারে না। ঘরের এককোণে এমন মাপের একটা খালি কাঠের বাক্সো রাখা ছিল, যার ওপর উঠলেই ফলগুলো পেড়ে আনা যায়। এ'ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে : খানিকক্ষণ লাফালাফি করে শিম্পাঞ্জি এদিক ওদিক তাকিয়ে বাক্সোটা ফলগুলোর ঠিক নীচে টেনে নিয়ে এসে, তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সমস্যাটি সমাধান করতে পেরেছে।....

এই সব পরীক্ষণের বেলায় শিম্পাঞ্জির মতো উন্নততর মনুষ্যেতর প্রাণীরা ঠিক কী ধরণের নোতুন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, সেটা বোঝার জন্য আমরা— ইঁদুর, বেড়াল প্রভৃতিকে নিয়ে দুটি পরীক্ষণের বর্ণনা করছি।

4. থর্নডাইক-এর পরীক্ষণ এবং তাঁর শিক্ষণ - তত্ত্ব

গেস্টাল্ট - পন্থীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনেক আগেই মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ই. এল. থর্নডাইক ইঁদুর, বেড়াল প্রভৃতি প্রাণীদের নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষণ পরিচালনা করে "চেষ্টা এবং ভুল সংশোধনের তত্ত্ব" (থিওরি অব্ ট্রায়াল অ্যাণ্ড এরর্) প্রচার করেছিলেন. দুটো পরীক্ষণ-কার্য বর্ণনা করলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে:

(ক) খাদ্য ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কাঠের 'পাঁচিল' দিয়ে ঘেরা এমন একটা গোলক ধাঁধা (মে-জ/maze) বানানো হল, যার প্রারম্ভিক কক্ষ থেকে খাদ্য-কক্ষে পৌঁছোতে হলে যে কোনো গোলকধাঁধার মতো একটাই মাত্র পথ আছে। এই পরীক্ষণ যন্ত্রটি কাঁচ বা জাল দিয়ে এমনভাবে ঢাকা ছিল, যাতে ইঁদুরের পক্ষে লাফিয়ে খাবারের কাছে যাওয়া সম্ভব হয় নি, এবং ওপর থেকে তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা গিয়েছে।

খাদ্য-কক্ষে বেশ গন্ধযুক্ত খাবার রেখে, একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে প্রারম্ভিক কক্ষে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। খাবারের গন্ধ পেয়ে ইঁদুরটি — এক - একবার এক-একটি পথ দিয়ে ছুটতে লাগল, কিন্তু বারবার বাধা পেয়ে আবার প্রারম্ভিক কক্ষে ফিরে এলো। এইভাবে চেষ্টা করতে করতে এবং ভুল করতে করতে — একবার হঠাৎই সে সঠিক পথ ধরে খাদ্য - কক্ষে পৌঁছোতে পারল। এবং খাবার খেলো।

একদল ইঁদুরকে নিয়ে বারবার পরীক্ষা চালিয়ে থর্নডাইক দেখেছিলেন — এবং পরবর্তী কালে অন্যান্য অনেক প্রাণী-মনোবিজ্ঞানীও প্রমাণ পেয়েছেন—যে : একটি ইঁদুরকে বারবার একই গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করলে, শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ইঁদুরটি খাদ্য-কক্ষে পৌঁছোবার সঠিক পথটি 'চিনে ফেলেছে', অর্থাৎ, সঠিক জায়গায় পৌঁছোনোর কৌশলটি সে শিখে ফেলেছে। প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল — এই সঠিক কর্মকৌশলটি সম্পর্কে ইঁদুরের এক ধরণের কার্মিক স্মৃতিশক্তি (অপারেশন্যাল মেমরি) গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, একই গোলক - ধাঁধার পথ চিনে ফেলার পর — সে আর ভুল না করে , একেবারেই সঠিক জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে; এবং তার চলার গতিও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। উপরন্তু, একটি বিশেষ গোলক ধাঁধার সঠিক পথ 'চিনে - ফেলার' পর — অন্যান্য ধাঁচের গোলকধাঁধার ক্ষেত্রে সে ক্রমশ দ্রুতগতিতে সঠিক পথে চলা শিখে ফেলে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে — একটি ক্ষেত্র থেকে আরেকটি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট- ক্রিয়ার সঞ্চার (অপারেশন্যাল ট্রান্সফার) ঘটছে।

(খ) বেড়াল নিয়ে পরীক্ষণটি আরেকটু জটিল। সেক্ষেত্রে একটি পোষা বেড়ালকে এমন একটি বড়ো-সরো খাঁচায় আটকে রাখা হল, যার দরজা খোলার একমাত্র উপায় হল — একটি স্প্রিং-যুক্ত লিভারের ওপর চাপ দেওয়া এবং লিভারটি খাঁচার গায়ে প্রায় লেগে আছে বলে সহজে সেটা খাঁচার শিকগুলো থেকে আলাদা করে বোঝা যায় না।.... খাঁচার বাইরে বেড়ালের প্রিয়-খাদ্য মাছ বা দুধ রাখা হল। ক্ষুধার্ত বেড়ালটি ছটফট করে খাঁচার মধ্যে ঘুরতে লাগল ; এবং স্বভাব-সিদ্ধ বলেই সে বারবার খাঁচার শিকগুলোর গায়ে আঁচড়াতে লাগল। এই ধরণের চাল-চলনের ফলে — হঠাৎ একবার লিভারের ওপর চাপ পড়ল এবং খাঁচার দরজা খুলে গেল। তখন সে বেরিয়ে এসে খাবার খেতে সমর্থ হল।.... এইভাবে একই খাঁচায় একটি নির্দিষ্ট বেড়ালকে আটকিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে যে — শেষ পর্যন্ত ঐ বেড়ালটি আর লাফালাফি না করে, একেবারেই লিভারে চাপ দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে পারছে। তার মানে — সে দরজা খোলার কায়দাটি শিখে ফেলেছে।

থর্নডাইক — এবং তাঁর সমর্থক পরবর্তীকালের আচরনবাদীরা— দাবী করেছেন : সমস্ত প্রাণীর শিক্ষাই এভাবে বারংবার চেষ্টা এবং ক্রমাগত ভুলসংশোধনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়, তাঁদের মতে এ'সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রচেষ্টাগুলোর পেশীগত প্রক্রিয়ার "মুদ্রণ" গুরুমস্তিষ্কের চেষ্টাকেন্দ্রগুলো থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়, এবং সফল প্রচেষ্টাগুলোর 'ছাপ' ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠে।...

কিন্তু, ইঁদুর-বেড়াল প্রভৃতি আপেক্ষিকভাবে নিম্নস্তর প্রাণীদের শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব যথেষ্ট সার্থক হলেও, শিম্পাঞ্জিদের সমস্যা-সমাধানের উদাহরণগুলো তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। কেন পারে না —সেকথা বোঝার জন্যে আমরা তাদের নিয়ে পরিচালিত পরীক্ষণগুলোকে বিশ্লেষণ করে — প্রাণীগত বুদ্ধিবৃত্তির বৈশিষ্ট মূলক লক্ষণগুলো কর্ণনা করব।

5. প্রাণীগত বুদ্ধিবৃত্তির বৈশিষ্ট

ক. ইঁদুর-বেড়াল প্রভৃতিদের নিয়ে যে-সব পরীক্ষা করা হয়েছে সেগুলোর ফলাফলের সঙ্গে শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে পরিচালিত পরীক্ষণগুলোর ফলশ্রুতির প্রথম পার্থক্য হল এই যে : আগেকার ক্ষেত্রে বারবার চেষ্টা-এবং-ভুল-সংশোধনের মধ্যে দিয়ে সাফল্য অর্জিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — প্রথম দিকে আসে শুধুই ব্যর্থতা, তারপর একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা ; অবশেষে যেন আকস্মিকভাবেই শিম্পাঞ্জিরা এমন একটা বিশিষ্ট-কর্ম (অপারেশান) পেয়ে যায়, যার সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবেই সাফল্য আসে। এটাই হল প্রাণীগত বুদ্ধিবৃত্তির প্রথম বৈশিষ্ট।

খ. দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হল এই যে : প্রথম বারের সাফল্যের পরে, কিছুটা সময়ের ব্যবধানে যখন আবার অনুরূপ সমস্যা দেওয়া হয় তখন কোনো পূর্বগামী প্রচেষ্টা ছাড়াই শিম্পাঞ্জিরা একেবারেই সমস্যার সমাধান করে ফেলে।

গ. উপরন্তু, এটাও দেখা গিয়েছে যে : এক ধরণের সমস্যা সমাধান করার পর, কিছুটা অন্যরকম সমস্যা দিলে — প্রথম ক্ষেত্র থেকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশিষ্ট-ক্রিয়ার সঞ্চার (ট্রান্সফার অব্ অপারেশান) ঘটে। যেমন —

(1) লাঠি দিয়ে খাবার টেনে আনার কায়দাটা যে শিম্পাঞ্জি রপ্ত করেছে, তাকে এমন একটা সমস্যা দেওয়া হল যেখানে ঝোলানো - ফলগুলোর দূরত্ব বেশি ; এবং একটার বদলে এমন দুটো ফাঁপা অ্যালুমিনিয়াম টিউব খাঁচার মধ্যে রাখা হল, যাদের একটার মধ্যে আরেকটা সামান্য ঢোকালেই আঁট হয়ে বসে। এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে —শিম্পাঞ্জিরা আগেকার অভিজ্ঞতার স্মৃতির ভিত্তিতে প্রথমে আলাদাভাবে পরপর দুটো টিউব দিয়ে ফলগুলো টানার চেষ্টা করে ; কিন্তু ব্যর্থ হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে টিউবদুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করে ; তারপর যেন হঠাৎ দুটোকে জোড়া দিয়ে ফলগুলো টেনে নিয়ে এসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

এভাবে ফাঁপা টিউবগুলোর সংখ্যা একটা সীমা পর্যন্ত বাড়িয়েও একই ফল পাওয়া গিয়েছে। তাই আমরা সমগ্র প্রক্রিয়াটির স্বরূপ একটু যান্ত্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে বলতে পারি : এসব ক্ষেত্রে — প্রথমে প্রায় একই রকম পরিস্থিতির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে সামান্যীকরণ ঘটেছে ; কিন্তু পরে অনুরূপ পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য ধরা পরেছে, অর্থাৎ পৃথগীকরণ করা হয়েছে ; অবশেষে নোতুন প্রক্রিয়া 'উদ্ভাবনের' মধ্যে দিয়ে উন্নত স্তরের সামান্যীকরণ ঘটেছে (কারণ, মূলত একই ধরণের কাজ করা হয়েছে)। [ফর্মুলার আকারে দেখানো যায় : সামান্যীকরণ$_1$ - পৃথগীকরণ - সামান্যীকরণ$_2$। দ্বন্দ্ববিজ্ঞানের ভাষায় এটা হল — বিরোধের মধ্যে দিয়ে স্পাইরাল অগ্রগতি।]

বিশিষ্ট- ক্রিয়ার এ'ধরণের সঞ্চার অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রেও পাওয়া গিয়েছে : যেমন — বাক্সোর ওপর দাঁড়িয়ে উঠে সিলিং থেকে ঝোলানো ফল পাড়ার পরীক্ষণে — একটার বদলে দুটো ছোট-বড়ো বাক্সো রেখে দেখা গিয়েছে - পর-পর দুটো বাক্সে উঠে ফলের নাগাল না পেয়ে শিম্পাঞ্জিরা শেষ পর্যন্ত একটার পর আরেকটা বাক্সো চাপিয়ে ফলের নাগাল পেয়ে গিয়েছে।... বিশিষ্ট-ক্রিয়ার এ ধরণের সঞ্চারের ব্যাপারটাই হল — প্রাণীগত বুদ্ধির (বা কাল্পিক চিন্তার) তৃতীয় বৈশিষ্ট ।

ঘ. প্রাণীগত বুদ্ধিবৃত্তির চতুর্থ বৈশিষ্ট হল — বিভিন্ন বিশিষ্ট-ক্রিয়াকে সন্নিবেশিত করে একটি নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে 'দ্বিপর্যায়িক কার্য' (টু-ফেজ্ টাস্ক্) সম্পাদন করার ক্ষমতা। যেমন - একটি বিশেষ পরীক্ষণে খাঁচার মধ্যে এমন একটি ছোট লাঠি দেওয়া হল, যা দিয়ে ঝোলানো ফলগুলোর নাগাল পাওয়া যায় না ; কিন্তু খাঁচার বাইরে নাগাল পাওয়ার উপযুক্ত একটি বড়ো লাঠিও রাখা ছিল। এক্ষেত্রে, দেখা গিয়েছে যে—একটি শিম্পাঞ্জি প্রথমে ছোট লাঠি দিয়ে ফলগুলো টানার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল, খানিক বাদে সে ছোট লাঠিটা খাঁচার কাছে নিয়ে এসে, তার সাহায্যে ফলগুলো টেনে আনতে সক্ষম হল।....

বিগত সোভিয়েট যুগের বিজ্ঞানীরা আরেকটি অনেক জটিল পরীক্ষণের সাহায্যে দেখিয়েছিলেন যে — সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত সবগুলো বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়:

শিম্পাঞ্জি থাকে এমন একটা ঘেরা জায়গার মাঝখানে এমন একটি বড়ো বাক্সো রাখা হল, যার — একদিকে শিক দেওয়া ছিল, এবং আরেক দিকে ছিল ওপর থেকে নীচে একটা সরু ফাঁক। শিকগুলোর মধ্যে দিয়ে যে-কোনো শিম্পাঞ্জির হাত গলে যায়, কিন্তু ঐ ফাঁকটি দিয়ে হাত ঢোকানো যায় না। বাক্সো থেকে কিছুটা দূরে একটা শক্তপোক্ত খুঁটির সঙ্গে সরু চেন দিয়ে একটি লাঠিও দেওয়া ছিল। কিন্তু সেটা এমন মাপের এবং এমন জায়গায় বাঁধা ছিল যে — তাকে টেনে পেছনের সরু ফাঁকা দিয়ে গলিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সামনের শিকগুলো পর্যন্ত আনা যায় না।....

এবারে একটি আপেল বা কলা — শিকগুলো থেকে দূরে, কিন্তু ফাঁকটির কাছাকাছি রাখা হল।

একটি বয়স্ক এবং নানা পরীক্ষণে অভ্যস্ত শিম্পাঞ্জি এ সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল : প্রথমে সে স্বভাবসিদ্ধভাবে শিক-গুলোর মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে ফলটা ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু পারলো না। এরপর ওপাশে ঘুরে ফাঁকটির মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।... বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে, শেষকালে লাঠিটা তুলে নিয়ে বেশ কায়দা করে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে ফলটাকে শিকগুলোর দিকে ঠেলে দিল এবার আবার ঘুরে এসে — সহজেই সে শিকের মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে ফলটা নিতে সক্ষম হল।... রীতিমতো বুদ্ধির কাজ ।

উল্লিখিত পরীক্ষণগুলোর ফলাফল যথার্থ প্রমানিত। সুতরাং সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন চলে না। কিন্তু আসল বিতর্ক হল — শিম্পাঞ্জির থেকে নিম্নতর প্রাণীরা ঐসব সমস্যার সমাধান করতে পারে না, কিন্তু ওরা কেন পারে ? ..... তাহলে কি আমরা শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে 'অন্তর্দৃষ্টি' (ইনসাইট্) জাতীয় কোনো শক্তির অস্তিত্ব মেনে নেব? মানে — আত্মা-টাত্মা জাতীয় কোনো একটা অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব ?

[চলবে]

মানবীয় যোগাযোগ - আচরণের বিবর্তন (2)

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

জীবনবিজ্ঞানে প্রাণীদের যোগাযোগের আদর্শ-আচরণ হিসাবে স্নায়ুতন্ত্রের ইনপুট-আউটপুট ব্যবস্থার প্রক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। নিচে এই ধরনের একটি প্রক্রিয়াকে আমরা বোঝানোর সুবিধার জন্য এই রকম একটি মডেল ব্যবহার করেছি।

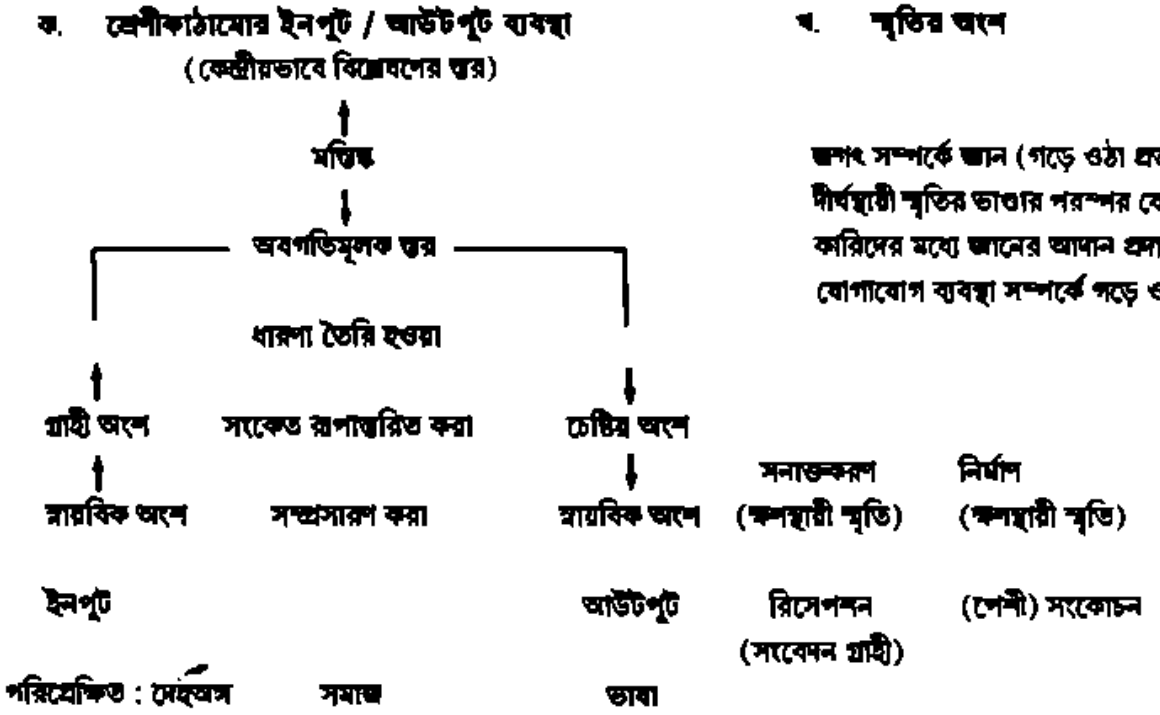

যোগাযোগ - আচরণের সাধারণ জৈবিক মডেল

উপরের মডেল থেকে একটি বিষয় বোঝার চেষ্টা করতে হবে প্রাণীদের যোগাযোগ-আচরণের ক্ষেত্রে যে ধরনের সংকেত থেকে রূপান্তর প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে সেখানে তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। যেমন 1. অবগতিমূলক স্তর—যা দিয়ে বোঝানো হয় প্রাণীটির মস্তিষ্কের মধ্যে এমন এক ক্ষমতা যা দিয়ে সে সরল কি জটিল বিভিন্ন ধরনের ধারণাকে ব্যবহার করতে পারে। কোন প্রাণী যতক্ষণ না কোন ধারনাকে সংকেতের সাহায্যে উপযুক্তভাবে বোঝাতে পারছে ততক্ষণ বোঝার উপায় নেই যে সে ঐ ধারণাটিকে অবগতিমূলক স্তরে ধারণ করছে বা আত্মস্থ করেছে। এইজন্য ধারণাটিকে সনাক্তকরণ বা নির্মাণের জন্য ঐ সময়কার মস্তিষ্কের স্নায়বিক অবস্থার সঙ্গে ধারণাটিকে জোড়া লাগাতে হয়। 2. সংকেত রূপান্তরকরণ— এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বস্তুনিরপেক্ষভাবে অবধারক ব্যবস্থা ও সংবেদ-চেষ্টিয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয় বা প্রতিফলিত হয় অসম্পূর্ণভাবে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের সনাক্তকরণ ও নির্মাণের ক্রিয়াকলাপের প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। এই সংকেত রূপান্তরণের পদ্ধতি যোগাযোগ - আচরণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রযোজ্য বলে মনে করা হয় এবং সবসময় যে এই পদ্ধতি জটিল হয় এমন ভাবার কোন কারণ নেই। 3. সম্প্রসারণ স্তর— এই স্তরে বিভিন্ন সংকেতসমূহকে ব্যবহার করা হয় ও তাদের উদ্দীপিত করা হয়। মনে রাখতে হবে এই ইনপুট / আউটপুট প্রণালীতে সংকেতগুলি নিরপেক্ষভাবের।

নীচের সারণিতে ঐ ইনপুট/ আউটপুট প্রণালীর যোগাযোগ-আচরণে ব্যবহৃত সংকেত ও তাদের মাধ্যমের একটি তালিকা দেওয়া হ'ল:

ইনপুট/ আউটপুট প্রণালী	মাধ্যম	সংকেত সমূহ
কান/স্বরযন্ত্র (? বাকে প্রকাশ)	শ্রবনেন্দ্রিয়	ছান্দিক গুণসমন্বিত
		স্বরের তীক্ষ্ণতা, গতি, উচ্চগ্রাম লয়, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ন, আবেগমন্ত্রিত স্বর, হাসি-কান্না, হাঁচি গজরানো, কাশি, অন্যান্য অসঙ্গ স্বর ইত্যাদি
কান-হাত		হাততালি, হাত দিয়ে কোন কিছু বাজানো, তুড়ি মারা
চোখ-শরীর	দর্শনেন্দ্রিয়	দেহের অঙ্গভঙ্গি, দেহের চলন, নৈকট্যের ধারণা, দেশকালের বোধ, লোম খাড়া হওয়া, আঙ্গুল দিয়ে দেখানো, সংকেত ব্যবহার, কড়ে গোনা
চোখ/মুখাবয়ব		মুখভঙ্গি, ঠোঁট নাড়া থেকে সংকেত বোঝার চেষ্টা
হাত/ হাত	স্পর্শেন্দ্রিয়	স্পর্শানুভূতি, লিপি তৈরি/স্পর্শে বোঝা, আঁচড়ানো, চাপড়ানো
নাক/ দেহ	জৈবরসায়নিক	দেহের গন্ধ বা সুবাস বোঝা

অন্যান্য বিষয়গুলিতে মতবিরোধ থাকলেও উপরে বর্ণিত মডেলগুলি সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীরা সহমত পোষণ করেন। যেমন কেউ কেউ বলেন অবগতিমূলক স্তরে যে প্রক্রিয়া চলে তা অঞ্চল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ ভাষা, সংগীত, গণিত ইত্যাদি নির্দিষ্ট কোন বিষয় ছাড়াই অবগতিমূলক স্তরের প্রক্রিয়া কাজ করে চলে এবং প্রাণীটির সাধারণ প্রত্যয় গঠনের ব্যাপারেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তুলনায় সংকেত রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি যা' ভাষা তৈরির প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় তা' মস্তিষ্কের একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তা' স্বরসেম্পূর্ণ। শেষ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রটি হ'ল ইনপুট/ আউটপুট ব্যবস্থা যার মধ্যে রয়েছে অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট সংকেত-রূপান্তরক।

একদল বিজ্ঞানীর মতামত হ'ল উপরের টেবিলে বর্ণিত তিনটি স্তরের সংকেত সম্প্রসারণ পরস্পরের থেকে আলাদা ও স্বাধীন। কেননা দেখা গেছে বিভিন্ন মানসিক ও স্নায়বিক প্রক্রিয়ায় ভাষা তৈরি ও তা' বোধশক্তিতে নিয়ে আসা পৃথক পৃথক প্রক্রিয়া। সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা করে একথা মেনে নিতে কষ্ট হবার কথা নয় যে মানবীয় যোগাযোগকারী আচরণের দক্ষতার বৈশিষ্ট হ'ল এটি বহু উৎস থেকে আসা নানা উপাদানের সমন্বয় যার অধিকাংশই অর্জিত ও বিসর্জিত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে জীবের এই সুদীর্ঘ বিবর্তনের প্রবাহে মানুষের ভাষায় চরম রূপ পেয়েছে। সুতরাং একথা বলা বাতুলতা যে এমন একটি অসম্ভব জটিল আচরণ হঠাৎ করে প্রাণীজগতের বিবর্তনের কোন পর্যায়ে শুরু হয়েছে।

নরবানরদের প্রকৃতিক ও পরীক্ষাগারের পরিবেশের মধ্যে তাদের জটিল আচরণ অনুসন্ধান :

সম্প্রতি প্রকৃতিক পরিবেশে নরবানরদের অনুসন্ধান করে তাদের আচার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য বিস্তারিত ও নিখুঁতভাবে আমাদের হাতে জমা হয়েছে। এইসব আচরণ ও মানব-আচরণ তুলনা করে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে প্রতিটি ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের পূর্বসূরী নরবানরদের আচরণের আশ্চর্য ও উল্লেখজনক মিল রয়েছে। এই নরবানররা হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহার করতে পারে, দলবল বেঁধে পশু শিকার ও নিজেদের মধ্যে খাবার বাঁটতে পারে, বাসা বানাতে পারে, দু'পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারে, নিজেদের বিচরণের অঞ্চল ঠিক করতে পারে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে সমাজ গড়ে তুলতে পারে। এই সমস্ত ব্যবহার সম্ভবত বিবর্তনের মধ্যে পরিবেশের নানা চাপের মধ্যে পড়ে নানা ছোট বড় পরিবর্তনের প্রবাহে নরগোষ্ঠীতে এসে পৌঁছেছে। যেমন

বনভূমি থেকে প্রাণীরা বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে এসে পড়লে পরিবেশের প্রভাবে যে পরিবর্তন তাদের হয়। এই সঙ্গে তাদের দেহের অঙ্গের পরিবর্তন হয়েছে যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ মানব-মস্তিষ্কের ওজন ও আয়তনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। ফলে পরিবেশের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের চাপ তারা তাদের প্রাণীগোষ্ঠীর পরিব্যক্তির মধ্যে বহন করে নিয়ে এসেছে।

পরীক্ষামূলকভাবে নরবানরদের নানা জটিল আচরণ অনুসন্ধান করে এ ব্যাপারে কারোর সন্দেহ থাকার কথা নয় যে শুধুমাত্র অবগতিমূলক স্তরের বিচারেই তারা মানবীয় যোগাযোগ-আচরণের যথার্থ পূর্বসূরী। কেননা এও দেখা গেছে পরবর্তীকালে আদিম মানুষদের এই সব আচার ব্যবহার প্রকাশ করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে যথা—সাধারণ কিছু শেখার ক্ষমতা, নিজেকে বোঝার ক্ষমতা, সংকেত ধর্মী বিষয় নিয়ে খেলা করা, নিজের শেখা জানা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, গুনতে পারা, গোলকধাঁধায় দৌড়ানো, পরস্পরের সম্পর্কের সমস্যাকে বুঝতে পারা, একসঙ্গে থাকা বিষয়গুলিকে উপযুক্ত শ্রেণীবিভাগ করতে পারা, কাজের মধ্যে শিল্পগুণ আছে এমন বিষয়গুলিকে আলাদা করা, সমপরিমাণ বিষয়ের স্থানান্তর করতে পারা এবং অস্ট্রালোপিথেসিন মানবদের মত হাতিয়ার তৈরি করতে পারা।

মানবপ্রজাতির বিবর্তনের অভিমুখে নরবানরদের সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন

দু'পায়ে দাঁড়িয়ে চলতে শেখা → স্বরযন্ত্রের পরিবর্তন → নতুন গুন বা ক্ষমতা অর্জনের জন্য চাপের সৃষ্টি

পরিবেশের পরিবর্তন

পশুশিকারের ওপর বেশি নির্ভর করা • বেশি বেশি হাতিয়ার ব্যবহার করা • মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি • জীবনচর্যার পরিবর্তন

মানবপ্রজাতির যথপোযুক্ত যোগাযোগ - আচরণ ব্যবস্থার অভিমুখে যাত্রাপথে নরবানরদের কয়েকটি রূপান্তর/ পরিবর্তন

যোগাযোগ-আচরণ সুসংগঠন করার ধার	ইনপুট / আউটপুট জোড়াবন্ধনে ধারণাগুলির চরিত্র
কোন সংগঠন নেই	প্রতিরূপ-গঠন (সর্বব্যাপক)
↓	↓
বিনাশ্রেণীকাঠামোয় সংকেত-ব্যবহার ব্যবস্থার শুরু	অবাধ ও যদৃচ্ছ
↓	↓
বিনাশ্রেণীকাঠামো ব্যবস্থা থেকে উপযুক্ত শ্রেণীকাঠামো ব্যবস্থার দিকে যাত্রা	অবাধ কিন্তু বিশ্লেষণের ছাঁদ তৈরির প্রস্তুতি

যোগাযোগ-আচরণ আউটপুটের চরিত্র	বিশ্লেষ-সংশ্লেষের পরিমাণ	স্মৃতিতে রক্ষা করার পরিমাণ
জটিল অঙ্গভঙ্গি, অঙ্গসঞ্চালন, আত্মবাচক ও আবেগজাত স্বরক্ষেপণ ইত্যাদির গুঁড়েবা (এটাই স্বাভাবিক যে স্বরযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ করার জন্য মধ্যবর্তী কোন পর্যায় ছিল।)	সবচেয়ে কম	সবচেয়ে কম
↓	↓	↓
অবগতিমূলকস্তরের ক্রিয়াকলাপের ওপর ভিত্তি করে স্বরযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে একই গুঁড়েবা	প্রায় সবটুকু	প্রায় সবটুকু

চিত্তবিদের ডায়েরি

চিত্তবিদ

মেয়েটি আগে এসেছিল, অফিস শেষ করে তার ঘর আসবে একটু পরে তাই তার কাছেই ওদের নতুন সংসারের গল্পটা শুনতে শুরু করলাম। ও বাবা মা'-র একমাত্র মেয়ে, শহরতলীর স্কুল কলেজে পড়ে বড় হয়েছে, নিজে চাকরি করবে আত্মনির্ভরশীল হবে এই ইচ্ছাও ছিল প্রবল। কিন্তু বাবা-মা বিয়ের ঠিক করতে সে আর কোন আপত্তি করে নি ভেবেছিল স্বামীর ঘরে থেকেই চাকরির চেষ্টা করবে। সে দেখতে সুন্দরী না হলেও সুশ্রী ছিমছাম আমাদের আর পাঁচটা এগিয়ে থাকা বাঙালি মেয়ের মতই। বিয়ের আগে তার হবু স্বামী তাকে নানা ধরণের কথা বলেছে টেলিফোনে বা মুখোমুখি কিন্তু সেসব কথার অর্থ সে তখন ঠিকমত বোঝেনি তাছাড়া তার বাবা মা' ও তাকে আশ্বস্ত করেছিল এই বলে যে বিয়ে হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে কেননা ছেলেটি ভালো ছেলে। গরীব ঘরের ছেলে অনেক পরিশ্রম করে লড়াই করে বড় হয়েছে, কষ্ট দুঃখকে সে হাড়ে হাড়ে বোঝে তাই আশা করা যায় যে মেয়েকে তারা কষ্ট দেবে না। ওদের বিয়ে হয়েছে মাস চারেক কিন্তু বিয়ের পর মেয়েটি বুঝতে পারছে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেছে কোন কিছুই সে এখন মেলাতে পারছে না, ফ্রেন্ড হতাশার মধ্যে রয়েছে সে। তাই বাবা-মা বলল একবার তোরা দুজনে মিলে কাউন্সিলিং করে আয়। প্রথমটায় ওর বর রাজি ছিল না পরে বন্ধুরা বোঝাতে রাজি হয়েছে।

ছেলেটি ভাল কোন সন্দেহ নেই একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে উঁচুপদে কাজ করে। বাবা-মা প্রায় বস্তিতে থাকেন তাই ছেলেটি বিয়ের পর আলাদা ঘর ভাড়া করে বউকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে, বোনের বিয়ে দিয়েছে কোথাও কোন অবহেলা করেনি কিন্তু মেয়েটিকে বার বার অন্য কথা শুনিয়েছে। এইরকম দু'চারকথা বলতে বলতেই ছেলেটি এসে হাজির, 'ও তুমি আগেই চলে এসেছ কিন্তু কথা ছিল আমরা একসঙ্গে আসবো'। বোঝা গেল ছেলেটি বেশ বিরক্ত তাই অবস্থাটা সামলানোর জন্য আমি বলি, 'আসলে কোন রোগী ছিল না বলে আমিই ওকে ডেকে নিয়েছি তুমি বস বল কি তোমাদের সমস্যা'। মনে হ'ল ছেলেটি একটু শান্ত হয়েছে, মেয়েটির অস্বস্তির ভাবও কেটেছে এবং ছেলেটি শুরু করে, 'ও কি আপনাকে আমাদের সমস্যার কথা কিছু বলেছে'? একটু সতর্ক হয়ে উত্তর দিই, 'না তেমন কিছু না একটা প্রাথমিক পরিচয় নিচ্ছিলাম আর কি, তুমি এলেই আলোচনা শুরু করবো ভেবেছিলাম এখন বল তোমার কাছে থেকে শুনি।'

এবার ছেলেটি খাপছাড়া ভাবে বলতে শুরু করে, বোঝা যায় সে একরকম ভাবে বলবে ভেবে এসেছিল কিন্তু বলতে গিয়ে ছন্দটা হারিয়ে ফেলেছে আর তেমন সহজ হতে পারছে না। যাই হোক কিছুক্ষণ নিজের ঝেড়ে ওঠা, পড়ে ওঠার কথা বলে সে বাবা-মা'র প্রসঙ্গে আসে যেমন তারা কত কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছে এই সব। বলতে বলতে সে তার বিয়ের প্রসঙ্গে আসে। এর সঙ্গে দেখাশোনা হবার আগে সে আরও কয়েকটা মেয়ে দেখেছে কিন্তু তেমন পছন্দ হয় নি। কোথাও কোথাও বাবা মা'র পছন্দ হয়েছিল কিন্তু ও মেনে নিতে পারে নি। এখানে ওর পছন্দ হলেও প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল এ' মেয়ে তার বাড়িতে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা কারণ তারা গরীব এবং প্রায় বস্তির পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে। তাদের পাড়ার কোন ছেলেই তার মত দাঁড়াতে পারেনি। অন্যদিকে ও মা বাবার একমাত্র মেয়ে অনেক আদরে মানুষ, কিভাবে সে মানিয়ে নেবে। 'এই নিয়ে বিয়ের আগে অনেক কথা বলেছি ওদের বাড়িতে গিয়ে টেলিফোনে তারপর কি যে হল নানান মতামতের মধ্যে পড়ে খানিকটা প্রভাবিত হয়েই বিয়েটা করলাম। কিন্তু তারপর অন্য সমস্যা শুরু হল।' মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই যে বিয়ের আগে তোমার এত কথা বলেছে এতে তোমার কিছু মনে হয়নি যে ওর সঙ্গে ঘর করা যাবে না। মেয়েটি এতক্ষণ চুপচাপ মাথা নিচু করে শুনছিল, খুব নিচু গলায় সে শুরু করে আমারতো ছেলেদের সঙ্গে মেশার কোন অভিজ্ঞতা নেই তাই ওর কথাগুলো শুনে খুব কনফিউজড হয়ে যেতাম কোন জবাব দিতে পারতাম না চুপচাপ শুনে যেতাম তারপর বাবা মা'কে বলতাম। ওরাও কথাগুলোকে খুব একটা পাত্তা দিতেন না, বলতেন এমন অনেক কথাই হয় বিয়ের পরে সব ঠিক হয়ে যায়। আমার এক মাসি কলেজের প্রফেসর তিনিই আপনার এখানে পাঠিয়েছেন তার সঙ্গেও আলোচনা করেছিলাম তিনিও গুরুত্ব দিতে নিষেধ করলেন, তিনি শুধু বলেছিলেন লেখাপড়া শিখেছিস চাকরির চেষ্টা করবি এই কথাটা শুধু ও বাড়ির লোকের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

মাসির প্রসঙ্গ আসতেই ছেলেটি যেন নড়েচড়ে বসে, এই মাসির জন্য আমি যথেষ্ট অপমানিত হয়েছি একটা ঘটনায়। বিয়ের

দশ দিন পর ওদের বাড়ি গেছি তারপর একদিন রাত্রে তখন প্রায় ন'টা বাজছে ও আমায় বলল চল একটু বাজারে যাবে। ও কিছুতেই আমায় বলছে না কেন বাজারে যাবে, সে প্রায় আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল একটা ওষুধের দোকানে কনডোম কেনার জন্য। এই সময় মেয়েটি কিছু বলার চেষ্টা করতেই ছেলেটি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমি বলি কি ঘটেছিল তারপর আমার ভুল হলে তুমি বলবে। বিয়ের দশ দিনের মধ্যে আমাদের তেমন শরীরের কাজ হয় নি তাতে ওর মাসি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে বলেছিলেন ছেলের শরীরের কোন দোষ থাকতে পারে সেটা জানতে গেলে কনডোম ব্যবহার করে পরীক্ষা করতে হবে কেননা অনেক সময় বাচ্চা আসার ভয়ে অনেকে দুশ্চিন্তায় এইসব কাজে অসফল হয়। যাই হোক আমার কঠিন পরীক্ষা সেদিন দিতে হয়েছিল এবং তাতে আমি সফল হয়েছি কিন্তু মনের মধ্যে একটা রাগ আমার এরপর থেকে রয়েই গেছে।

ওকে বোঝাবার জন্য বলি, তুমি বিষয়টাকে অপমানের জায়গা থেকে দেখছো কেন বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তাতো হতেই পারে। তাদের এক মাত্র মেয়ে তাছাড়া তোমাদের মধ্যে ছোটখাট মনমালিন্য হচ্ছে সেখানে বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তাতো হতেই পারে। ছেলেটি মানতে চায় না, আমি কিন্তু বিষয়টা নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং বলেছি আমি ঠিক মন থেকে মেনে নিতে না পারার জন্য শরীরের ব্যাপারটা ঠিক আসছে না। মন থেকে মেনে নিতে পারলে এসব কোন সমস্যাই আর থাকবে না কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমাকে এই পরীক্ষা দিতে হ'ল আর যদি এই পরীক্ষায় ফেল করতাম টেনশনের জন্য তাহলে আমার মাথা হেঁট হয়ে যেত। একটু নড়েচড়ে বসতেই হ'ল, তা' তুমি যে মন থেকে মেনে নিতে পারছো না যার ফলে তোমার শরীর সাড়া দিচ্ছে না এর কারণটাইবা কি বউ -এর সঙ্গে সব স্বাভাবিক সম্পর্ক হবে এটাইতো সবাই আশা করে। যদি তেমনই মনে হ'ল তাহলে এ'প্রশ্ন উঠবেই যে বিয়ে করার দরকার কি ছিল। তোমাকেতো বিয়ে করতে কেউ বাধ্য করেনি স্বইচ্ছায় করেছো এখন এসব কথা বলা কি মানায়, বল কেন তুমি মন থেকে মেনে নিতে পারছো না। তুমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছো একটা যুক্তিতে তোমায় আসতে হবে।

এবার মনে হ'ল ছেলেটি যেন তার ছন্দ খুঁজে পেয়েছে। গড়গড় করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক কথাই বলে গেল। ছেলেবেলা থেকে বাড়ির বউ সম্পর্কে বা ওর বউ কেমন হবে এ'সম্পর্কে ওর একটা মনে কল্পনা ছিল এই মেয়েটিকে নিয়ে সেই কল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ছেলেবেলা থেকে মা'কে দেখেছে অত্যন্ত নিরীহ, গোবেচারা, বাধ্য, সাত চড়ে রা নেই, বাবার মুখের ওপর কখনো কথা বলেননি এমনি কিন্তু এ মেয়ে তা নয়। এ লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মেয়ে নিছক ঘরোয়া মেয়ে নয় কথায় কথায় তর্ক করে নিজের অপছন্দের কথা বলে— এমন মেয়েতো আমি চাই নি। আমিতো চেয়েছিলাম লম্বা লম্বা চুল থাকবে এমন একটি ঘরোয়া মেয়ে তার চাকরি করার দরকার নেই সে বাইরে ঘুরবে না, ঘর গুছিয়ে শান্তশ্রী করে রাখবে, সারা ঘরের মধ্যে তার স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়বে।

তাকে বোঝাবার জন্য বলি, সব ব্যাপারে তুমি একটু পুরানোপন্থী, তোমার কোন দোষ নেই কবিরাও ঘরের মানুষটি সম্পর্কে কপালে টিপ দেওয়া ঢাকাই শাড়ি পরা কারোর কল্পনা করতেন কিন্তু সেসবতো অনেকযুগ আগের কথা আজকের দিনে কি তা মানানসই হবে। ঘর তোমার একটা কঠিন অসুখ হ'ল বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছো না তখন ঘর বার সবইতো ওকে করতে হবে। এটাকি তোমার মনে হয়না যে তখন ঘোমটা টেনে ঘরের মধ্যে বসে থাকলে গোটা পরিবারটা ধ্বসে হয়ে যাবে। ছেলেটি মন থেকে এ কথা মেনে নিতে পারছে না, আসলে আমি একটু অন্য ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম তে. তাই আপনার কথাগুলো যুক্তি দিয়ে বুঝলেও মেনে নিতে পারছি না। আমার বন্ধুরাও এমন অনে কথা বলে ..... কিন্তু আমি মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। একজন জ্যোতিষী হাত দেখে আমায় বলছে আমার দু'টো ,বয়ে তাই মাঝে মাঝে এমনও মনে হয় ভবিষ্যতে হয়তো তেমনই হবে।

মনটা খারাপ হয়ে যায় একটু রাগও হয় বিজ্ঞান জানা শিক্ষিত ছেলে এমন অশিক্ষিতের মত কথা বলছে দেখে। বলেই ফেলি, ওর সামনে এই যে কথাগুলো তুমি বলছো তা কি খুব মানবিক কথা বলে মনে হচ্ছে। তুমি দেখেশুনে বিয়ে করলে, মেয়েটির কোন দোষ নেই এখন বলছো ওর সঙ্গে আমার পোষাচ্ছে না। এরপর মেয়েটি মুখ খোলে, শুধু এটুকুই নয় আমাকেতো সবসময় এসব বলছে তাছাড়া রাস্তাঘাটে কাউকে পছন্দ হলে বলছে, দেখ মেয়েটি কত ভালো কত সুন্দর আর এইসব শুনে আমারও মনটা কেমন ভেঙে যাচ্ছে ওকে ভালোবাসাতো দূরের কথা ওর প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আপনি বলুন সবসময় এসব শুনলে কার মন ভালো থাকে।

অবস্থাটা বেশ জটিল কোন সন্দেহ নেই। ছেলেটি শুধু পুরানোপন্থী নয় একটা পুরুষপ্রাধান্যের মনোভাব ওর মধ্যে যথেষ্ট সক্রিয় সেই সঙ্গে পুরো ব্যাপারটায় একটা আমরা যাকে বলি কালচারাল ইন্‌কম্পাটিবিলিটি এইরকম কিছু কাজ করছে। মেয়েটির কথা ভেবে খারাপ লাগছে, সর্বক্ষণ তাকে তার বরের কাছ থেকে এইসব কথা শুনতে হবে যার জন্য সে একেবারে দায়ী নয়। ওর বাবা মা'-র কাছে ও বিয়ের আগে এইসব সমস্যার কথা বলেছে কিন্তু বাবা মা এসবের গুরুত্ব দেননি। ছেলে ভালো চাকরি করে, উচ্চশিক্ষিত এটাই তারা যথেষ্ট বলে মনে করেছেন— তারা অত তলিয়ে দেখেননি। কিন্তু ছেলেটিকে এসব কথা বুঝিয়ে চট্ করে এর সমাধান পাওয়া যাবে এমন আশাও করা যায় না বিশেষত: যেখানে নানা ধরনের নেগেটিভ ইমোশন অবস্থাকে আরো জটিল করে তুলছে। তাছাড়া এ'জন্য পুরো ফ্যামিলি কাউন্‌সিলিংও দরকার। তাই ওদেরকে বুঝিয়ে বলি।

দেখ তোমরা বিয়ে করেছো এর অর্থ হ'ল একটা সামাজিক চুক্তিতে এসেছো। চট্ করে এই চুক্তি ভাঙ্গা যায় না সুতরাং তোমাদের নিজেদের মধ্যে যত মনান্তর থাক না কেন তোমাদের দু'জনকেই একগুঁয়েমি ছেড়ে নিজেদের মধ্যে একটা সেতু বাঁধতে হবে। আমরা যা চাই কখনই তার সবটুকু পুরন হয় না কিন্তু এইসব নিয়েই আমরা জীবন চালাই। কোটি কোটি দম্পতি এই ভাবেই বেঁচে আছে তোমাদেরও থাকতে হবে। যাই হোক তোমাদের মা বাবার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

সামনের বইমেলায় মানবমন-এর স্টল থাকছে।
মানবমনের পাঠক ও শুধানুধ্যায়ীদের
আমন্ত্রণ রইল।

মানবমন পত্রিকার গ্রাহক হোন।
পুরনো পাঠকদের কাছে অনুরোধ এখনো যাঁরা গ্রাহক চাঁদা পাঠাননি,
গ্রাহক চাঁদা পাঠিয়ে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশিত হতে সাহায্য করুন।

রবীন্দ্রনাথ-যদুনাথ শিক্ষাবিতর্ক

শিক্ষাসংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিতর্কগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের চিঠিপত্রের চাপান-উতোর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের সম্পর্ক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভা সম্পর্কে যদুনাথ বহু লেখালেখি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখার ইংরাজী অনুবাদও করেছেন। অল্পবয়সে তাঁরা দলবেঁধে অন্যদের সঙ্গে গয়া বেড়াতে গেছেন। 1905 সালের বঙ্গভঙ্গ স্মরনে রাখীবন্ধন উৎসবে কবি যদুনাথকে রাখী পাঠিয়েছেন। পাটনা কলেজে অধ্যাপনার সময় তাঁর আহ্বানে মাঝে মাঝে আশ্রম বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য যদুনাথ শান্তিনিকেতনে যেতেন। একবার কবির উপস্থিতিতে ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ জৈন হিন্দু ও মুসলিম সৌধ ও দৃশ্যের প্রায় একশো ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন স্লাইড নিজের খরচে প্রস্তুত করে শান্তিনিকেতনে উপহার দেন এবং তার কতগুলি দেখিয়ে ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার সাধারন সম্পাদক হন যদুনাথ। তিনি এ বিষয়ে প্রবাসী শ্রাবণ 1324- এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাতে জানানো হয়:

বর্তমান যুগে সকল সভ্যজাতির সমবেত চেষ্টায় জ্ঞানের বিষয় সকল ব্যাপ্তি গভীরতা ও সূক্ষ্মতায় দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। এই জ্ঞান জনসাধারণের পক্ষে সুগম করিবার জন্য ইউরোপীয় ভাষায় অনেক সুব্যবস্থা আছে। প্রতি বিষয়ে নবতম তথ্যে পূর্ণ পণ্ডিতদের উপযোগী গ্রন্থ ছাড়া সরল ভাষায় সাধারণের বোধ্যগম্য প্রণালীতে রচিত অথচ আধুনিক উচ্চজ্ঞানপ্রদ অনেক ছোট পুস্তক ও পর্যায়বদ্ধ গ্রন্থাবলী সর্বত্রই পাওয়া যায়। তদুপরি পণ্ডিতেরা সাংসারিক লোক ও শ্রমজীবীদিগের অবসরকালীন শিক্ষার জন্য সরল ভাষায় বিশ্ববিদ্যাপ্রসারিণী বক্তৃতা (University Extension lectures) প্রদান করিয়া এই সব নবজ্ঞান কলেজের বাহিরে বিতরণের উপায় করিয়া দিয়েছেন। ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থাগুলির কোনটিই নাই। অথচ, ইউরোপীয় দেশগুলির অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে এই নবোন্মেষশালী জ্ঞানের অধিকার অধিকতর আবশ্যক, কারণ ইহারই অভাবে ভারতের জনসাধারণ ইউরোপের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারতীয় দেশীয় ভাষার সাহিত্য অনেক স্থলে এখনও মধ্যযুগের ইউরোপকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভারতকে বিশেষ চেষ্টায় অল্পসময়ের মধ্যে দীর্ঘকালের ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে, নচেৎ বর্তমান যুগের কঠোর জীবনসংগ্রামে নব্যতম জ্ঞানের পথ্যে বঞ্চিত ভারতীয় জনসাধারণ মুমূর্ষতা প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানই শক্তি। সেই শক্তি সরল মাতৃভাষায় রচিত সদ্‌গ্রন্থের দ্বারা ভারতময় সঞ্চারিত করিতে হইবে। জাতীয় মুক্তি এই পথে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট হ'ল তা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ছাঁচে-গড়া কেরানি তৈরির পরিবেশের বিরুদ্ধতা করে এসেছে শুরু থেকে। শিশুদের যথার্থ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির যে পরিবেশ রচনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে তা জগৎজোড়া খ্যাতি পায় কেননা তিনি এই শিক্ষাক্রমের মধ্যে দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবনাচিন্তাকে সংশ্লেষ করতে চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন 1901 সালে শুরু হয় একটি স্কুল স্থাপনের মধ্যে দিয়ে যেখানে তিনি চেয়েছিলেন এক নতুন ভারতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটাতে । পরে বিশ্বজননী শিক্ষাদর্শের উদ্বোধন ঘটানোর লক্ষে তিনি 'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনা করেন। 1921 সালে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁকে পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে দায়িত্ব নেওয়া হয় ঐ প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য থেকে শুরু থেকে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক নিয়োগের জন্য। সেই পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকারকে আহ্বান জানান বিশ্বভারতীর পরিচালকমণ্ডলীর কার্যকরী সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়-পর্যায়ের শিক্ষাধারা সম্পর্কে যথেষ্ট সদর্থক মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও যদুনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী'-পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান তিনি বেশ তীব্র ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। অপ্রত্যাশিত এই প্রত্যাখ্যান রবীন্দ্রনাথকে প্রচণ্ডভাবে আহত করেছিল। এই দুই দিকপাল মনীষার তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি একান্ত মৌলিক প্রশ্ন উঠে পড়ে, যা আজকের দিনে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। আমরা এই দুই চিঠি পরপর সাজিয়ে দিলাম আমাদের পাঠকদের সুবিধার্থে। কেননা আমরা মনে করি আমাদের শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি নিয়ে ধারাবাহিক সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে ধরনের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন হয় তা আমরা কখনো করিনা ফলে এই সব সমস্যাগুলি আজ একত্রিত হয়ে আমাদের বিভ্রান্তকর ও হতবুদ্ধিকর অবস্থায় নিয়ে যায়, যার কোন সহজ সমাধানও আমরা খুঁজে বার করতে ব্যর্থ হই। আশা করতে পারি আজকের সময়ের শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনায় এই দুই জগদ্বিখ্যাত মানুষের জীবনের অনুভব, বিশ্ববীক্ষা এ যুগের জটিল, সমাধান-অসাধ্য বিভিন্ন সমস্যার ক্ষনিকসত্য - নিত্যসত্যের টানাপোড়েনে আমাদের উদ্দীপিত করবে। [স. মা.]

রবীন্দ্রনাথকে যদুনাথের চিঠি

Sarkar-abas
Darjiling 31st May 1922

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি মে ও জুন মাসের জন্য এখানে আসিয়াছি সুতরাং আপনার 7 ই জ্যৈষ্ঠের রেজিস্টারি পত্র কটক ঘুরিয়া এখানে পৌঁছিতে দেরি হইল। বিশ্বভারতীর গবর্নিং বডির সদস্য হইতে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইলেও দুইটি গুরুতর কারণে ঐ পদ অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম, তজ্জন্য মার্জনা করিবেন।

প্রথমতঃ আমি এখন ঘুরে থাকি, এবং আর কয়েক বৎসর পরে পেন্সন লইয়া নিম্ন বঙ্গে বাস না করিবার ইচ্ছা। সুতরাং শান্তিনিকেতনের কার্যের তত্ত্বাবধান করা, নতুন সমস্যা উঠিলে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া, আমার পক্ষে অসম্ভব। বৎসরে একবার মাত্র বার্ষিক অধিবেশনে দেখা দিলে কর্তব্য পালন হইবে না। যেখানে কাজ করিতে পারিব না, সেখানে নামে সদস্য হইয়া থাকাটা আমি নিজের পক্ষে লজ্জাকর ব্যবহার এবং ঐ সংস্থানের প্রতি অবিচার বলিয়া মনে করি। এই যেমন, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের ও ঘরের সদস্য এত অধিক যে 30 জন সদস্যের মধ্যে অনেক অধিবেশনে 7 জনও জোটে না, অধিবেশন পণ্ড হয়। এলাহাবাদের উকীলগণ না আসিলে কোরম হয় না। যেখানে স্থানীয় পণ্ডিত ও কার্যদক্ষ লোক যথেষ্ট সংখ্যায় নাই, সেখানে স্বাধীন আত্মনিবদ্ধ ইউনিভার্সিটি হওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্বে যে শান্তিনিকেতন দেখিয়াছি তাহা স্কুল মাত্র ছিল। এখানে ছাত্রদের দেহ ও হৃদয় সুন্দর সুস্থরূপে গঠিত হইয়া, পরে তাহারা মামুলী কলেজে প্রবেশ করিয়া মামুলী বিদ্যা শিখিয়া মস্তিষ্কটা সংসারের উপযোগী করিত। এই যোগের ফলে অতি সুন্দর সম্পূর্ণ মনুষ্য গঠিত হইত। অর্থাৎ আমাদের কলেজে যাহার অভাব বোলপুর তাহা পূরণ করিয়া দিত। শুধু শিক্ষা অর্থাৎ মস্তিষ্কের পক্ষে বোলপুরের কাজটা যে কাঁচা হইতেছে তাহা আপনিই আমাকে বলিয়াছেন।

কিন্তু বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা ভিন্ন ও অতিবৃহৎ। সে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাই (1) প্রতি বিভাগে সর্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত শিক্ষক (2) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বুঝিবার এবং উচ্চ প্রণালীতে কাজ করিবার উপযোগী শিক্ষা intellectual discipline and exact knowledge, পূর্বেই পাইয়াছে এমন ছাত্রমণ্ডলী, এবং (3) শিক্ষার পরিপক্ক চরিত্রবান একনিষ্ঠ নেতা একজন। এই তিনটি থাকিলে টাকা বা জিনিষের অভাব বাধা হয় না, এবং এ অভাবও বেশী দিন থাকে না। আমাদের মামুলী কলেজের IA ও BA শ্রেণী চারিটি প্রকৃতপক্ষে বিলাতের ভাল সেকেণ্ডারী স্কুলের কাজ করে; আর এদেশে প্রকৃত কলেজের কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এম. এ ক্লাস হইতে আরম্ভ হয়। ঐ IA ও BA ক্লাসে চারি বৎসর খাটিয়া তবে ' আমাদের ছেলেরা' বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার ও নিজে কাজ করিবার উপযুক্ত হয়। বোলপুরে এই শিক্ষার প্রথম স্তরটি (অর্থাৎ হাইস্কুল) অতি সুন্দর। আপনি যেরূপ পণ্ডিত ও মনীষী সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে কালে 3য় স্তরটি (অর্থাৎ রিসার্চ বা পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ) ও বেশ কার্যকর হইবে— যদি ছাত্র আসে। কিন্তু 2য় স্তরটি (অর্থাৎ মামুলী কলেজের 4টি শ্রেণী) ওখানে একেবারে নাই। যে ছাত্র বোলপুরে আগাগোড়া শিক্ষিত হইয়াছে সে কিরূপে রিসার্চ-অধ্যাপকের অধ্যাপনা বুঝিতে, তাঁহার নির্দেশ মত কাজ করিতে পারিবে, তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না; কারণ প্রকৃত রিসার্চের ভিত্তি অর্থাৎ উচ্চ general knowledge এবং 2 বা 3 বিষয়ের সূক্ষ্ম শৃঙ্খলাবদ্ধ পাঠ— তাহাদের ঘটে নাই; তাহাদের মধ্যভাগটা কাঁচা রহিয়া গিয়াছে। যেমন, যে এম এর ইতিহাসে প্রকৃত কাজ করিতে চায়, তাহার পক্ষে পূর্বেই BA তে Economics & Political Science এবং একটি ভাষা রিসার্চ-বর্জিত কিন্তু গভীর অধ্যয়ন করিয়া আসা আবশ্যক। ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিতে হইলে শুধু সংস্কৃত জানিলে চলিবে না, গ্রীসীয় ইতিহাস, মিসর ব্যাবিলনের ইতিহাস, Political Philosophy তে অন্তে BA পাশ করা আবশ্যক, নচেৎ মনটা সংকীর্ণ থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ exact knowledge, পরের অর্জিত বিদ্যার মধ্যে দিয়া গিয়া। তাহার পরে এবং উপরে আমরা মৌলিকতায় পৌঁছিতে পারি। এই মাধ্যমিক শিক্ষা (grind বলিতে পারেন) মামুলী কলেজে হয়, বোলপুরে হয় না।

তাহার উপর, বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge কে, intellectual discipline কে ঘৃণা করিতে এবং

যদুনাথের এই পত্রটি এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরপত্র একসঙ্গে যদুনাথ 'বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে' প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য প্রবাসী চৈত্র, 1352 । কিন্তু প্রবাসীতে প্রকাশের সময় যদুনাথ তাঁর পত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। মূলপত্র রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

উদ্যার শিক্ষক ও সেবকগণকে হৃদয়হীন, শুষ্ক মস্তিষ্ক "বিশ্বমানবের" শত্রু, মেকি পণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে। তাহারা শুধু ভাবের (emotion) দিকে, synthesis এর অত্যাবশ্যক ভিত্তি যে exact knowledge তাহা শেখে না বরং শেখা অনুচিত, কুশিক্ষা, বলিয়া মনে করে। এই যেমন আকাশে এরোপ্লেন উড়িতেছে দেখিয়া আমাদের মনে হয় " আহা। কি সুন্দর এইরূপ উড়াই মানবমস্তিষ্কের সর্বোচ্চকাজ ও সুখ।" কিন্তু কত শ্রমের কত শুষ্ক তপস্যার কত exact knowledge এর ফলে এরোপ্লেনের সৃষ্টি ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাহা আমরা ভাবি না। ইহার আবিষ্কারের পূর্বে অসংখ্য পতঙ্গ ও পক্ষীর কেহ ছুরী ও অণুবীক্ষণ দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া পক্ষ ও দেহের আনুপাতিক ওজন এবং আয়তন, পক্ষের ভিতর দিয়া শক্তিবাহক রসের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া শুষ্ক exact knowledge এর পুঁজী সংগ্রহ করা পরীক্ষার পর পরীক্ষা প্রাণত্যাগের পর প্রাণত্যাগ আবশ্যক হইয়াছিল। এরোপ্লেন আনন্দে সৃষ্ট হয় নাই।

তেমনি আচার্য্য বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে জীব উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ সকলেরই শ্বাস ও মৃত্যু উত্তেজনা ও ক্লান্তি আছে। আমরা অমনি উল্লাসে বলিয়া উঠি "বাঃ। ইহাই ভারতের নিজস্ব মানসিক সম্পদ। আমাদের উপনিষদ যুগের পিতামহগণই ত বলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া প্রাণ আছে।" আমরা বুঝি না যে প্রাচীন ঋষিরা ভাবের উন্মেষে ঐ কথা বলেন, কিন্তু আচার্য্য বসু(র) প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন, জীবন শুষ্ক; তিনি exact knowledge- এর সাহায্যে বিজ্ঞানাগারে পদে পদে পরীক্ষা করিয়া, সেই পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করিয়া এক ইঞ্চকে কোটিভাগে বিভক্ত করিয়া, তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অবিশ্বাসীর হাত দিয়া সেই পরীক্ষা করাইয়া তাহাকে নিজমতে দীক্ষিত করিতে পারেন।

তেমনি পালী ও বৈদিক সাহিত্যের গ্রন্থগুলির বিশুদ্ধ সংস্করণের পশ্চাতে কি অগাধ শুষ্ক পরিশ্রম রহিয়াছে। এই সব সংস্করণের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ গণিয়া ঠিক করিয়াছেন যে ললিতবিস্তারে তৃতীয়ার একবচন কোথায় এবং কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে, বৃহদ্দেবতায় দেবগণের উপাধি ও গুণগুলির নির্ঘণ্টু প্রস্তুত করিয়াছেন। আর আমরা আর্য্যসন্তান এই উৎকৃষ্ট সংস্করণ হাতে করিয়া আত্মম্ভরিতার সহিত 'উপর চালাকী' করিতেছি, ভাব গদ্‌গদ হইয়া general remarks ঝাড়িতেছি, আর লিউম্যান ও ম্যাকডনেলের শুষ্ক শ্রমের প্রতি exact knowledge এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেছি।

আমি এখন মানিতে প্রস্তুত নই যে বর্তমান ভারত জগৎকে দিতে পারে শুধু সেই খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে রচিত বেদান্তের নূতন ভাষ্যের ভাষ্য তস্য ভাষ্য, নব্যন্যায়ের কচকচি, কেথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ, এবং আলিপনার নকসা, অথবা মুঘল চিত্রের সাত নকলের খাস্ত নকল। ভারতবর্ষ যে বিংশ শতাব্দীতে ও জগৎকে exact knowledge দিতে পারে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের scientific history রচনা করিতে পারে, পুরাতন পুনরাবৃত্তি (kechauffe') বা অনুকরণ একেবারে ছাড়িয়া 'জগৎ সভার মাঝে' গ্রহণীয় নূতন জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে পারে,— এ বিশ্বাসটা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা না করিয়া ছাড়িতে চাহি না।

বোলপুরে এরূপ চেষ্টা সম্ভব নহে। সেখানে যে বায়ু সৃষ্ট হইয়াছে তাহা এই scientific method এবং exact knowledge এর বিরোধী। যেমন বৈষ্ণবেরা ভক্তিবিগলিত অশ্রু হইয়া সব জিনিষ অস্পষ্ট দেখে, তেমনি বোলপুরের ছাত্রগণ শেখে ভাবের (emotion) বাষ্পের আবরণ দিয়া জগতের দিকে তাকাইতে। প্রথম হইতেই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বলিয়া তাহারা অণুবীক্ষণ ফেলিয়া দিয়া শুধু দূরবীক্ষণ ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু জ্ঞানরাজ্যে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ কোনোটাকেই ছাড়িলে পূর্ণতা লাভ করা যায় না।

আপনি দেখিতেছেন আমি কি অকাট দুরারোগ্য ফিলিষ্টাইন। তাহা হইবেই ত। আমি পেশাদার গুরুমহাশয় (মস্তিষ্কের, হৃদয়ের নহে), পণ্ডিত তৈয়ার করিবার চেষ্টা করি। যেখানে এই ব্যবসায়ের ওস্তাদের আবির্ভাব বা নূতন প্রণালীর কথা শুনি সেখানেই দেখিতে যাই। পুরাতন নেশনাল কলেজ দুবার, বোলপুর 3 বার, গুরুকুল একবার পর্যবেক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু কাহারই আদর্শ ও প্রণালী সর্ব্বাঙ্গীণ গ্রহণ করিতে পারি নাই। আপনি যখন পদ্যে ধর্ম্মব্যাখ্যানে বা গল্পে বেদান্তের নির্যাস দেন তাহা তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে। আমি তাহা পূর্ণসত্য বলিয়া মানিয়া লই। কারণ আপনার যুক্তি দ্বারা আমার মস্তিষ্কের নিকট ভাবের দ্বারা আমার হৃদয়ের নিকট তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়; আর আমি জানি যে আপনি নিজ জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তবে তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু যখন বোলপুরের দশ বারো বছরের ছেলে - আবার বিশ্বই হউক না কেন- "বিশ্বমানব" "অব্যক্ত মর্ম্মবেদনা" প্রভৃতি কথা আওড়াইতে থাকে তখন পুঁটি মাছের মুখে তিমি মাছের গলার আওয়াজের মত এগুলি অসঙ্গত শুনায়। আমাদের মামুলী কলেজে পাশ করা ছেলেরা যে রাজনৈতিক মঞ্চে নৃত্য করিতে

করতে 'ডেমক্রেসি' 'কনষ্টিটুসন' 'সেলফ ডিটারমিনেশন' প্রভৃতি বুলী আওড়ায় তাহাও ঠিক এইরূপ মূল্যের জিনিস।

কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। মামুলী কলেজে আমরা প্রোফেসরদের শুষ্ক মহাশয়েরা ছাত্রের হৃদয়টার দিকে তাকাই না, শুধু মস্তিষ্কটা শানাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই অভাবটা বাহিরের শুষ্ক মরুভূমি — সংসার হউক, আপনার কাযা হউক, প্রকৃতির দৃশ্য হউক — পূরে পূরণ করিয়া দেয়, কারণ হৃদয়টা শূন্য থাকিতে পারে না — যেমন Palace of Art-এ টেনিসন সুন্দর প্রমাণ করিয়াছেন। যোগপুরের ছাত্রেরা যে আমাদের পেটেন্ট কবা প্রস্তরচক্রে মস্তিষ্ক শানায় না, exact knowledge বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং intellectual discipline শেখে না, শেখা অন্যায় মনে করে, — তজ্জনিত অভাবটি পরে বাহির হইতে পূরণ হইতে পারে না, একমাত্র তরুণ বয়স এবং কলেজের শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাই এই অভাসে এই মনের ঝোক দিতে পারে। বয়স ও সুযোগ চলিয়া গেলে পরে ইহা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং যোগপুরের ছাত্রগণ রিসার্চ ক্লাসে উঠিয়া মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে (ভাসা ভাসা synthesis কাজে) কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না, এবং তাহাদের প্রথমকল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর হবে না। শুধু সংস্কৃত পড়িয়া যাঁহারা পণ্ডিত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য ইউরোপীয় দর্শন অভ্যাস করিয়া তাহার সঙ্গে বা পরে সংস্কৃত চর্চা করিয়াছেন। এই দুই শ্রেণীর মনের গৌড় ও ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ শেষোক্ত পণ্ডিতরাই প্রকৃত মূল্যবান গবেষণা করিতে পারেন।

আর একটি উপমা দিলেই আমার মনের ভাব পরিষ্কার হইবে, — এবং আমি যে কি ভীষণ ফিলিস্টাইন সে সম্বন্ধে পূর্ব্ব স্নেহ কলতঃ আপনার যদি দু-একটা সন্দেহ থাকে তবে তাহাও লোপ পাইবে। "ইণ্ডিয়ান আর্ট ভারতের নিজস্ব জিনিস, ইহা জগৎ সভার হাতে ভারতের অমূল্য অবদান স্বরূপ দান।" বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি। আমরা বলি যে রবি বর্ম্মার ছবিতে ভাব নাই, তাহা Nature-এর দাসোপযোগী নকল। এই মত প্রচারের ফলে, অবনীবাবু ও নন্দলাল ভিন্ন আর সব নব্য ইণ্ডিয়ান আর্টের সাধকগণ প্রথমে হাত ঠিক করা সম্পূর্ণ ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়াছেন; প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা নাই, শরীর বিজ্ঞান পড়া নাই, ছবি আঁকিবার পূর্ব্বে নানা পরীক্ষা (studies বা sketches) করিয়া চিত্রের উপযোগী, ঠিক অঙ্গভঙ্গিটি আবিষ্কার করা নাই; এবং নাকে ভাবের ছবি উপস্থিত করিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এসব ছবির মধ্যে যাহা ভাল তাহাকে অজন্তার বা মুঘল চিত্রের নকল ভিন্ন আর বেশী কিছু বলা যায় না। অপরগুলির সব চাঁচা ও খারাপ, ঠিক শিশুর আঁকা বা cavemanএর আঁকা ছবির মত, শুধু সেগুলি তার চেয়ে ভাল। কিপলিং-এর একটা গল্পে আছে যে একজন বিলাতী ভবঘুরে এদেশে এসে প্রথম এক্কা দেখে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠেন "oh how thruly Orienthal!" ইণ্ডিয়ান আর্টের চরম আকাঙ্ক্ষা এই কি যে সাহেবেরা বলিবে How truly oriental! অর্থাৎ বিশ্বজগতের সভ্যসমাজের মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার হইবে, কলা আদর্শীর জন্য যে একটা fine standard আছে তাহা দিয়া ইহার বিচার করা হইবে না? (কেহ রুইজডেল্ বা কুইপএর landscape দেখিয়া কেহ ত বলে না oh! how truly Dutch? টার্নার দেখিয়া কেহ ত বলে না oh! How truly English?)

রবি বর্ম্মাতে ভাব নাই সত্য, কিন্তু রবি বর্ম্মাই কি ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতির দৃষ্টান্ত? র‍্যাফেল লীটন টার্নার-এ ত কেহ ভাবের অভাব, কামোচিত অনুকরণ দেখেন নাই; অথচ তাহাদের কীর্ত্তির পশ্চাতে কত anatomy, observation of Nature, "Studies" (অর্থাৎ খসড়া) আছে, তবে তাঁহাদের হাত ঠিক হইয়াছে! Sir Frederick Leighton তাঁহার Flaming June নামক চিত্রের রমণীর মাথার নীচে দেওয়া হাতের ভঙ্গির জন্য 16/17 টা Sketch করেন, পরে তাহার একটি বাছিয়া লন ও ছবিতে বসান, সেই মত র‍্যাফেলের স্কেচ (Cartoons) আছে।

অথচ আমাদের ইণ্ডিয়ান আর্টের শুরু হইতে নবীনতম শাগরেদ পর্যন্ত "Art is not photography" "The imitation of Nature is a slavish practice unworthy of a true artist" "Expression is higher than fidelity to life" এই সব বুলী আওড়ান এবং ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতিকে জন্য* গালাগালি দেন। ইহার ফলে ইণ্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ প্রথম শিক্ষানবীসের হাত ঠিক করিতে যে পরিশ্রম যে প্রকৃতির অনুসরণ আবশ্যক তাহা দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া অহঙ্কারে ত্যাগ করিয়া একেবারে ভাব-প্রকাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন— ফল প্রবাসীতে প্রকাশিত ছবিগুলি। সেই মত যোগপুরের ছাত্রেরা exact knowledge কে ঘৃণা করিয়া এক লাফে synthesis এবং ভাবপ্রকাশে গিয়া উপস্থিত হইতে শিখিতেছে। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান আর্টের এবং সিনথেসিস বাদ এ দুটাই plea for laziness হইয়াছে। মামুলী কলেজের ছাত্রগণ অলস হইলে, ঢিলে কাজ করিলে লজ্জা বোধ করে। ইণ্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ এরূপ করা গৌরবের বিষয়, মানসিক স্বাধীনতার

* অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানা গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদের ভূমিকার প্রতি লক্ষ করিয়া "Times Lit. Suppl" এই মত লিখিয়াছেন।

চিহ্ন বলিয়া গর্ব্ব করে। ইহার প্রসূত ফল জগৎসভা কতদিন গ্রহণ করিবেন দেখা যাউক।

আমি যে কেন ফিলিষ্টাইন হইয়াছি তাহা বলিতেছি। যদি বোলপুরের ছাত্রগণ সকলেই প্রথম শ্রেণীর কবি বা চিত্রকর হইবে এরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তবে তাহাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সন্দিহান হইতাম না। কিন্তু দেড়শত বৎসর ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার ফলে বঙ্গমাতা একজন মাত্র রবীন্দ্রনাথ প্রসব করিয়াছেন। আর দুইশত বৎসরেও তাঁহার দ্বিতীয় আসিবেন না, আমার বিশ্বাস। সুতরাং বোলপুরের ছাত্রদিগকে এই আমাদের কলেজের ছাত্রদের মত সাধারণ সাংসারিক লোক বলিয়া বিচার করিতে হইবে, এক প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইবে। তাহারা অকল parasite class বা intellectual aristocracy হইবার ন্যায্য দাবী করিতে পারে না। The winds of genius blow where they list. মামুলী কলেজ তাঁহাদের সৃষ্টি করিতে পারে না। বোলপুরও পারিবে না। তবে সেই প্রচণ্ড জ্যোতি ক্ষণজন্মা কবি বা শিল্পী মামুলী কলেজে নাম লিখাইলে আমরা তাঁহাকে steam rollerএর চাপে পিশিয়া ফেলি, বোলপুরে তাহা হইতে রক্ষা পাইবেন। কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ ছাত্র ঐ ক্ষণজন্মা পুরুষ নয় তাহাদের জন্য বোলপুর কি করিবে?

আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না এজন্য যে কত কষ্ট পাইতেছি তাহা আপনি কল্পনা করিতে পারিবেন। কিন্তু কর্ম্মী সমাজে এই বিশ্বভারতীর সহিত আপনার খ্যাতি জড়িত থাকিবে। আমি 29 বৎসর কলেজে পড়াইয়াছি এবং শিক্ষার পদ্ধতি ও দেশের অবস্থা (মৌলিক ঐতিহাসিক গবেষণা ছাড়িয়া দিন) প্রভৃতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছি। এখন যদি আপনাকে প্রস্তাবিত পন্থার বিপদ না বলিয়া দিই তবে আপনাকে প্রতারিত করিব।

যদি ইচ্ছা করেন এবং অন্য বন্দোবস্তের মধ্যে এরূপ দ্রব্যের জায়গা হইতে পারে তবে বড়দিনের সময় 3/4টা বক্তৃতা বা ইতিহাসের রিসার্চ স্টুডেন্টদিগকে উপদেশ দিবার জন্য বোলপুরে যাইতে পারি। গ্রীষ্মে ও পূজায় আপনাদের ও আমাদের এব সময়েই ছুটি থাকে।

এবার কি এ অঞ্চলে আসিবেন না ?

বিনীত
শ্রীযদুনাথ সরকার

যদুনাথকে রবীন্দ্রনাথের উত্তর

ওঁ

2 জুন 1922 শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি কিছুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম যে আপনার মনে হয়ত আমার সম্বন্ধে কোন কারণে বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে। সেজন্য মনের মধ্যে বেদনা অনুভব করিয়াছি এবং সেইজন্যই আপনাকে বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম।

আমার কাজের বিরুদ্ধে আমার দেশের লোকের একটা প্রতিকূল ধারণা আছে, ইহা আমার পক্ষে বিষম বাধা। কিন্তু আপনার মধ্যে সেই বিরুদ্ধ মনোভাব আমার কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে, আপনার চিঠির মর্ম্ম এখনো স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেই পারিতেছি না। বিশেষতঃ আপনি অনেকবার এখানে আসিয়াছেন, সকলপ্রকার অভাব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এখানকার প্রতি স্নিগ্ধভাব রক্ষা করিয়াছেন; আপনি যে এখানকার আবহাওয়া বা কার্য্যপ্রণালীকে নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন এমন আভাস তখন আপনার নিকট হইতে একবারও পাই নাই।

আপনি বলিয়াছেন, বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge ঘৃণা করিতে শেখে, এবং এইরূপ জ্ঞানের শিক্ষক ও সাধকগণকে "হৃদয়হীন, শুষ্কমস্তিষ্ক, 'বিশ্বমানবের' শত্রু", বলিয়া উপহাস করিতে অভ্যস্ত হয়। একথা যদি সত্য হয় তবে আমার এই বিদ্যালয় কেবল যে নিষ্ফল তাহা নহে ইহার ফল বিষময়। কিন্তু একথার আপনি কোন প্রমাণ পাইয়াছেন?

এতকাল পর্য্যন্ত এখানে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইত। এখানে বেশির ভাগ কেবল ছিল সঙ্গীত, চিত্রকলা, বাংলা সাহিত্য এবং অল্প কিছু বিজ্ঞান। যে কারণেই হউক দেখা গিয়াছে এখানকার অধিকাংশ ছাত্রই কলিকাতার কলেজে গিয়া বিজ্ঞান বিভাগেই ভর্ত্তি হইয়াছে। অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, দেশে ত হাইস্কুল যথেষ্ট আছে তাহার উপর আর একটা বোঝা বাড়াইবার প্রয়োজন কি ছিল। তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না। আমার বক্তব্য এই যে এদেশে হাইস্কুলে ছাত্রের'

যেটুকু দেখে এখানকার ছাত্ররা অন্তত সেইটুকুই শিখিত। আপনি কি কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়াছেন যে, ইহারা সেই স্বল্পপরিমাণ শিক্ষার মধ্যেই accurate knowledgeকে উপহাস করিতে শিক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের মনের মধ্যে এই একটি মত দাঁড়াইয়া গেছে যে, প্রমাণসঙ্গত প্রণালীতে যে মনীষীরা জ্ঞানের ভিত্তি পত্তন করিয়া থাকেন তাঁহারা "বিশ্বমানবের" শত্রু?

একথা আপনার জানা আছে যে, যথোচিত পদ্ধতিতে আমি নিজে শিক্ষা লাভ করি নাই। মনে করিতে পারেন সেই অশিক্ষাকলঙ্কই জ্ঞানার্জনের বিহিত প্রণালীকে আমি অশ্রদ্ধা করি,— এবং সেই অশ্রদ্ধা আমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এখানকার অপরিণতবুদ্ধি বালকদের মনে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এমন কথা যদি স্থির করিয়া থাকেন তবে আমাকে আপনি জানেন না ইহার বেশি আর কিছু বলিতে পারি না। নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইলাম, আমার কথা আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, সত্যের দোহাই দিয়া আমি বলিব যে, সর্বপ্রকার জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণসঙ্গত অনুসন্ধানপ্রণালীর প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা আছে ; আমাদের দেশের সাবেক পণ্ডিত, এমন কি, হাল আমলের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও প্রামাণিক পদ্ধতির চর্চা নাই বলিয়া আমি আক্ষেপ করি। আপনার প্রতি চিরদিন যে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি তাহার প্রধান কারণ আপনি ব্যক্তিগত অহংসংস্কার বা মিথ্যা ভাবুকতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া সত্যসন্ধানের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। আমাদের দেশের অনেকে যাঁহারা ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য তাঁহাদের সাধনা এরূপ বিশুদ্ধ নহে। আপনার প্রতি আমার এই শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই এখানকার কাজে আপনার সহায়তা পাইবার জন্য এমন আগ্রহের সহিত বারম্বার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনাকে যদি "বিশ্বমানবের" শত্রু বলিয়া মনে করিতাম তবে আপনার সম্বন্ধে এমন করিয়া কামনা করিতাম না।

আচার্য বসুর অনুসন্ধানলব্ধ তত্ত্বগুলিকে দেশের যে-একদল লোক প্রাচীন আর্যঋষিদের ঝুলির মধ্যে গুপ্ত আছে বলিয়া কল্পনা করেন আপনার পত্রে আপনি তাঁহাদের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; আপনার চেয়ে আমি তাহাদিগকে কম অশ্রদ্ধা করি না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া পুরাতন পুঁথির বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীকে যাঁহারা অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করেন আপনি তাঁহাদের কথাও লিখিয়াছেন। আমি যে সে দলের নহি আপনি যদি তাহার প্রমাণ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা আলোচনা করিবেন, আমি তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া, প্রামাণিক প্রণালী অনুসারে শাস্ত্র আলোচনা ও উদ্ধার করিবার জন্য, যথাসাধ্য উৎসাহ দিয়া আসিয়াছি। এখানকার লাইব্রেরিতে তাহার প্রমাণ আছে।

আমাদের এখানে ভাবাবেশের অস্পষ্টতায় বৈজ্ঞানিক সত্যদৃষ্টি কলুষিত হইয়া যায় এমন কথা আমার কোন কোন বন্ধুমহলেও প্রচলিত আছে ইহা আমি জানি— কিন্তু তাঁহারা এখানকার কাজ নিকট হইতে দেখেন নাই এবং ব্যক্তিগত বিশেষ সংস্কার বশত তাঁহাদের ধারণা নির্মল নহে, কিন্তু আপনার মধ্যেও এইরূপ প্রতিকূলতা যদি এমন প্রবল আবেগে উগ্র হইয়া ওঠা সম্ভবপর হয় তবে তাহা আমার পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

অবশ্য একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিকতাকে আমি যেমন মানি ভাবুকতাকেও তেমনি মানি। আমাদের আশ্রমের বায়ুতে সেই ভাবুকতার উপাদান যদি কিছু থাকে তবে সেটা কি চিত্তবিকাশের পক্ষে হানিকর? সেই সঙ্গে আর কিছুও কি নাই? এখানে যে কৃষিবিভাগ খোলা হইয়াছে তাহা যদি কাছে আসিয়া দেখিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে তাহা যেমন বৈজ্ঞানিক তেমন কার্যোপযোগী, তাহার কার্যক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রণালী বহুব্যাপক। শ্রীনিকেতন দেশের রোগ ও আরোগ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য হাঁসপাতাল সমেত একটি শিক্ষাবিভাগ খুলিবার চেষ্টা করিতেছি, হয়ত শীঘ্র ছোট আকারে তাহার গোড়াপত্তন করিতে পারিব। এখানে ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, চামড়া পাকা করিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে "বিশ্বমানবের" বিরুদ্ধতা করা হয় বলিয়া এখানকার কেহই মনে করেন না। কিন্তু আপনারা কি বলেন যে, ভাবুকতার কোনো সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল বিজ্ঞান ও এই সকল কারখানার কাজ শিখাইলেই exact knowledge এর সাহায্যে ছাত্রদের মন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে?

আপনার পত্রের এক জায়গায় আপনি অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে "খৃষ্টপূর্ব যুগে রচিত বেদান্তের নূতন ভাষ্যের ভাস্ম তস্য ভাস্ম, নক্ষত্রলোকের কলকচি, কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ন এবং আলিপনার নকসার" উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি যাহাকে "বেলপুকুরের বায়ু" বলেন সে কি কেবল এই সকল কসলেরই উপযোগী? বেদান্তের নূতন ভাষ্য ও নক্ষত্রলোককে বিরূপ করিতে পারি এতটুকু জ্ঞানও আমার নাই। কিন্তু "কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ন ও আলিপনার নকসা" সম্বন্ধে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিৎ ও আর্ট সমালোচকদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে— দেখিয়াছি সকল প্রকার জ্ঞান ও ভাবকলনের প্রতি তাঁহাদের মানসিক বহু পরিতৃপ্ত বলিয়াই এগুলিকে তাঁহারা বহুমূল্য গণ্য করেন। আমার ইচ্ছা যে, আমাদের আশ্রমের মানসিক বায়ু সেইরূপ পরিতৃপ্ত হউক যাহাতে এই সকল পদার্থকে অতিতুচ্ছের বলিয়া কেহ অবজ্ঞা না করে এবং সেই সঙ্গেই জ্ঞানসাধনার বিজ্ঞানের যে স্থান

আছে তাহাকেও সকলে সম্মান করিতে শেখে।

আপনার চিঠির ভাষা হইতে বুঝিলাম "বিশ্বমানব" "বসুধৈব কুটুম্বকং" প্রভৃতি ভাষা ও ভাবের প্রতি আপনি অপ্রসন্ন হইয়াছে। অসংযতভাবে এইসকল শব্দের অমিতব্যবহার অত্যন্ত বিরক্তিকর সন্দেহ নাই। আমার দ্বারা হয়ত তাহা ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু আমার বর্তমান ও পূর্বতন ছাত্রদের মধ্যে আমি একজনকেও জানি না যে ব্যক্তি বিশ্বমানবের বা বসুধৈব কুটুম্বকং লইয়া প্রবন্ধে বা গ্রন্থে, বক্তৃতায় বা কবিতায় কোনো আলোচনা করিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র ছাত্রকে জানি যাহার মন ভাবাবিষ্টতায় অভিভূত। কিন্তু মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য সাধনে প্রকৃতি দেবীর নিজের কি কোন হাত নাই, আমাদের আশ্রমের "ভক্তিবাষ্পাকুল বায়ু"র আর্দ্রতাতেই কি মন তৈরি হইয়া উঠে? এখানকার একটি ছাত্র চুরিও করিয়াছে সেজন্য কি এখানকারই বায়ু দায়ী? বৈজ্ঞানিক বায়ুতে কোনো বিকার কাহারও ঘটে না?

আমার ব্যক্তিগত প্রভাবকেই হয়ত আপনি দোষ দিতে চান। সে সম্বন্ধে আমার দুটি মাত্র কথা বলিবার আছে। আমার জীবনে আমি ভাবাবেগের যথেষ্ট চর্চা করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু আমি কি ভাবাকুল হইয়া কেবল রসবিলাসে জীবন কাটাইলাম? আমি কি কাজের জন্য কোন উদ্যোগ কোন ত্যাগ কোন সাধন করি নাই। সেই সাধনায় কি কাঠিন্য নাই? চিন্তাকে বাক্যে প্রকাশ করাতেই কি কেবল যাথাতথ্যের প্রয়োজন, কাজে প্রকাশ করিতে কি শৈথিল্যত্যাগ ও বুদ্ধি এবং কল্পনার সংযম লাগে না? অতএব আমার প্রভাব কি আমার ছাত্রদিগকে কেবল ভাবাবেগের জড়তায় আচ্ছন্ন করিবে, আর যে-ক্ষেত্রে আমি অর্থাভাব এবং দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও সহকারিতার অভাবের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া একটা জিনিষকে গড়িয়া তুলিলাম সেই ক্ষেত্রটি ছেলেদের চোখেই পড়িবে না, আর সেই কঠোর সাধনার কোন প্রভাব তাহাদের উপর কাজ করিবে না? আমার এই বিদ্যালয়ের "এরোপ্লেন" কি কেবল ভাবের আকাশে উড়িল, ইহা কি কেবল "আনন্দেই সৃষ্ট" হইয়াছে, ইহার মধ্যে সঙ্কল্প নাই, চিন্তা নাই, পরীক্ষা নাই, দুঃখ নাই? এখানকার ছাত্রেরা কি তাহা দেখিতে পায় না? দ্বিতীয় কথা, আমার মতি এবং চরিত্র যাহা করিতে পারে তাহার বেশি কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আমার সামর্থ্যের অসম্পূর্ণতা জানি বলিয়াই আপনাদের মত জ্ঞানের সাধকদিগকে চাহিয়াছিলাম। যদি পাইতাম তবে সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের পরিচালনাপ্রণালী শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম। এখানে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহারা আমার কর্তৃত্বাধীনে করেন না— তাঁহারা নিজেরা পরামর্শ করিয়া কাজ করেন। আমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে যদি আমার অভিমান থাকিত তবে আমি নিজেই কর্তৃপদ লইতাম। এখানকার বায়ু একমাত্র আমার ভাবাবেগের দ্বারা কলুষিত হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ আপনি যদি সন্ধান করিতেন তবে জানিতেন আমার ভাবের সঙ্গে এখানকার অধ্যাপকের ভাবের মিল নাই, আর এখানকার ছাত্রদের পনেরো আনা রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমার ভাবের প্রতি আস্থা রাখে না। তাহাদের এই স্বাতন্ত্র্যকে আমি বাধা দিই না, ইহাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

আপনার চিঠি পড়িয়া ব্যথিত ও বিস্মিত চিত্তে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি। আপনার মনে আমি ক্ষোভের কোন্ কারণ ঘটাইয়াছি যাহাতে আমাদের সম্বন্ধে আপনার এরূপ বিরুদ্ধতা ঘটিল তাহা অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম না। আপনি "ফিলিষ্টাইন", আপনার কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালী "বিশ্বমানবের" ক্ষতিকর, এমন কথা আমি কোনোদিন প্রকাশ্যে বা গোপনে আভাসেও প্রকাশ করি নাই কারণ ইহা আমার চিন্তাতেও আসিতে পারে না। আপনার পত্রে বাংলার আর্টিস্টদের সম্বন্ধে যে ঔদ্ধত্য আছে তাহাতে সন্দেহ হয় তাঁহাদের সঙ্গে হয় ত আপনার বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকিবে। আমি তাহা জানিও না এবং তাঁহাদের আলোচনার ঘরের কোণেও কোনদিন যোগ দিই না— যদিও একথা স্বীকার করা কর্তব্য বোধ করি যে, বাংলার আর্টিস্টদের সম্বন্ধে ও আর্টসাধনা সম্বন্ধে আপনি যে মত যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আমি মিলি না।

আমাদের দেশে অল্প যে কয়জন সাধকের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে আপনি তাহাদের মধ্যে একজন। এই কারণে আমার কর্ম্মের প্রতি আপনার এমন অবজ্ঞাবিমিশ্রিত অশ্রদ্ধার তীব্রতায় আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। আমাদের এখানে ত্রুটির অভাব নাই, ত্রুটি অন্যত্রও আছে, কিন্তু যথাবিহিতরূপে আপনি কি তাহার সন্ধান ও যথোচিতভাবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন? বিশ্বভারতীর সংকল্প মাথায় লইয়া ভারতবর্ষে যখন ফিরিলাম তখন সহায়তার জন্য সর্বপ্রথমে আপনাকেই সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন বিশ্বভারতীর সহিত আপনার নাম আপনি সংযুক্ত রাখিতে চান না তখন তাহা প্রত্যাহৃত করিব; তৎসত্ত্বেও ভাবুক বলিয়া আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সত্যসাধক বলিয়া শেষ পর্যন্ত আপনার প্রতীক্ষা করিব। ইতি 19 জ্যৈষ্ঠ 1329

বিনীত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[Recd. Darjiling, 6 June 1922]

প্রাথমিক শিক্ষা - একটি সমীক্ষা

তাপসী বিশ্বাস

প্রফেসর অমর্ত্য সেনের নোবেল জয়ের পর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের দেশের সরকার (কেন্দ্র ও রাজ্য) যেন বহুদিনের জড়তা কাটিয়ে ওঠার যুক্তি খুঁজে পেয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মূল ঘোষণা ছিল 2002 সালের মধ্যে 5 থেকে 9 বছরের শিশুদের মধ্যে সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য 100 কোটি টাকা খরচ করা হবে। এতে স্বাভাবিক ভাবে ধারণা হয় যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 'অর্থাভাব'ই প্রধান অন্তরায়। তাহলে আমরা আলোচনা করতে পারি যে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য আর্থিক দূরবস্থা প্রধান বাধা কিনা।

বুনিয়াদী শিক্ষার বিষয়ে প্রধানতঃ দুটি সমস্যা বেশি করে অনুভূতি হয় যেমন তদারকের সমস্যা ও অর্থসম্বন্ধী সমস্যা। আর্থিক সমস্যা যেখানে নেই তদারকের সমস্যা সেখানে প্রকট ভাবে দেখা দেয়। অথচ তদারকের সমস্যার বিষয়টি কখনই তেমনভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না তাই আমরা তদারকের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দেখতে পারি প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলি দূর করার বিষয়ে তদারকের সমস্যা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও প্রাথমিক শিক্ষা বলতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী অব্দি বোঝায়। তবে বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী অব্দি পড়ানো হয়। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বে আছে - 'ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ্ প্রাইমারী এডুকেশন'। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। এর নিচে রয়েছে প্রত্যেক জেলায় 'ডিসট্রিক্ট প্রাইমারী স্কুল কাউন্সিল'। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী তাঁর প্রশাসনিক পরিকাঠামোর সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি তদারকি করেন। এই পরিকাঠামোয় শিক্ষন নিলয়, স্কুলের পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যসূচি স্থির করা হয় এবং 'স্টেট কাউন্সিল ফর এডুকেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং'-এর মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিকাঠামো জেলা শাখা, উপরিউক্ত কাউন্সিল এর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ, মাইনে দেওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করে।

সংবিধানের 73 তম ও 74 তম সংশোধনীতে বুনিয়াদী শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরন করার জন্য পঞ্চায়েত ও 6 টি মিউনিসিপ্যালিটিকে এই শিক্ষার ভার ন্যস্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সংশোধনকে নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে, তবে খুব সামান্যই এই শিক্ষার তদারকি ও পরিকল্পনার ভার পঞ্চায়েতকে দিয়েছে।

বর্তমান ব্যাবস্থায় জেলা ও মহকুমা স্তরে স্কুল তদারকের ভার সম্পূর্ণভাবে স্কুল ইনস্পেক্টর-এর ওপর রয়েছে। তবে কার্যক্ষেত্রে এর ভূমিকা নেই বললেই চলে। শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাইনে দেওয়া এবং যে সামান্য অনুদান আসে তা বন্টন করা ছাড়া। ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট এর কয়েকজন শিক্ষকদের প্রজেক্ট রিপোর্টে পাওয়া গেছে তিন বছরে (95-98) যে পঞ্চাশটি স্কুলে তাঁরা গেছেন সেইসব স্কুলে কোনো পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করতে যান নি। তাঁরা আরও জানিয়েছেন কোনো জেলারই বিশ্বাসযোগ্য স্কুল ম্যাপ নেই যার সাহায্যে এর ভৌগলিক অবস্থান, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা, স্কুল-ঘরের সংখ্যা ও আসবাবপত্রের অবস্থা বোঝা যায়।

স্বাধীনতার 50 বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি স্কুল তদারকের ক্ষেত্রে এত অবহেলা থাকে তবে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার কিভাবে সম্ভব তা' ভেবে দেখতে হবে। এর থেকে বুঝতে হবে যে অর্থের অভাব মিটলেই সার্বিক শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা মজবুত হবে বিষয়টি এমন নয়। বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য প্রয়োজন সমাজ সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা। স্থানীয় সমাজকে স্থানীয় সমস্যার কাজে সচেতন করে তুলতে হবে। অর্থনৈতিক কাজের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন-এই ধারণাই জনসাধারণের মনে জাগিয়ে তোলা হয়নি। মানবসম্পদের অন্যতম মাপকাঠি যে শিক্ষা - তাই আমাদের দেশের অধিকাংশে মানুষই জানেন না। দেখা গেছে গ্রামের দিকে শিক্ষক শিক্ষিকারা সাধারণত সমাজের উচ্চজাতের পরিবার থেকে আসার নিম্ন শ্রেণীভুক্ত তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়কে শিক্ষাপ্রদানের ক্ষেত্রে চরম অবহেলা করেন। ফলে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার একেবারেই হয়নি। কাজের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা না থাকার দরুন বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রদানও অন্যান্য কাজের মত চরম অবহেলিত হয়ে রয়েছে।

যদি প্রত্যেক স্কুল কাউন্সিল জেলার সচেতন গ্রাম শিক্ষাকমিটি ঠিকমত গঠন করা যেত, তাহলে সার্বিক শিক্ষাপ্রসারের কাজ হয়ত এতদিনে এগিয়ে যেত। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ

নিয়েছে, তবে অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্কুল কাউন্সিল এর সদস্যদের [illegible] নির্বাচিত নয়। ফলে কাউন্সিল চালিত হয় শিক্ষক ইউনিয়ন ও শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী দ্বারা। ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাক্ষেত্রে [illegible] কোনো ভূমিকা নেই। দেখা গেছে স্কুল কাউন্সিল-এর অনেকগুলো ও পঞ্চায়েতের সদস্যরা একই রাজনৈতিক দলে থাকলেও স্কুল কাউন্সিল-এর ওপর পঞ্চায়েতের কোনো ভূমিকা নেই। অতএব পঞ্চায়েতকে শিক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্ব দিতে হলে স্কুল কাউন্সিল -কে ঢেলে সাজাতে হবে।

এখন দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা কোন অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থা বুঝতে হলে আমাদের তিনটি বিষয় লক্ষ করতে হবে।

1. প্রথমত সব শিশুরাই (5 থেকে 9 বৎসরের মধ্যে) স্কুলে ভর্তি হয়েছে কিনা, স্কুলের ক্লাস ঘরের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা যথেষ্ট কিনা।

2. দ্বিতীয়ত, স্কুলে ভর্তি হলেই হবে না, শিশুরা অন্ততঃ পাঁচবছর স্কুলে রয়েছে কিনা।

3. তৃতীয়ত শুধু স্কুলে থাকলে হবে না, শিশুরা কিছু শিখতে পেরেছে কিনা অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষিকার মান, বছরে ন্যূনতম সংখ্যক দিন পড়াশুনা হয়েছে কিনা।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ ম্যানেজমেন্ট-এর শিক্ষকরা পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা (1995-98) সম্বন্ধে যে প্রজেক্ট রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছেন তার থেকে আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারব।

তাঁরা 35,777 টি গ্রাম সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে পঁচিশ শতাংশ গ্রামে কোনো স্কুল নেই এবং এমন সতেরটি সরকারি স্কুল সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন ছয় শতাংশ স্কুলে কোনো স্কুল ঘর নেই। বাকিদের 50 শতাংশ স্কুলের পাকা বাড়ি, 15 শতাংশ কাঁচাখড় এবং 29 শতাংশে কাঁচা ও পাকা বাড়ি মিলে স্কুল বাড়ি আছে। তবে শহরে 50 শতাংশ স্কুলে পাকা বাড়ি আছে। গ্রামের 45 শতাংশে স্কুলে কোনো পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, সেখানে শহরে 18.75 শতাংশে স্কুলে এই ব্যবস্থা নেই।

গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে গড় শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা 2.7, সেখানে শহরে 5.2। শহরে যেখানে মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা 63 শতাংশে, গ্রামে সেখানে 12 শতাংশে। গ্রামে পুরুষদের রাজনৈতিক প্রভাব মহিলাদের তুলনায় বেশি বলেই সম্ভবত স্কুলগুলোতে শিক্ষিকাদের তুলনায় শিক্ষকদের আধিক্য দেখা যাচ্ছে। অতএব গ্রামে ও শহরের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থার যথেষ্ট ফারাক রয়েছে।

শুধু স্কুলের অস্তিত্ব থাকলেই শিক্ষাদানের ব্যাবস্থা হবে তা নয়। বছর ক-দিন ক্লাস হয়, শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি রকম তার ওপর নির্ভর করছে ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু শিখতে পেরেছে কিনা। সার্ভে রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে বছরে মোট নয় মাস স্কুল খোলা থাকে এবং গড় 17 থেকে 18 দিন প্রত্যেক মাসে ক্লাস হয়, ফলে বছরে মোট 160-180 দিন ক্লাস হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি স্কুলে 2.3 শিক্ষকদের মধ্যে 1.9 জন প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত। গ্রামে 44.98 শতাংশে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেখানে শহরে 73 শতাংশে। গ্রামের শিক্ষকদের 53.36 শতাংশ 10 ক্লাস অব্দি পড়েনি, 21 শতাংশে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়েনি এবং 14.18 শতাংশে গ্রাজুয়েট স্তরে আছে।

তবে রিপোর্টে আমাদের প্রচলিত ধারণার ভুল দিক প্রকাশিত হয়েছে। দেখা গেছে প্রাথমিকস্কুলে কিছুদিন পর স্কুল ত্যাগ করার (বিশেষ করে বালিকারা) সমস্যা ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং একবার স্কুলে ভর্তি হলে মা-বাবা-রা স্কুল ছাড়াতে চায় না। স্কুল ছাড়ার সমস্যা দেখা যায় প্রাইমারী শিক্ষার (চতুর্থ শ্রেণী) পর, যখন অনেক দূরের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে হয়। পরিসংখ্যানগত ত্রুটির জন্যই স্কুল ছাড়ার সংখ্যা বেশি দেখা যায়। গ্রামের স্কুলগুলোতে বড় ভাইবোনেদের সঙ্গে ছোটরাও স্কুলে এসে বসে। এদেরকে প্রাক - প্রাথমিক শ্রেণীতে রাখা হয়, এবং পরিসংখ্যান নেওয়া হয়। এভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা অনেক বেশি দেখানো হয়। ফলে স্কুলে ছাড়ার সংখ্যাও বেশি দেখা যায়। এছাড়াও কিছু ছেলেমেয়ে একই ক্লাসে (চতুর্থ শ্রেণীছাড়া) দু বার থাকার ফলে এই পরিসংখ্যানে স্কুল ছেড়ে দেওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে সমস্যা স্কুল ছাড়ার নয়, সমস্যা হল প্রাথমিক ক্লাসে ভর্তি হওয়া। রিপোর্টে দেখা গেছে গ্রামাঞ্চলে যে সব ছেলেমেয়েরা নাম নথিভুক্ত করে নি (1995-1998 সালের মধ্যে) তাদের সংখ্যা 36 শতাংশ। নাম নথিভুক্ত না করা ছেলেমেয়েদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি- দার্জিলিঙে এবং সবচেয়ে কম আছে মেদিনীপুর ও বীরভূমে। মুসলমান, তপসিলী জাতি ও

উপজাতিদের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি না হওয়ার সংখ্যা অন্যান্য উচ্চজাতের তুলনায় বেশি। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে 5 থেকে 8 বছরের শিশুদের স্কুল ছাড়ার সংখ্যা 3.3 শতাংশ, সেখানে নাম নথিভুক্ত হয়নি এমন শিশুদের সংখ্যা 47 শতাংশ।

সার্বিক প্রাথমিকশিক্ষার মূল বিষয়টি হল 5 থেকে 9 বছরের শিশুদের যে কোনো শ্রেণীরই হোক নাম নথীভুক্ত করা। অথচ স্কুল ছাড়ার সংখ্যা থেকেও নাম নথিভুক্ত না করার সংখ্যা আরও বেশি।

প্রাক-প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যোগ করে প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখানোর ক্ষেত্রে শুধু শিক্ষকরাই নয়, যারা প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি দেখাশুনা করে (কাউন্সিল) তাদের মদত থাকে। কারণ কম নাম নথিভুক্ত থাকলে শিক্ষা ব্যবস্থার অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। গ্রামে নাম নথিভুক্ত না করার কারণ হিসাবে গুরুত্ব অনুযায়ী দেখানো হয়েছে (1) পড়াশোনার ইচ্ছে নেই, (2) খরচ পোষাতে পারছে না, (3) স্কুল অনেক দূরে, (4) বাড়ির কাজ করতে হয়, (5) বাড়ির জন্য খাবার, জল ও গরুর খাবার আনতে হয়। এবং শহরাঞ্চলে প্রধান কারণ হল লেখাপড়ার খরচ না পোষাতে পারা।

স্কুল ছাড়ার কারণ হিসাবে প্রধানত রয়েছে খরচ পোষাতে না পারা এবং শহরে দোকানে নিযুক্ত হয়ে যাওয়া।

অতএব সরকারি তরফে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়া সত্ত্বেও গ্রামে ও শহরে স্কুলে ভর্তি না হওয়া বা স্কুল ছাড়ার জন্য খরচ পোষাতে না পারাই প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রিপোর্টে বেশি নাম নথিভুক্ত দেখানোর জন্য শিক্ষক-ছাত্র এবং শিক্ষক-স্কুল-এর গড় অনুপাত দেখানো হয়েছে 1.47 এবং 3.17। কিন্তু সঠিক হিসাব করলে দেখা যাবে কোনো কোনো স্কুলে ছাত্রদের তুলনায় শিক্ষিক - শিক্ষিকার সংখ্যা বেশি। আবার অন্যান্য স্কুলে ছাত্রদের তুলনায় শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম। ফলে স্কুলগুলোর মধ্যে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সমবন্টন হলে নতুন শিক্ষক - শিক্ষিকা নিয়োগ না করলেও অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব।

উপরিউক্ত বহু পরিকল্পনাবিহীন কাজকর্মও চরম অবহেলার শিকার হয়ে পশ্চিমবঙ্গে যুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা টিকে রয়েছে। সরকারি পরিকল্পনায় শুধু সরকারি স্কুলের কথা না ভেবে শহরে ও মফঃস্বলে যে অনেক বেসরকারি স্কুল রয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করে সরকারি নীতি নির্ধারণ করতে হবে। কলকাতার মধ্যবিত্ত এলাকায় অনেক কর্পোরেশন স্কুল আছে যেখানে ছাত্ররা ভর্তি হয় না, পরিবর্তে প্রাইভেট স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় দেখা যায়। এইসব স্কুলগুলো সরিয়ে সত্যিই যেখানে স্কুলের প্রয়োজন আছে সেখানে যদি স্থাপন করা যায়, অথবা ঐ সব স্কুলগুলোকে বেসরকারি স্কুলের মত আরও আকর্ষনীয় করে তোলা যায়, তবেই সরকারি খরচের সার্থক ব্যবহার হবে। নতুবা ফুটো পাত্রে জল ঢালবার মতই অবস্থা দাঁড়াবে। সরকারি স্কুলগুলিকে বেসরকারি স্কুলের পরিপূরক হিসাবে তৈরি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। বেসরকারি স্কুলগুলোকে পাত্তা না দিয়ে সরকারি নীতির নির্ধারণ করলে তা অসম্পূর্ণ হবে।

মনোরোগীদের চিকিৎসার জন্য
যোগাযোগ করুন
পাভলভ মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার
98, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - 7
ফোন: 241-2935
(সোম থেকে শনি বিকেল 3 থেকে রাত্রি 8টা, রবি সকাল 10 থেকে 1টা)

সাক্ষরতার ভাবনা

জয়ন্ত কুমার ঘোষাল

সাক্ষরতা বনাম নিরক্ষরতা

সাক্ষরতা একটি ব্যক্তিগত বিষয় বলে গণ্য হলেও নিরক্ষরতার বিষয়টি সামাজিক। সামাজিক অনুমোদন বা সমর্থন ছাড়া গণ-নিরক্ষরতা টিকে থাকতে পারে না। একটি অকার্যকরি শিক্ষাব্যবস্থার ফল হল নিরক্ষরতা। এই শিক্ষা সমাজের দুর্বল অংশকে নিজের প্রতি আগ্রহী করে না। যদি ঐতিহাসিকভাবে কোন সম্প্রদায় সাক্ষরতা ছাড়াই জীবন ধারণে আগ্রহী হয় তবু নিরক্ষরতাকে সেখানে ঘৃণার চোখে দেখা উচিৎ নয়। বরং বলা যায় সেই সম্প্রদায়কে সাক্ষরতা অর্জনের সপক্ষে যথাযথভাবে উদ্দীপিত করতে না পারার ব্যর্থতার দায় বর্তায় অন্যদের ওপর।

নিরক্ষরতার উৎস লুকিয়ে আছে আমাদের অপ্রতুল অকার্যকরি গতানুগতিক শিক্ষার মধ্যেই। এই শিক্ষা বিরাট সংখ্যক মানুষকে বিদ্যালয়ে পৌঁছতে দেয় না, কিংবা মাঝপথে বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। অবশ্য প্রথাগত বিদ্যালয় ব্যবস্থার দুর্বলতা সাক্ষরতা কর্মসূচী দিয়ে মেটানো সম্ভব নয় নানা কারণে। প্রথাগত শিক্ষা যদি বিরাট সংখ্যক মানুষকে তার আওতার বাইরে রাখে, সমাজের সেখানে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ থেকে যায়, যা খুঁজে বার করা উচিৎ। যদি গোটা ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক যোগ স্থাপন না করা যায়, তবে বয়স্ক সাক্ষরতা ক্ষেত্রে কিছু সরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ প্রত্যাশিত ফল দিতে পারে না। গণসাক্ষরতার কোন কর্মসূচী শুরুর আগে গোটা সমাজকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং কর্মসূচী রূপায়নের ব্যাপারে গোটা সমাজের প্রতিশ্রুতি পাওয়া দরকার। সাক্ষরতা থেকে যাদের সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত রাখা হয়েছে তাদের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করাটা বেশি জরুরি। যদি এই সমর্থন পাওয়া যায় তবে সমাজ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী সফল করতে উদ্যোগী হবে এবং তার পাশাপাশি বর্তমান সুযোগগুলির শুধু সদ্ব্যবহার করা নয়, সেগুলিকে রক্ষার চেষ্টা করবে এবং সকলের জন্য শিক্ষার উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কাদের আমরা নিরক্ষর বলতে পারি। নিরক্ষর হল সেই — Person who has not acquired the basic skill in reading, writing or arthimetic. অর্থাৎ সাক্ষরতা হল the ability to read, write and to calculate in the mother tongue. আর সাক্ষরতা অর্জনের শিক্ষা বা Literacy Eduction হল the teaching or acquisition of reading, writing and numeracy skills to prepare persons to function in society. অবশ্য সাক্ষরতার সংজ্ঞা বারবার প্রয়োজন মতো পরিবর্তিত হয়েছে।

সাক্ষরতা মিশন

আমাদের দেশে 1988 সালে গঠিত জাতীয় মিশন সাক্ষরতা প্রসঙ্গে বলেছে পড়া লেখা এবং হিসাব করার ক্ষমতা অর্জন, যাতে একজন ব্যক্তি নিজেকে সক্রিয় কাজের মধ্যে নিয়োগ করতে পারে এবং তার পড়া, লেখা ও গোনার ক্ষমতাকে তার নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য নিজেকে সক্ষম করে তুলতে পারে; সম্প্রদায়ের জন্য এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য নিজেকে কাজে লাগাতে পারে এবং সেই শক্তি ও প্রভাব অর্জন করতে পারে যা দিয়ে সে সমাজে গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে, মিশনের দৃষ্টিতে সাক্ষরতার অর্থ শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান অর্জন বা গুনতে শেখা নয়।

1985 সালের মার্চ মাসে প্যারিসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল বয়স্ক শিক্ষার ওপর চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সেখানে বলা হয়েছিল সাক্ষরতার দিগন্ত আজ প্রসারিত হয়ে শিক্ষার অধিকার দাবি করছে। সম্মেলনের মতে সে অধিকারগুলি হল পড়ার ও লেখার অধিকার, প্রশ্ন করার ও বিশ্লেষণের অধিকার, কল্পনা করার ও সৃষ্টি করার অধিকার, নিজের চারপাশের জগৎকে জানা ও ইতিহাস রচনা করার অধিকার, শিক্ষার সম্পদের মধ্যে প্রবেশের অধিকার—অর্থাৎ প্রয়োজনটা শুধুমাত্র সাক্ষরতা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, পৃথিবীটাকে জানার আগ্রহ অনেক বাড়ছে এবং তার প্রয়োজনও রয়েছে। যুগের দাবি মেটাতে সাক্ষরতা কার্যক্রমকে সেদিকে চালনার প্রয়োজন। সাক্ষরতার মান প্রসঙ্গে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনও পড়া এবং বোঝার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের সাক্ষরতা কর্মসূচীর হিসাব নিকাশ করতে হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা মিশন গঠিত হবার কিছুদিন পর তাঁরা সার্বিক সাক্ষরতা প্রচারাভিযান-এর কর্মসূচি নেন। সরকারি উদ্যোগে এদেশে জাতীয় স্তরে 1978 সালে নেওয়া হয়েছিল 15-35 বয়ঃগোষ্ঠির জন্য জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি (NAEP)। তার আগে ঘটা করে চালু হয়েছিল ব্যবহারিক সাক্ষরতার জন্য গণকর্মসূচী (MPEL) এবং গ্রামীণ ব্যবহারিক সাক্ষরতা কর্মসূচি (REL.P)। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও সাক্ষরতা প্রসারে নানা কর্মসূচি নিয়েছিল। জাতীয় স্তরে তিনটি সাক্ষরতা কর্মসূচি মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়। মজার বিষয় হল পূর্ববর্তী পরিত্যক্ত কর্মসূচির বিষয়ে কোন সমীক্ষা বা সাফল্য-ব্যর্থতার হিসাব নিকাশ ছাড়াই পরবর্তী কর্মসূচি চালু হল। সাক্ষরতা প্রসারে নানা পদ্ধতিও নেওয়া হল। কেন্দ্রভিত্তিক পদ্ধতি, ইচ ওয়ান টিচ ওয়ান ইত্যাদি নানা কর্মসূচি। কোন কর্মসূচি তেমন সাফল্যের মুখ দেখেনি।

সাক্ষরতা মিশন গঠনের পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে এবং সাক্ষরতার জন্য তথা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে গণউদ্যোগ ঘোষণায় দেশের জনসাধারণের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত জনসাধারণের একটা বড় অংশে যে নিরক্ষরতার সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল একথা অনস্বীকার্য; যদিও সেই সচেতনতা এবং সার্বিক সাক্ষরতা প্রচারাভিযান (TLC) -এর প্রথমদিকে যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল তাকে সার্থকভাবে কাজে লাগান যায়নি। বরং পরবর্তী কালে তাদের একটা বড় অংশের কাছে কর্মসূচিটি প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। এর কারণ সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে বেশী করে নির্ভর করা হয়েছিল আমলাতন্ত্র এবং রাজনীতিকদের ওপর। মিশন প্রথমদিকে কর্মসূচিটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে রূপায়ণে শুরুত্ব দিলেও পরবর্তীকালে সেই ঘোষণা থেকে সরে এসেছে। জেলাভিত্তিক TLC রূপায়ণের জন্য জেলা সাক্ষরতা সমিতি গঠিত হল যার মাথায় বইলেন জেলাশাসক ও জেলা সভাধিপতিরা — আমলাতন্ত্র এবং রাজনীতিকদের অশুভ আঁতাতের নিদর্শন। ফল যা হবার তাই হল। সাধারণ মানুষ নিজেদের সরিয়ে নিলেন। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে গোটা কর্মসূচির সামনে যে সম্ভাবনা ছিল তার অপমৃত্যু ঘটল।

দেশে দেশে সাক্ষরতা

1990 সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল 529 কোটি। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ছিল 1.8 শতাংশ। এই বৃদ্ধির হার বজায় থাকলে পৃথিবীর জনসংখ্যা 600 কোটির কাছাকাছি। 1989 সালে ইউনেস্কোর হিসাব অনুযায়ী 15 বছর ও তদূর্ধ্ব নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল 96 কোটি 26 লক্ষ। পুরনো প্রবণতা থেকে দেখা যাচ্ছে নিরক্ষরের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। 1970-এ বিশ্বে সাক্ষরতার হার ছিল 61.5 শতাংশ, তা 1985 তে বেড়ে 70.6 শতাংশে পৌঁছলেও নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় পাঁচ কোটি। অর্থাৎ সাক্ষরতার শতকরা হার বাড়লেও নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা সমান তালে বেড়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। 1951 সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল 25.5 কোটি। 1991 তে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 37.2 কোটি। অথচ এই সময়ের মধ্যে সাক্ষরতার হার বেড়েছে প্রায় 30 শতাংশ। 1991 এর আদমসুমারীর তথ্য অনুযায়ী 52 শতাংশ সাক্ষরতার হার হলেও এই সময় পৃথিবীর নিরক্ষর মানুষের 29.6 শতাংশ বাস করতেন ভারতবর্ষে।

জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের প্রথমে লক্ষ ছিল 345 টি জেলার 15-35 বয়ঃগোষ্ঠির আট কোটি মানুষকে ব্যবহারিকভাবে সাক্ষর করে তোলা হবে 1995 সালের মধ্যে। কিছুদিনের মধ্যে মিশন ঠিক করল তার লক্ষকে সম্প্রসারিত করবে। 1998 -99 সালের মধ্যে দশ কোটি মানুষকে তারা সাক্ষর করবে এবং 2005 সালের মধ্যে দেশে সার্বিক সাক্ষরতা আনবে। বর্তমানে দেশের 520 টি জেলার মধ্যে 448 টি জেলাকে সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। 13 কোটি মানুষকে সাক্ষর করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে 1 কোটি স্বেচ্ছাসেবক যুক্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যে 7.2 কোটি মানুষ সাক্ষর হয়েছেন। সাক্ষরতা- উত্তর কার্যক্রম চলছে 178 টি জেলায়।

1991 সালের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ছিল 2.40 কোটি। অর্থাৎ জনসংখ্যার 57.72 শতাংশ ছিল নিরক্ষর। পশ্চিমবঙ্গে প্রথমে 13 টি জেলায়, পরে সবকটি জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি চালু হয়েছিল। জেলা সাক্ষরতা সমিতির পরিচালনায় অভিযান চলেছে। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, উত্তর 24 পরগণার মত কয়েকটি জেলাকে সার্বিক সাক্ষর ঘোষণা করা হয়। সে সব এলাকায় সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচি চলছে। উপরের সব দায়িত্ব জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা যাচ্ছে 1991 সালে সারা দেশে সাক্ষরতার গড় হার যা 52 শতাংশে ছিল, বর্তমানে 1998 তে তা বেড়ে হয়েছে 64 শতাংশে। সংস্থা আরেকটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য দিয়েছে, এই প্রথম গ্রামাঞ্চলে

সাক্ষরতার হার শহরাঞ্চলের চেয়ে 2 শতাংশ বেশি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা মন্ত্রী রাজ্য বিধানসভায় জানিয়েছিলেন যে রাজ্যে সাক্ষরতার হার পৌঁছেছে 72 শতাংশে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির বড় বড় দাবি সত্ত্বেও বাস্তব ছবি আমাদের সামনে যা ফুটে ওঠে তা মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। কারণ এসবের পাশে নির্মম ছবিটা হচ্ছে, বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় 100 কোটি নিরক্ষরকে নিয়ে আমরা একুশ শতকে প্রবেশ করতে চলেছি বলে সম্প্রতি জানিয়েছে ইউনিসেফ 'বিশ্বের শিশুদের অবস্থা' শীর্ষক রিপোর্টে। এদের মধ্যে এক বড় সংখ্যকের ঠিকানা হবে ভারতবর্ষ। এই রিপোর্টে আরও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে এই নিরক্ষর মানুষেরা, যাদের বেশির ভাগ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন, তাদের দরিদ্রতর অবস্থায় দিন যাপন করার পাশাপাশি অত্যন্ত খারাপ স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যে থাকতে হবে। আমাদের দেশ বা রাজ্য এর প্রভাব থেকে কিছুতে দূরে থাকতে পারে না। অথচ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে, কিংবা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারি বাজেটে আগের চেয়ে সাক্ষরতার পেছনে ব্যয় বরাদ্দ অনেক পরিমাণে বেড়েছে, কিন্তু প্রত্যাশিত ফললাভ যে হচ্ছে না মানুষ তা বাস্তব অভিজ্ঞতায় থেকে বুঝছেন। অথচ ব্যর্থতার কারণগুলি অনুসন্ধানের কোন দায় কর্তাব্যক্তিরা নিতে রাজি নন। আসলে সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে যখন থেকে আমলা ও রাজনীতিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল সে সময় থেকেই চটজলদি বাহাদুরি নেবার প্রবণতা সেখানে প্রকট হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলাকে যেভাবে সার্বিক সাক্ষর ঘোষণা করা হয়েছিল তাতে কর্মসূচির মোহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট ছিল। এ ছবি দেশের প্রায় সর্বত্র। অবশ্য বিভিন্ন সমীক্ষা কমিটির বা অরুণ ঘোষ কমিটির সুপারিশ যা বলেছে তারপর থেকে এই ঘোষণার প্রবণতা কিছুটা কমলেও সাক্ষরতা কর্মসূচিতে গতি সঞ্চার করা যায়নি।

বিশ্বসাক্ষরতার জুরীবোর্ড 88 সালে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে তাদের 21 তম বার্ষিক প্রতিবেদনে বিশ্বে নিরক্ষরতার ভয়াবহতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানেও যথোচিত গুরুত্ব দিতে বলেছিল। এর ফলে চীন, ব্রহ্মদেশ, কিউবা বা তানজানিয়ার মত গণসাক্ষরতা কর্মসূচি রূপায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এদেশে। ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞরা এই কর্মসূচি রূপায়নের ব্যাপারে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। ঐ সব দেশে সাক্ষরতা কর্মসূচি রূপায়ণে দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে সামাজিক ও রাজনৈতিক 'কমিটমেন্ট' ছিল এবং কাস্ত্রো, মাও জেদং বা তানজানিয়ার জুলিয়াস নিয়েরে বা ব্রহ্মদেশের নে উইনের মত নেতৃত্বের যে আগ্রহ ছিল, ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে তার অভাব রয়েছে। এই রাজনৈতিক কমিটমেন্টই যে সাক্ষরতা প্রসারে সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি তা কোঠারি কমিশনের রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছিল। অথচ কেন্দ্রের সরকার তো বটেই, এ রাজ্যে বামপন্থী সরকারেরও সেই রাজনৈতিক সদিচ্ছার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও সাংসদ ডঃ অশোক মিত্র স্বয়ং তাঁদের দলীয় এক পত্রিকার শারদ সংখ্যায়।

সাক্ষরতা কর্মসূচি :

সরকারি সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি ঘোষিত হবার পর দেশের শিক্ষিত মানুষ সহ সমাজের একটা বড় অংশের মানুষ সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও কর্মসূচিতে দেশের মানুষকে ব্যাপক ভাবে সমবেত করা যায়নি।

সাক্ষরতা কর্মসূচির সাফল্যের একটি বড় শর্ত হল প্রশিক্ষক/স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ। অথচ এই বিষয়টি বিভিন্নভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। যা মূল কাজকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। প্রশিক্ষকদের এক বড় অংশের মধ্যে গণসাক্ষরতা কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও পথ সম্পর্কে সচেতনতার ঘাটতি থাকায় তারা পড়ুয়াদের অনুপ্রাণিত করতে পারেননি। পড়ুয়াদের অন্যভাবে অনুপ্রাণিত করার বিষয়টিতেও যথেষ্ট ত্রুটি দেখা যায়। এই রাজ্যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠান যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচিতে নিয়োজিত, সীমিত এলাকাভিত্তিক কাজে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছেন, সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সহযোগিতা চাওয়া হয়নি কিংবা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান হয়নি। সাক্ষরতা মিশনের ঘোষণা ছিল সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়সাধন। একে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।

সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অনুসৃত হচ্ছে যে আই সি সি এল (Improve Pace and Content of Learning) পদ্ধতি, ছোট ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা থাকলেও বড় পরিসরে তা কতটা সাফল্য অর্জন করতে পারে সে নিয়ে সংশয় রয়েছে। জেলাভিত্তিক বড় প্রকল্প রূপায়ণের আগে ছোট আকারে একটি বা কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে স্থানীয় ভিত্তিতে সম্পদ সংগ্রহ করে পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালু করাটা অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত ছিল, তা করা হয়নি। অথচ ভবিষ্যতে বড় কাজের পক্ষে সহায়ক এই ধরনের Pilot Project না চালু করে অভিজ্ঞতাহীন অবস্থায় বড় কাজে ঝাঁপান হল।

সাক্ষরতা কর্মসূচি শুরুর আগে জনসংখ্যা ও গোষ্ঠির ভিত্তিতে সমীক্ষার বিষয়টি আমল দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র আদমসুমারির রিপোর্টে উল্লিখিত নিরক্ষরের সংখ্যা জানাটা যথেষ্ট নয়, গোষ্ঠিভিত্তিতে বা বয়সভিত্তিতে চাহিদার প্রকৃতি ভিন্ন হয় এবং সে দিকে লক্ষ রেখে সাক্ষরতার পাঠক্রম ঠিক করার জন্য বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন। কর্মসূচি ছকার সময় এলাকারও বৈশিষ্ট খেয়াল রাখা প্রয়োজন। বড় জেলার কর্মসূচি রূপায়ণের সময় সমন্বয়ের অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর আমলা বা রাজনীতিকরা থাকলেও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়নি তেমন গুরুত্ব দিয়ে। এছাড়াও সাক্ষরতা কর্মসূচির সাফল্যের অন্যতম শর্ত হল পড়ুয়াদের কাছে শিক্ষার উপকরণগুলির নিয়মিত সরবরাহ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সরবরাহ ছিল অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। সাক্ষরতা কার্যক্রম চলাকালীন সংবাদপত্রে বহু সময় এ ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে কিভাবে বহু জায়গায় প্রকল্প চালু হওয়ার দীর্ঘদিন পরেও বই, স্লেট ইত্যাদি পৌঁছয়নি।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ব্যাপারে সংবিধানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, সে বিষয়ে সকলের অনীহা। আবার এর সঙ্গে রয়েছে মাঝপথে বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া (ড্রপ আউট)। দেশে এবিষয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে রাজস্থান। সেখানে ড্রপ আউটের হার 78 শতাংশে। আমাদের রাজ্য দ্বিতীয় স্থানে— 65 শতাংশে ড্রপআউটের হার সহ। মেয়েদের মধ্যে এই হার বেশি। এরাই কিছুদিনের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্জিত শিক্ষা ভুলে গিয়ে নিরক্ষরের দল ভারি করে। এদেশে বা রাজ্যে নিরক্ষর মানুষের একটা বড় অংশে এই বিদ্যালয়-ছুটরা। একে প্রতিরোধ করার কোন কার্যকরি ব্যবস্থা নেই আমাদের দেশের বা রাজ্যের বেহাল প্রাথমিক শিক্ষায়। বিপরীতে, সাক্ষরতা অর্জন করেছেন এমন পড়ুয়ারাও সবক্ষেত্রে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছেন, তা বলা যায় না। কারণ উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। এই সদ্যসাক্ষরদের জন্য দরকার সাক্ষরতা-উত্তর কার্যক্রম। সেটি সাক্ষরতা কার্যক্রমের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাক্ষরতা বিশেষজ্ঞদের মত হল একজন পূর্ণ সাক্ষর মানুষ আবার চর্চার অভাবে নিরক্ষরতায় ফিরে যেতে পারেন মাত্র 240 দিন বা 8 মাসের মধ্যে। একারণে সাক্ষরতা-উত্তর কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাকে গোটা কর্মসূচির প্রথম কয়েক বছর চূড়ান্তভাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল। ফলে যারা সাক্ষরতা পাঠক্রমের মানোত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাদের জন্য উপযুক্ত পরবর্তী পাঠক্রম না থাকায় অনেকে আবার নিরক্ষরতায় ডুবে যান।

ব্যাপক অর্থ

সাক্ষরতার অর্থ শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নয়। কিন্তু এটিই প্রাথমিক ব্যাপার। এই বর্ণমালা শিক্ষাটা কোন অরাজনৈতিক ব্যাপার নয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্যকারি সংস্থাগুলো, মিশনারি বা কর্মী ও অরাজনৈতিক (?) বিশেষজ্ঞদের মত জাতীয় সাক্ষরতা মিশনও ভান করেছে, এখানে কোন রাজনীতি নেই। আর এইভাবে তথাকথিত রাজনীতিহীনতা নিরক্ষরতার সমস্যা মোকাবিলায় ক্রমাবনতি ঘটিয়েছে বা তার ব্যর্থতা ডেকে এনেছে। আমাদের রাজ্যের বামপন্থী সরকারও বিষয়টিকে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি অনুসারে চালাতে গিয়ে সাক্ষরতা কার্যক্রমের ব্যাপক রাজনৈতিক পটভূমিকাকে কার্যত উপেক্ষা করেছেন। ষাটের দশকে কিউবা, ভিয়েতনামের সাফল্যের কথা চেঁচিয়ে জনসভায় বললেও যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পৃক্ত সাক্ষরতা কর্মসূচি তাদের সাফল্য এনেছিল, তাকে সামান্য অনুসরণ করেন নি। কাজটা চালিয়েছেন পশ্চিমী মডেলেই, যা এদেশের বাস্তবতা বিরোধি।

দরিদ্র দেশগুলিতে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রমাণ করে সেখানকার রাষ্ট্রনায়কদের এই সমস্যা দূর করার বিষয়ে অনীহা, কার্যতাকে, উদ্যোগহীনতাকে। ভারতবর্ষে গত পঞ্চাশ বছরে যাঁরা শাসনক্ষমতার সঙ্গে নানা ভাবে সংশ্লিষ্ট তাঁদের অনীহা ও উদ্যোগহীনতা সমস্যাকে বাড়িয়েছে। এ রাজ্যেও বিভিন্ন রং-এর শাসকরা সমস্যাটিকে উপেক্ষা করেছেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশের সাক্ষরতা-মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীয়, একাত্তর সালে যা দাঁড়ায় ত্রয়োদশ স্থানে, আর একানব্বইতে গিয়ে পৌঁছেছে সপ্তদশ স্থানে।

বিষয়ের অবাস্তবতা

এরপর আসে পাঠ্যবিষয়ের ব্যাপারটি। সমাজের গভীরে ঢুকে থাকা অসাম্য ও জন্মকে স্বীকার না করার ফলে বাস্তবধর্মী পাঠক্রম রচনা সম্ভব হয়নি। বরং গতানুগতিক, উদ্দেশ্যহীন সাক্ষরতা কর্মসূচি, যেখানে সাক্ষরতা অর্জনের জন্যই সাক্ষরতার কথা বলা হয়, সে ধরনের শিক্ষক্রমই অনুসৃত হয়েছে। সরকারি বা আন্তর্জাতিক সাহায্যকারি সংস্থাগুলির নতুন উন্নয়ন কর্মসূচি, যার মধ্যে রয়েছে পরিকল্পিত ছোট পরিবার, শিশুপালন, পরিচ্ছন্নতা, সুষম খাদ্য, উন্নত প্রযুক্তি এবং আমলাতান্ত্রিক কর্মসূচিকে সমর্থনের

মধ্যে দিয়ে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের ক্রমশ উন্নতি, হলে ঘুত হয়েছে দলীয় পঞ্চায়েতের গুণকীর্তন — এই সব বিষয়ের ওপর প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব পড়েছে। সব দুঃখ, যন্ত্রণা, ভয় দূরে সরিয়ে একটি তথাকথিত যুক্তিপূর্ণ সুখময় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ওপর। ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন, বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী একজন শিক্ষার্থীকে কল্পনা করে নেওয়া হয়, যে জীবনের বড় বড় সমস্যার সমাধান করবে। সে তার হিসাবমত খরচ করে, সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে প্রযুক্তি সহায়কের উপদেশমত ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র উদ্যোগ চালু করে, পঞ্চায়েতের সাহায্য নেয় যা পঞ্চায়াতের কাজে সক্রিয় অংশ নেয়। তার শ্রীও ক্রমশ বুঝতে পেরে অর্থ আয়ের পথে যায়। অর্থাৎ সাক্ষরতার যে পাঠক্রম এদেশে চালু করা হয়, যে বইকে সরকারি কর্তারা অনুমোদন দেন, সেখানে শিক্ষার্থীকে হাজির করা হয়েছে এমনভাবে যে তার জীবনের সব সমস্যাকে মনে করে একটি অসংগঠিত চিন্তাভাবনাহীন অজ্ঞব্যক্তির কাজের ফল বলে। এর থেকে সে পরিত্রাণ পাবে নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মেলে না। তার চোখের সামনে ঘটা পুলিশ, আমলা, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের কথা পাঠ্যপুস্তকে নেই। জগৎজীবন সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টি গড়ে তুলে মানুষকে রাজনীতি-সচেতন করে না এইসব সাক্ষরতার পাঠ্যপুস্তকগুলি।

সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর আওতায় 9-60 বছর বয়ঃক্রমের সব নিরক্ষরকে আনার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে নানা বয়ঃগোষ্ঠী, জাতি, গোষ্ঠী, পেশার মানুষরা রয়েছেন। তাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা। সেই উপযোগী সাক্ষরতা পাঠক্রম না হলে তা আগ্রহের সঞ্চার করতে পারে না। সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, এলাকাগত বৈশিষ্ট মাথায় রেখে শিক্ষার উপকরণ প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সবক্ষেত্রে বিরাজমান ভয়াবহ লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টিও নজরে রাখা দরকার।

উপসংহার

অধিকাংশে নিরক্ষর মানুষ এমন একটি আবহাওয়ায় থাকেন যেখানে শিক্ষাহীনতার পরিবেশ বর্তমান। সেখানে সাক্ষরতার বাস্তব প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে সাক্ষরতা সম্পর্কে আগ্রহ জাগানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। অথচ এটিই প্রাথমিক কাজ। আসলে সরকারি কর্মসূচিতে সাক্ষরতার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তার যান্ত্রিকতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার এই মূল বিষয়ের গুরুত্ব কমে গেছে। এখানে সাক্ষরতা কর্মসূচির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থী যাতে তার বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে নিজের বাস্তব জ্ঞান ও দক্ষতাকে আত্মোন্নয়নের কাজে লাগতে পারে। সমস্যা সমাধানের জন্য শুধুমাত্র ব্যাপকভাবে নতুন নতুন সাক্ষরতা প্রকল্প তৈরি করা কিংবা পরবর্তী শিক্ষার সুযোগ দিয়ে সাক্ষর মানুষের সংখ্যা বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা নয়, কারণ নিরক্ষরদের কাছে বিষয়টি অবান্তর। সাক্ষরতার দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি মনে রাখা দরকার এদের খুব সামান্য অংশই সমাজের কাজে লাগে। ফলে অনেক বড় ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাজ হল বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য ব্যক্তি ও পরিবারে একটি আয়ের ব্যবস্থা করা, যা তাদের জীবনের প্রয়োজন মেটাবে। সাক্ষরতায় আগ্রহী করে তুলবে। আসলে আমাদের প্রথাগত শিক্ষার মত সাক্ষরতা কর্মসূচিরও ত্রুটি হল সাধারণত দেশের ব্যাপক গ্রামীণ জনগণের জীবনের সমস্যার সঙ্গে তা সম্পৃক্ত না হওয়ায় মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে না।

আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতার পাশাপাশি কোথাও চূড়ান্ত সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি সাক্ষরতার ভবিতব্য নির্ধারণ করেছে। এদের কাছ থেকে নতুন ধরণের চিন্তাশীলতা আশা করা বৃথা। আমরা অপেক্ষায় আছি কোটি কোটি টাকা অপচয়ের পর গতিহীন এই সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচীকে কবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হবে ?

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা

নির্মলেন্দু নাথ

আমাদের এই সমাজে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। সাধারণভাবে এই স্তরগুলি হল প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক স্তর, উচ্চতর শিক্ষা।[1] বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারতীয় অর্থনীতির বিবর্তনের সঙ্গে এই গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাতেও একটা বিবর্তন এসেছে। অর্থনীতি তথা শিক্ষা ব্যবস্থাতে বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চতর শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চশিক্ষায় সম্প্রসারণের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আলোচনার শুরুতে এ কথা বলা দরকার যে প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের দুটি বার্ষিক প্রতিবেদন ও সেন্সাস 1991 থেকে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজন মত কিছু তথ্য বিশ্বব্যাঙ্কে প্রকাশিত মানব-উন্নয়ন প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে। তথ্যের বিভিন্নতার জন্য তথ্যের অসামঞ্জস্যজনিত সমস্যা এখানে কিছুটা থেকে গেছে। দ্বিতীয়তঃ উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা সম্পূর্ণ করার জন্য ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য আলাদা করে বিষয়টা দেখা দরকার। এখানে এই পার্থক্য করা হয় নি। তৃতীয়তঃ কর্মরত জনসমষ্টির মধ্যে উচ্চশিক্ষার ধরণ, এর প্রকৃতিও আলোচনায় আনা হয় নি। এই তিন ধরনের সীমাবদ্ধতা স্মরণে রেখে প্রথমে সারা ভারতে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের ধরণ অনুধাবন করা হবে তথা পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যান্তরে পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি অনুধাবন করা হবে।

(I)

1950-51 থেকে 1993-94 এর পরিসরে সারা ভারতে উচ্চতর শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা কিভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে তা দুটি সূচকের দ্বারা এখানে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা, দ্বিতীয়টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা থেকে।

সারণী-1-এ সারা ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা 1950-51 থেকে 1993-94 এর পরিসরে নথিবদ্ধ করা হয়েছে আর সারণী -2 তে পরিসংখ্যানের অভাবে নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 1975-95 অর্থাৎ বিগত 20 বছরে কিভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে তা বলা আছে।

সারণী-1 এ দেখা যায় 1950-51 সালে ভারতে 370 টি সাধারণ ডিগ্রী কলেজ ও 27 টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।[2] 1993-94 সালে অর্থাৎ প্রায় 46 বছর বাদে সাধারণ ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা হয় 5639 এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় 213 টি। এ থেকে বলা যায় পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি কলেজের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় 15 গুণ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় 8 গুণ।

1950-51 থেকে 1993-94 এর পরিসরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ কিন্তু সমভাবে হয় নি, সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারণ লক্ষ করা যায় 1960-61 সালে। 1955-56 থেকে 1960-61 এর পরিসরে সাধারণ ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা 466 থেকে 967 হয়, শতকরা বৃদ্ধির হার হয় বার্ষিক 23 শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও এই সময়সীমায় 31 থেকে 45 হয়। সম্প্রসারণের প্রায় বিপরীত চিত্র দেখা যায় 1975 থেকে 1980 এর পরিসরে। এই পরিসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র 9 টি বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা হ্রাস পায়। দেখা যায়, 1975-76 সালে সাধারণ ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা 3667 টি থাকলেও 1980 সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় 3421 টি। অর্থাৎ সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে 246 টি কলেজ উঠে যায়।[3] সংক্ষেপে বললে, স্বাধীনতার পরবর্তী সাড়ে চার দশকে কলেজের সংখ্যা সম্প্রসারিত হয়েছে প্রায় 15গুণ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সম্প্রসারিত হয়েছে প্রায় 8 গুণ। এই সম্প্রসারণ কিন্তু সমভাবে হয় নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বছরগুলোতে এই সম্প্রসারণ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। বিপরীতে সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যার সম্প্রসারণ সবচেয়ে কম হয় আর কলেজের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এক কথায় বললে উচ্চশিক্ষাস্তরে সারা ভারতে কোন নির্দিষ্ট হারে সম্প্রসারণ ঘটেনি। কখনও সম্প্রসারণ কখনও সংকোচন হয়েছে। সবশেষে বিগত বছরগুলোতে উচ্চশিক্ষা সর্বভারতীয় স্তরে বিবর্তিত হলেও সম্প্রসারণের হার ক্রমশঃ স্তিমিত হয়।

(2)

সর্বভারতীয় স্তরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কখনও সম্প্রসারণ কখনও সংকোচন-এর এই চিত্রটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পর্যালোচনা করলেও বোঝা যায়। এখানে দেখা যায় 1975-76 থেকে 1980-81-এর সময়সীমায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 3.26 লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে আর 1985-86 থেকে 1990-91 সালে এই বৃদ্ধি হয়েছে 13.2 লক্ষ। পরবর্তী 5 বছরে এই বৃদ্ধি হয়েছে 11.89 লক্ষ।[4] কাজেই বলা যায় স্বাধীন ভারতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ একটা নির্দিষ্ট গতিতে পরিলক্ষিত হয় নি। সম্প্রসারণের হার 1980-91 এর পরিসরে উত্তরোত্তর বাড়লেও পরবর্তী পর্যায়ে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

সর্বভারতীয়স্তরে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের হারের মন্থরগতির পাশাপাশি রাজ্যস্তরে উচ্চশিক্ষার প্রসারের ধরণ এবার আলোচনা করা হবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা বিন্যাস ও উচ্চশিক্ষাতে নাম নথিভুক্তকরণের অনুপাত (Enrolment ratio)-এর সাহায্যে বিভিন্ন রাজ্যে সম্প্রসারণের ধরণ পর্যালোচনা করা হবে।

প্রাথমিক ভাবে বলা দরকার 1991 এর সেন্সাস অনুসারে ভারতে ছোট-বড় 25 টি রাজ্য রয়েছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এক রিপোর্টে দেখা যায় 1994-95 সালে এই সব রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রায় 61 লক্ষ 14 হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ঐ একই সময়ে ভারতের 16 টি বড় রাজ্য-এ উচ্চশিক্ষায় মোট 58 লক্ষ 54 হাজার ছাত্রছাত্রী নাম নথিভুক্ত করেছে। সুতরাং বলা যায় ভারতে উচ্চশিক্ষায় নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায় 95 শতাংশ ছাত্রছাত্রী এই 16 টি রাজ্যে রয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় নথিভুক্ত এই সাড়ে 58 লক্ষ ছাত্রছাত্রী নির্বাচিত 16 টি রাজ্যে কিন্তু সমভাবে বিন্যস্ত নেই। সারণী-3এ দেখা যায় 1994 সালে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 9 লক্ষ 51 হাজার বা মোট নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের 16.24 শতাংশ। হিমাচল প্রদেশে এই সংখ্যা মাত্র 0.6 শতাংশ। অঞ্চল ভেদে এই রাজ্যগুলিকে বিভক্ত করলে দেখা যাবে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে (অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ও কর্ণাটকে) এই শতাংশ 7.12 থেকে 8.32-এর মধ্যে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ যাদে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর শতাংশ অপেক্ষাকৃত কম। পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার নথিভুক্ত সারাভারতের মোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 6.60 শতাংশ অর্থাৎ তিন লক্ষ 54 হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। পূর্বাঞ্চলের অপর রাজ্য বিহারে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষায় নাম নথিভুক্ত করেছে। 1994 সালে দেখা যায় বিহারে 4 লক্ষ 75 হাজার ছাত্রছাত্রী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করেছে। রাজ্যভিত্তিক নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর বিন্যাস সুষম নয় এক্ষেত্রে সম্যক পার্থক্যের মান 65.72 শতাংশ। প্রসঙ্গত বলা দরকার রাজ্যগুলির অসম আয়তন এর একটা কারণ।

উচ্চ-শিক্ষায় নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর রাজ্যভিত্তিক বিন্যাস যে সুষম নয় তা উচ্চ-শিক্ষায় নাম নথিভুক্তকরণের অনুপাত থেকেও বোঝা যায় (সারণী-3এর পঞ্চম কলম)।

এখানে দেখা যাচ্ছে মহারাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষাতে নাম নথিভুক্তিকরণের অনুপাত সবচেয়ে বেশি (13.24 শতাংশে) আর রাজস্থানে এই অনুপাত সবচেয়ে কম (5.55 শতাংশে)। এখানে বলা দরকার সর্বভারতীয় স্তরে উচ্চশিক্ষাতে নাম নথিভুক্তকরণের অনুপাত 60 শতাংশে।[5] দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে এই অনুপাত হল কর্ণাটক 11.41 শতাংশে তামিলনাড়ু 7.85 শতাংশে কেরালা 5.57 শতাংশে। এদিকে প্রতিবেশী রাজ্য অসম, বিহার ও উড়িষ্যায় উচ্চ-শিক্ষাতে নাম নথিভুক্তকরণের অনুপাত পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি রয়েছে। বিশেষ করে উড়িষ্যার কথা বলা দরকার। ওই রাজ্যে 20-24 বৎসর বয়সশ্রেণীতে 2817.7 হাজার জনসমষ্টির মধ্যে 7.27 শতাংশে ছাত্রছাত্রী উচ্চতর শিক্ষাতে নাম নথিভুক্ত করেছিল, যেখানে পশ্চিমবাংলায় ঐ একই বয়সশ্রেণীতে 6331.2 হাজার জনসমষ্টির মধ্যে 5.60 শতাংশে ছাত্রছাত্রী উচ্চতর শিক্ষাতে নাম নথিভুক্ত করেছিল। বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ ও আলোচনার দাবী রাখে। সংক্ষেপে বললে, উচ্চশিক্ষায় নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর রাজ্যগত বিন্যাস সুষম নয়। এছাড়া পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে উচ্চশিক্ষায় নাম নথিভুক্ত করণের মানদণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান সকলের নিচে।

(3)

সর্বভারতীয় স্তরে উচ্চশিক্ষার গতি প্রকৃতি ও রাজ্যভিত্তিক বিন্যাস অনুধাবন করার পর এবার পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ-শিক্ষার গতিপ্রকৃতি ও জেলাভিত্তিক বিন্যাস আলোচনা করা হবে। সারণী-4 এ দেখা যায় 1951 সালে এই রাজ্যে কলেজের সংখ্যা ছিল

111 টি। 1998 সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় 375 টি। সারণী -4-এ আরো দেখা যায় 1961-71- এর পরিসরে কলেজের সংখ্যা 153 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 263 হয়েছে। এক্ষেত্রে বার্ষিক বৃদ্ধির হার হল 7.19 শতাংশ। 1971-81- এর পরিসরে এই বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও 80'র দশকে তা বৃদ্ধি পায়। 1991-98- এর পরিসরে এই বৃদ্ধির হার আবার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। নব্বই-এর দশকে কলেজ-এর সংখ্যা বৃদ্ধির মন্থরতাই বোধ হয় এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষার নাম নথিভুক্তিকরণের অনুপাতকে 5.60 শতাংশে নামিয়ে দিয়েছে।-

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক চিত্র সারণী- 5 রাখা হয়েছে। প্রত্যেক জেলাতে সাধারণ ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা, ডিগ্রী কলেজে পাঠরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, স্নাতক বিষয় সহ কলেজের সংখ্যা ও কলেজে অধ্যয়নরত গড়-ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার সাহায্যে এই চিত্র পরিস্ফুট করা হয়েছে। এখানে দেখা যায় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে মোট 63 টি কলেজ রাজ্যের মোট কলেজের 19.2 শতাংশে রয়েছে। এবং রাজ্যের উচ্চশিক্ষায় নথিভুক্ত মোট ছাত্রছাত্রীর 11.2 শতাংশে এই কলেজগুলোতে পড়ে। অপরদিকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে রাজ্যের মোট 327 টি কলেজের মধ্যে 264 টি রয়েছে (80 শতাংশে)এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠরত মোট ছাত্রছাত্রীর 88.8 শতাংশে দক্ষিণবঙ্গের কলেজগুলোতে অধ্যয়ন করছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে আবার একমাত্র কলকাতা জেলাতেই 63 টি কলেজে মোট ছাত্রছাত্রীর প্রায় 30 শতাংশে নাম নথিভুক্ত করেছে। গড় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার বিচারে দেখা যায় কলকাতা জেলার কলেজগুলোতে পড়ে 1511 জন ছাত্রছাত্রী নাম নথিভুক্ত করেছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে কলেজে গড় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 493 থেকে 627 এর মধ্যে। এর বিপরীতে মধ্যপাদের সমভূমির জেলাগুলোতে কলেজে গড় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 942 থেকে 1511 এর মধ্যে। দক্ষিণবঙ্গে মধ্যপাদের সমভূমির বাইরে বীরভূম জেলার কলেজগুলোতে গড় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 1239। এ থেকে বোঝা যায় এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ সমভাবে ঘটে নি। এখানে আরো বলা যায় একই জেলার যে সব কলেজ রয়েছে তার মধ্যেও ছাত্র-সংখ্যার তারতম্য রয়েছে।

(4)

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটতে হলেও তা তুলনামূলকভাবে এখনও কম। এছাড়া রাজ্যস্তরে এবং জেলাস্তরে আঞ্চলিক বৈষম্য এখনও বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় সবিশেষ বলা দরকার।

অনেকের ধারণা যত সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত মানুষ দেশের বাস্তব প্রয়োজন সে তুলনায় আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি। বিষয়টির উত্তর নির্ভর করে প্রয়োজন নির্ধারণের মানদণ্ডের উপর। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সবকিছুর নিয়ামক হল বাজারের দর, চাহিদা ও যোগানের হিসাব। কিন্তু বাজারের চাহিদা ও সমাজের বাস্তব প্রয়োজন এক নয়। এ দেশের অর্থনীতিতে বাজারের চাহিদা বাস্তব প্রয়োজনের অনেক নিচে পড়ে থাকে। যেমন ধরা যাক্ আমাদের দেশে প্রত্যেকটি নরনারী ও শিশুকে যদি সভ্য ও স্বাস্থ্যবান সমাজের উপযুক্ত কাপড় পরাতে হয় তাহলে দেশে যে পরিমান কাপড় এখন তৈরি হয় তাতে কুলাবে না। অথচ যা তৈরি হচ্ছে তারই কেনার ক্ষমতা দেশের মানুষের নেই, একটা অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বাজারের চাহিদা ধরলে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনের কথা ভাবলে এই সংখ্যা সামান্যই মনে হয়।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধ সম্প্রসারণের মধ্যেই ইদানীং কালে 'উৎকর্ষতা' বাড়াবার কথা নানান মহলে আলোচিত হচ্ছে। এর ফলে উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতঅর্থে 'জনমুখী' হয়ে উঠবে না অন্য কিছু হবে তা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা যাবে।

টীকা ঃ

1. প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী হল প্রাথমিক স্তর (এই স্তরে বয়সের শ্রেণী হল 6-14 বছর)। নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী হল মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (বয়সের শ্রেণী 14-17 বছর)। এছাড়া উচ্চতর শিক্ষা হল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (বয়সের শ্রেণী 17 থেকে 23 বছর বয়স)। জনসংখ্যাতত্ত্বের গোড়ার কথা, প্রভাত কুমার মজুমদার, পৃ - 40।
2. এখানে বলা দরকার 1951 সালে ভারতে কারিগরী শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য আরো 208 টি কলেজ ছিল *Annual Report on-Higher Eduction. '98 page 169 Govt. of West Bengal.*
3. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন স্বীকৃত কলেজগুলোকে 2(f) কলেজ বলা হয়। এই কলেজ মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্য পেয়ে থাকে। এটা এমন হতে পারে এই 246 টি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের স্বীকৃতি পায় নি।
4. বর্তমানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় 67 লক্ষ।
5. *Human Development Report in south Asia, p 50.*

তালিকা - 1

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		
1950-51	370		27	-
1955-65	466	25.94	31	14.81
1960-61	967	116.66	45	45.16
1965-66	1538	58.84	64	42.22
1970-71	2285	47.00	82	28.13
1975-76	3667	60.48	101	23.17
1980-81	-3421	-6.79	110	8.91
1985-86	4067	18.88	126	14.55
1990-91	4862	38.65	184	46.03
1993-94	5639	15.98	213	15.76

সূত্র : *Annual Report of Department of Higher Education Govt. of W. B.-98, P. 169*

তালিকা - 2

[illegible]

[illegible]	[illegible] (লক্ষ)	[illegible]
1975-76	24.26	-
1980-81	27.52	13.44
1985-86	36.05	30.99
1990-91	49.25	36.62
1994-95	61.14	24.14

সূত্র : *Annual Report 1996-97 W. B. P. 51.*

তালিকা - 3

[illegible]

[illegible]	20-24 বছর বয়সী [illegible] (1991)	[illegible] (1994)		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	5852.7	427.7	7.30	7.31
[illegible]	2241.4	148.2	2.53	6.69
[illegible]	6823.5	475.2	8.10	6.96
[illegible]	4006.9	416.9	7.10	10.19
[illegible]	1646.3	142.3	2.40	8.64
[illegible]	480.8	35.4	0.60	7.36
[illegible]	4272.8	478.6	8.32	11.41
[illegible]	3230.0	180.1	3.07	5.57
[illegible]	5823.9	375.3	6.49	6.44
[illegible]	7183.3	951.0	16.24	13.24
[illegible]	2817.7	205.1	3.50	7.27
[illegible]	1946.9	186.8	3.19	9.59
[illegible]	3696.4	205.2	3.51	5.55
[illegible]	5306.5	416.7	7.12	7.85
[illegible]	11407.2	~~843.3~~	~~14.47~~	7.42
[illegible]	6331.2	354.8	~~6.60~~	5.60
			100.00	

সূত্র : *State Profile of India, Census, 1991; Annual Report 1996-97 P. 51*
Govt. of W. B.

Enrolment ratio = No. of pupils of a specified age group registered in an educational institution divided by number of boys and girls in that specified age group multiplied by 100

সারণী - 4

বছর	সংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধির হার
1951	111	
1961	153	37.83
1971	263	71.90
1981	292	11.03
1991	354	21.23
1998	375	5.93

সূত্র : *Annual Report 1998* P 288

সারণী - 5

জেলা	সরকারি হাসপাতাল সংখ্যা (1997)	শয্যা হাসপাতাল সংখ্যা (1997)	শতকরা	হাসপাতাল পিছু গড় জনসংখ্যা	হাসপাতাল পিছু গড় হাসপাতাল শয্যা সংখ্যা
বীরভূম	12	10472	3.15	12	872
বর্ধমান	24	23440	7.04	18	976
বাঁকুড়া	10	12311	3.70	8	1231
কলকাতা	65	98250	29.50	63	1511
দার্জিলিং	9	5668	1.70	6	629
জলপাইগুড়ি	12	5925	1.78	9	493
হাওড়া	23	25142	7.55	18	1093
হুগলী	16	20200	6.07	14	1262
কুচবিহার	10	4763	1.43	6	476
মালদা	8	5021	1.51	4	627
মেদিনীপুর	32	22385	6.72	31	700
মুর্শিদাবাদ	15	10332	3.10	12	688
নদীয়া	13	13400	4.05	13	1030
উত্তর দিনাজপুর	5	2843	0.85	4	568
উত্তর ২৪ পরগনা	35	41472	12.46	27	1185
পুরুলিয়া	9	4918	1.48	8	546
দক্ষিণ দিনাজপুর	4	2752	0.83	3	688
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	25	23550	7.08	19	942
	327	332844	100.00	275	1018

ছাত্র বনাম শিক্ষক ?

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

এ আলোচনা কোন তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ নয়। নিতান্তই ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে গত পঞ্চাশ বছর ধরে, কি তারও দু' একবছর বেশি সময় ধরে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি, সেই অভিজ্ঞতাজাত কিছু মতামত মাত্র। আবার এ অভিজ্ঞতাও স্থান-কাল-পাত্রে সীমাবদ্ধ। স্থান — 47 - এর আগের বঙ্গদেশের একটা অংশ, 47 -এর পরের পশ্চিমবঙ্গ, কাল — 1940 - এর দশক থেকে 1990 - এর দশকের শেষ, অর্থাৎ যুদ্ধ - দুর্ভিক্ষ - দাঙ্গা - দেশভাগ বিধ্বস্ত বাংলোদেশ-এই অভিজ্ঞতার সূচনাবিন্দু। আর পাত্র কলকাতা ও সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ।

ছাত্র হিসাবে 1940 - এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 60 - এর দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যে শিক্ষাকাঠামোর মধ্যে মানুষটি ছিল, তারপরে শিক্ষক হিসাবে যে কাঠামোকে সে এখনও পাচ্ছে তার মধ্যে মূলগত পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। এর লক্ষ প্রায় একই আছে, এদিকে ওদিকে পরিবর্তন কিছু হয়েছে : প্রাথমিক ক্ষেত্রে এর ছাপ প্রবল, মাধ্যমিকে পাঠ্যসূচী পাল্টেছে, ভাষাশিক্ষা উপেক্ষিত ও স্থান কাল-পাত্রের বোধহীনতায় বিভ্রান্ত। কিন্তু মূল কাঠামো, পদ্ধতি একই আছে। এই কাঠামোটি আমরা পেয়েছিলাম ব্রিটিশদের কাছ থেকে — মাথাভারী এক ব্যবস্থা। স্নাতকের সংখ্যা অন্যান্য দেশ যেমন চীনের তুলনায় অনেক বেশি, চার-পাঁচগুণ, আর প্রাথমিক শিক্ষা পঙ্গু, বদ্ধ । আবার ঐ স্নাতকদের অধিকাংশেই এক অর্থে "নিরক্ষর", যাঁরাই সাধারণ স্তরের কলেজের সঙ্গে যুক্ত তাঁরাই এটা জানেন। ছাত্ররাও জানে, তাই তারা কলেজকে পরীক্ষায় বসার দরজাই ভাবে, প্রত্যহ কলেজে আসার দায় থেকে মুক্তি নিয়েছে। শিক্ষকের ভূমিকাও সামাজিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক এখন।

শিক্ষার সমস্যা ও সংকট নিয়ে বিস্তর লেখা হচ্ছে, কিন্তু পৃথকভাবে শিক্ষার সংকট বলে কিছু আছে কি? একটা কথা প্রত্যক্ষে - পরোক্ষে বলা হয় যে গত দু-তিন দশক ধরে শিক্ষার মান নেমে গেছে, পঠন-পাঠন ঈপ্সিত স্তরে থাকছে না, আগের তুলনায় অবস্থা অনেক খারাপ। কিন্তু 40-50 দশকের ছাত্র হিসাবে বলতে পারি, তখন আজকের তুলনায় স্বর্ণযুগ ছিল এমন ভাবার কোন কারণ নেই। তখনও এভাবেই স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতো, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তখনও কয়েকটি প্রশ্ন উত্তর তৈরি করে ছাত্ররা পরীক্ষা দিত, কলেজ স্তরেও এখন যেভাবে পড়ানো হয় সেভাবেই হতো। এখনকার মতই ভালো শিক্ষক, ফাঁকিবাজ শিক্ষক, খারাপ শিক্ষক ছিলেন। আনুষঙ্গিক সব দোষ ত্রুটি তখনও ছিল। যেহেতু তখন ছাত্রছাত্রীদের ভীড় এখনকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ছিল, সেহেতু এসবের মাত্রাও তুলনায় কম ছিল। দুটো ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়— ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকের কাছে বিশেষ অর্থ দিয়ে পড়ার প্রবণতা কলেজস্তরে প্রায় ছিল না—অন্তত আমার বন্ধুবান্ধবরা কেউই পড়ত না। বিদ্যালয় স্তরেও এত ব্যাপক, একাধিক শিক্ষকের কাছে দৌড়াদৌড়ি করা দেখিনি। তখন এক একজন অধ্যাপক কিংবদন্তীর মানুষ হয়ে উঠতেন শিক্ষক হিসাবে ; আমাদের সময় তারক সেন, সুশোভনচন্দ্র সরকার, ভবতোষ দত্তর নাম করতে পারি, আরও নাম নিশ্চয়ই করা যায়। এখন আর এটা দেখিনা। এই দুটি পরিবর্তন কিন্তু মূলত শিক্ষাজগতের নয়—এর পিছনে আছে অর্থনৈতিক সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি। আসলে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষার সংকট সমস্যা বলে কিছু নেই—বৃহত্তর অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতির ভয়াবহ সংকটই এ জগতের সংকটের উৎস।

এখন যে সংকটের কথা বলা হচ্ছে, এর ইতিহাস সেই 1870-80-র দশক থেকেই শুরু হয়েছে। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামো নতুন শিক্ষিতদের কাছে যে দরজা খুলেছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। সে সময়েই যে সংখ্যায় শিক্ষিত হচ্ছিল তার উপযুক্ত জীবিকা ছিল না। রামমোহন ও অন্যান্যরা ইংরেজি শিক্ষা, পাশ্চাত্য শিক্ষাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়, দেশের প্রগতির বাহক হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উপনিবেশের গর্ভে জাত নতুন মধ্যশ্রেণী চাকরি জীবিকার উপায় হিসাবেই একে দেখেছিল। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে—তাদের সব বিদ্রোহ, প্রতিবাদ শেষ হয় যথাযথ চাকরি পেয়ে, এমনকি ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে পদচ্যুত করার অন্যতম ব্যক্তির জীবনীও শেষ পর্যন্ত একজন ডিরোজিয়ানই লেখেন। ইংরেজ-শাসকের বিরুদ্ধে একদা ব্রিটিশ-সহযোগী মধ্যশ্রেণীর বিরোধিতার একটা কারণ এই চাকরিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া। 1947-এর পর প্রত্যক্ষতর রাজনৈতিক উপনিবেশিকতার হাত থেকে ভারত মুক্তি পেলেও এক অর্ধ-উপনিবেশিক পরিস্থিতিতে ঢোকে, এখন বহুজাতিক উপনিবেশিক জালে বদ্ধ। অর্থনীতি বন্ধ্যা, চাকরির সব রাস্তা এক এক করে বন্ধ। শিল্পে সংকট ধারাবাহিক। নিম্ন প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে এদেশ কার্যত পরাধীন। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার সংকট তো তীব্রতর হবেই। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের স্বার্থমাফিকও একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি, কারণ অর্থনীতিতেই তাদের কোন স্বাধীন ভূমিকা ছিল

না। মাঝখানে 1914-র পর নানা সাময়িক কারণে অল্প-বা একটু এ ভূমিকা দেখা দিয়েছিল, তা আজ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এই বুর্জোয়ার পক্ষে নিজের প্রয়োজনমাফিক দেশ কাল অনুযায়ী শিক্ষা-কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিদারুণ ব্যর্থতার কারণই তাই। ফলে ঔপনিবেশিক ধারা অক্ষুণ্ণ—প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত। 1998-এও নিরক্ষরের হার শতকরা 64 –"2000 সালে ক্রমবর্ধমান নিরক্ষরতার চাপে ভারতবর্ষ হবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সংখ্যার নিরক্ষরের দেশ। সারা ভারতে গ্রামের সংখ্যা 10 লক্ষ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 5 লক্ষ।" (আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, ইরেন দাসগুপ্ত)। আর উচ্চশিক্ষায় ভীড়—চীনের থেকে পাঁচ গুণ। এ প্রসঙ্গেও মনে রাখতে হবে, এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে পড়ার মত ছাত্রসংখ্যার মাত্র 4'8 জন উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। প্রাথমিকে যারা পড়তে আসে তাদের বড় অংশ পড়া ছেড়ে দেয়, কারণ অর্থনৈতিক। শুধু অভাব নয়, পরিবারের জীবিকার কাজে লাগার জন্যও। আর ঐ কলেজে ভিড় করার কারণ বেকারত্ব, চাকরি না পাওয়া। একটি ছেলে বিষণ্ণ মুহূর্তে বলেছিল, স্যার, কলেজে পড়ার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। এ ধরণের অর্থহীন পড়া আমার ভালো লাগে না। পড়ছি শুধু একারণে যে তিনবছর অন্তত লোকে আমাকে বেকার বলবে না, ছাত্র বলবে। বস্তুত উচ্চশিক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের কারণ বেকারত্ব—এ শিক্ষা তাদের চাকরি দেবে না জেনেও নিরুপায় এই ভিড়। শুনেছি, ইংলণ্ডে তিন থেকে ষোল বছর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশে যাকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর বলি সে পর্যন্ত পাস-ফেল নেই। উত্তীর্ণ হবার পর চাকরি পায়, নয় ভাতা। সেখানকার ছেলেমেয়েরা বেশি পড়তে চায় না। আমাদের এখানেও এ ব্যবস্থা করলে বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঐ পড়া পড়তো না—এত বিপুল মানবসম্পদের অপচয় ঘটতো না। আর এই সংখ্যা, তথাকথিত গণতন্ত্রীকরণ, শিক্ষার মানকে কোথায় নামিয়েছে তা এই ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁরাই জানেন। চাকরি নেই, অর্থনীতি বন্ধ, অথচ এত ছাত্রছাত্রী—তাদের পাশ করাতে হবে। শিক্ষার ভিতই নড়ে যাচ্ছে—ঔপনিবেশিক, অব-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক বন্ধতা শিক্ষাক্ষেত্রকে অর্থহীন করে তুলছে। তৈরি করছে এক ভবিষ্যৎহীন পথহারা ছাত্রসমাজ। অর্থাৎ সেই সমস্যা যাদের হাতে আগামী দিনের ভার।

এই অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব একদিকে বিপুল অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীকে এই ধরণের শিক্ষা নিতে বাধ্য করছে—ফলে শিক্ষা হয়ে উঠছে অনিচ্ছা-কৃত্রিম ক্রিয়ার ক্ষেত্র। আবার এই মানব-সম্পদ যথাযথ কাজে লাগছে না, কারণ এরা ঠিকমত কাজের সুযোগ পেলে তাদের বুদ্ধি-শ্রম-কল্পনাকে প্রয়োগ করতে পারে। অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব সেটা করতে দিচ্ছে না। অন্যদিকে অর্থনীতির বন্ধতা, জীবিকার সুযোগ ক্রম-সঙ্কুচিত হওয়ার চাপ অন্যদিক থেকে বাড়ছে—অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের যন্ত্রবৎ নির্মাণ করতে চাইছেন। পাঠ্যসূচীর বাইরে তাদের যাবার পথ নেই, একাধিক ব্যক্তিগত শিক্ষকদের আওতায় এনে পরীক্ষা নামক বৈতরণী যাতে ওপরের দিকে থেকে অতিক্রম করতে পারে, সে চেষ্টায় নিরত তারা। তাঁরাও ঐ অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত কাঠামোর শিকার। ফলে মেধাসম্পন্ন ইস্কুল ছাত্রছাত্রীও এক সঙ্কীর্ণ দক্ষতার মধ্যে পঠন-পাঠন, কল্পনার প্রসারিত জগতে যেতে পারে না। মনে পড়ে 1950-এর দশকের শেষের দিকের একটি ছেলের কথা—মফস্বলের কলেজ থেকে সে কলকাতার বিখ্যাত এক কলেজে পড়তে যায়। কলেজটির গ্রন্থাগার তাকে মুগ্ধ করে, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, একাধিক বিষয়ের বই পড়তে থাকে। তাতে তার পরীক্ষার ফল যে ভাল হয় তা নয়; কিন্তু অন্যদিক থেকে লাভবান হয়। আর তখনও প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর রং রেজিনীর খেলার রেশ থাকায় যা হোক ডালভাত খাওয়ার জীবিকাও জোটে। অর্থাৎ সে ঐ প্রসারিত পঠনের দিগন্তে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে পারে। নিজ বিষয়কে অন্য বিষয় ও জ্ঞানের সূত্রে বোঝার চেষ্টা করতে পারে। মানুষ হিসাবে, ছাত্র হিসাবে সে যাকে ইংরেজিতে বলে Interesting হয়ে উঠে। এখন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রদের মধ্যে এটারই অভাব—উচ্চমাধ্যমিকে যে প্রথম হলো তার অন্য বিষয়ে—সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে নাবালক। নারীবাদী কবিতা লেখে, আবার দূরদর্শনের সব থেকে ভাল-লাগার অনুষ্ঠান তার সুপারহিট মুকাবেলা। সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় পদার্থবিদ্যা, পড়ছে চিকিৎসা-বিদ্যা। অর্থাৎ বিবেচনায় রয়েছে জীবিকা, অর্থাৎ কোন শাখায় গেলে দ্রুত অর্থোপার্জন। এর মূলে রয়েছে অনেকটাই অর্থনৈতিক নিরপত্তার ভাবনা, অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব।

আর এখানেই অমর্ত্য সেনের বক্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যর ওপর তিনি যে বিশেষ গুরুত্ব দেন, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করার কোন কারণ নেই, থাকতেও পারেনা। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিজে নিজে অর্থনৈতিক বন্ধতা দূর করতে পারে না— একান্ত প্রয়োজনীয় সহায়ক হতে পারে। একজন সুস্থ ও শিক্ষিত মানুষ যদি জীবিকাহীন থাকে তাহলে হয় সে হতাশ হয়ে যেতে পারে, আত্মবিনাশের পথে যেতে পারে, নয় সে সমাজবিরোধী হয়ে উঠতে পারে। আর 'শিক্ষা' এই শব্দ ও ধারণাটির যথার্থ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক বিকাশ, এই ধারণাটিরও স্বচ্ছ বিশ্লেষণ দরকার — এখন সুস্থ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হাজার হাজার ছেলে মেয়ে দেখছি যারা হতাশ, বিষণ্ণ, এদেশের মানে যথেষ্ট যোগ্যতা থাকলেও তারা জীবিকাহীনতার শূন্যে দোদুল্যমান ভবনে ও ভুবনে প্রায় অভিজ্ঞানহারা। শিক্ষার নিদারুণতম সংকটের এই আর্থিক ও অর্থনৈতিক চালচিত্রটির পরিবর্তন না ঘটলে, কি

সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র, কি বিশেষ সেবাসম্পন্ন ছাত্র কেউই শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবে না। কর্মমুখ শিক্ষার যে কথা বলা হচ্ছে, তাতে কর্মের সুযোগই যদি না থাকে তাহলে এ শিক্ষার তাৎপর্য কী ? আর ঐ কর্মের সুযোগ একমাত্র অর্থনীতির বিকাশই ঘটাতে পারে।

শিক্ষা একটি সামাজিক ক্রিয়া। এখানে শিক্ষার সংকট সামাজিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত। এই সংকটে সব থেকে বড় দায়িত্ব মধ্যশ্রেণীর। ভারতের অন্য অঞ্চলের তুলনায় ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ বাংলাদেশে অনেক আগে ঘটেছিল। এই উপনিবেশজাত মধ্যশ্রেণীর ইতিহাসে এখানে তাই দীর্ঘতম-উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই তা একটা চেহারা পেয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারাই বৃটিশ-শাসকদের সহযোগী হয়েছে, পরেও তারাই এই শিক্ষার ধারক বাহক। ক্রমে ক্রমে অন্য শ্রেণীর মানুষও এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু এসব শ্রেণীর কাছে মডেল মধ্যবিত্ত শ্রেণীই থেকে গেছে। সমাজতাত্ত্বিক শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ণের কথা বলেন। কিন্তু এর সঙ্গে আরও দুটির কথা বলতে হয়- পাশ্চাত্যায়ণ ও মধ্যবিত্তায়ন। চাষীর ছেলে কলেজে এলে আর মনের দিক থেকে চাষী থাকছে না, জীবনযাপনেও সে ক্রমশ মধ্যবিত্তকেসামনে রাখছে। চাষবাস কে দেখে, জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর দেয় - বাবা, কিংবা যে দাদা বা ভাই লেখাপড়া শেখেনি সে। অর্থাৎ ঐ মধ্যশ্রেণীরই জগতে সে ঢুকে যায় আর মধ্যশ্রেণীর মূল্যবোধে পাশ্চাত্যায়নের দাপট তো সেই উনিশশতকের কুড়ি ত্রিশ দশকের থেকেই চলেছে— এখন ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমেরিকা। ঔপনিবেশিক বাস্তবে জন্ম নেওয়া এই মধ্যশ্রেণী পরিবর্তের ভূমিকা পালন করেছে। একদা তারা ধনতান্ত্রিক ইউরোপের মতউন্নতি চেয়েছিল, ভেবেছিলো বৃটিশদের সঙ্গে সহযোগিতায় সাম্রাজ্যের অংশীদার হবে, কিন্তু চার-পাঁচ দশকের মধ্যেই মোহ ভাঙল। ঔপনিবেশিক জটিল প্রক্রিয়া সে অনুধাবন করতে পারেনি। বৃটিশ-সমালোচক, বিরোধী হলো, কখনও কখনও জাতীয় শিক্ষার কথা বললো— কিন্তু কার্যত ঐ ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্মকাণ্ডে বেড়ে ওঠা, অর্থনৈতিক বাস্তবের নিয়ন্ত্রনহীন অথচ চিন্তাভাবনায় ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের প্রসাদপুষ্ট এই শ্রেণী শেষ পর্যন্ত ঐ ঔপনিবেশিক শিক্ষাকেও অক্ষুন্ন রাখল। অসমসাহসিক বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যে দেখা গেল না, তা নয়, যেমন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে - কিন্তু শ্রেণী ও সমাজের, সেই সঙ্গে ঐ জীবিকার ভিত্তি ও সমর্থন না থাকলে ঐ ব্যক্তিগত 'তবু শূন্য শূন্যনয়ে'র প্রত্যয়ও কোথায় পৌঁছায় তার দৃষ্টান্ত আজকের বিশ্বভারতী । কি করুণ পরিণতি।

শিক্ষার সংকটের সামাজিক পটভূমি মূলত ঐ মধ্যশ্রেণীই তৈরী করেছে। এ শ্রেণীর যেটুকু সদর্থক দিক তা মূলত সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে - ঔপনিবেশিক দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে স্বাধীন ও স্ব-সত্তার জায়গা এখানেই ঐ মধ্যশ্রেণী তৈরি করেছিল, যার মহত্তম দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর বাঁচবার চেষ্টা করেছে রাজনীতিতে। এখন এ দুটি থেকে এ শ্রেণী এক অর্থে বিচ্যুত। সেই প্রতিবাদী সংগ্রামের রাজনীতি নেই আর যই ক্রমশ মধ্যশ্রেণীর জগৎ থেকে অপসারিত। বহিস্তরের চাপ ও ধাক্কার মোকাবেলা করার মত শক্তি থেকে এ শ্রেণী বঞ্চিত - মূলতঃ নানা বৃত্তিজীবী গোড়া থেকেই প্রায় উৎপাদন সম্পর্কশূন্য। এ বঙ্গের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণও তার হাতে নেই - যে কলকাতাকে কেন্দ্র করে তার বিকাশ সেখানেও সে ন্যুব্জ। অথচ শিক্ষার নীতি-নির্ধারক তারাই। এ পঙ্গু, ভূমিকাহারা শ্রেণীর হাতে শিক্ষার তাৎপর্য যে ক্রমশ হারাবে, এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শ্রেণী গত দুতিন দশক জুড়ে যা করেছে তা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানহীনও বটে। স্থান-কাল-পাত্রের এমন বিবেচনাহীন শিক্ষাভাবনা খুব কমই দেখা যায়। সামাজিকভাবে সঠিক যে মূল্যবোধহীনতা ও নিরুদ্দেশ যাত্রা এখন প্রকট, মধ্যশ্রেণী তাতে সব থেকে আক্রান্ত। একদা শিকড়হীন হওয়া সত্ত্বেও, ভাবনায় চিন্তায় বাস্তবাতিরিক্ত একটা মূল্যবোধের সক্রিয়, ঐশ্রেণী করেছিল। কিন্তু ক্রমশ যুদ্ধ-মন্বা-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগ তাকে প্রচণ্ড আঘাত করে। 47-পরবর্তী সময়ে ধীরেধীরে এ শ্রেণী সার্বিক চরিত্রহীনতায় আক্রান্ত - এ বঙ্গে এ শ্রেণীর আধিপত্য যেখানে যেখানে - শিক্ষপ্রতিষ্ঠান অফিস-আদালত-ব্যাঙ্ক-জীবনবীমা-সর্বত্রই ঐ হীনতার অভিজ্ঞতা অহরহ। শিক্ষাজগতে এই শ্রেণীর মানুষই শিক্ষক, আবার ছাত্ররাও মূলত এই শ্রেণী থেকে আসে। ঐ মূল্যবোধহীনতা ও চরিত্রহীনতা তাই শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্র দগদগে ঘায়ের মতো।

বাইরের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় শিক্ষা। বাইরের সমাজ যদি স্বর্ণ-পণ্যমোহী হতে চায় তখন শিক্ষায় আদর্শ থাকা সম্ভব নয়। আমাদের দেশ গরীব। অর্থাভাবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছাত্র ছাত্রী, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে, শতকরা 70 ভাগের পড়ার ঘর নেই, শতকরা 53 জনের বেশি শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক কিনতে পারেনা। ছাত্রদের পরিবারবর্গের এক বৃহৎ অংশ বাসভূমিহীন ও কণভারে জর্জরিত। বেশ বড় অংশ অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকে। এই সবের "প্রত্যক্ষ প্রভাব ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান, অত্যন্ত গলদপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি।" হীরেন দাশগুপ্ত 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা (1999)' বইটিতে ধরে ধরে এসব দেখিয়েছেন তথ্য দিয়ে। এই গরীব দেশে মধ্যশ্রেণী পণ্যমোহে ডুবলে, দুর্নীতি আসবেই, তার ছাপ শিক্ষাজগতে পড়বেই। এই শ্রেণী তার ছেলেমেয়েদের অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের সামনে রাখবে ঐ পন্য মোহ মেটাবার জন্য অর্থের লোভ, সেই জীবিকার হাতছানি যাতে অর্থ দ্রুত বেশি

আসে। এই প্রজন্মও স্বার্থপর, ঐ লক্ষ পূরণের জন্য নীতিহীন হবে - মেধাসম্পন্ন ছাত্রও হারিয়ে যাবে অর্থউপার্জনের স্বদেশী বা বিদেশী যূপকাষ্ঠে। ইতিমধ্যেই যে পাশ্চাত্যানুকরণ মধ্যশ্রেণীতে ঘটেছে তা প্রায় বিকৃত রূপ নেবে। পাশ্চাত্যের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, মসৃণ অর্থময়তায় হারিয়ে যাবে জিজ্ঞাসা— এ সমাজের বর্বরতম সাম্রাজ্যবাদী দেশে স্থায়ীভাবে যাবার আগে ভাববে না, কোথায় যাচ্ছি, কার হাতে বিক্রয় হতে? এসব প্রশ্ন আজ অবান্তর। শিক্ষা এখন সামাজিক ভাবে বাণিজ্যের মত, ব্যবসার মত। মধ্যশ্রেণীর চূড়ান্ত অধঃপতন এটাই করে তুলেছে - এর থেকে বাঁচবার পথ কোথায়?

এই শ্রেণীগত সামাজিক নিরুদ্দেশ যাত্রা শিক্ষাজগৎকে প্রায় বিধ্বস্তই করেছে বলা চলে। এর দায় থেকে শিক্ষকরাও মুক্ত নয়। বরঞ্চ বোধহয় আরও ভয়াবহ তাদের অবস্থা। আমাদের দেশে মাঝেমধ্যে শুনি কালোটাকা সাদা করার উপায় বাতলানো হয়, শিক্ষকসমাজ সাদা টাকা কালো করার মাধ্যম — অভিভাবক যে অর্থ উপার্জন করেন তা যখনই ব্যক্তিগত প্রাতিজনিক শিক্ষকের হাতে তুলে দেন তার সন্তানের জন্য, তখনই এ টাকা কালো হয়ে। কালো টাকার মন ও হাত দিয়ে শিক্ষার শুদ্ধতা রক্ষা করা যায় না — ছাত্র, অভিভাবক, সমাজের সম্মতি নিয়েই এটা চলে। মনে পড়ে, একজন অধ্যাপকের কথা। তিনি তাঁদের বেতনকাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ নিয়ে ছাত্র পড়ানো ছেড়ে দেন। তারপর অভিভাবক, ছাত্রনেতাদের তাঁর ওপর প্রবল চাপ আসতে থাকে — কেন ছাড়লেন? অধ্যাপকটি বলেছিলেন, কেন সকলেই তো এই পড়ানোর সমালোচনায় মুখর, ছাত্রনেতারা বলেন, তোমাদের নেতারাও তো ভাষণ দিয়ে এসব বন্ধ করতে বলছেন। তারা হাসে—ওসব মাঠে ময়দানের কথা। আলাদাভাবে না পড়লে পাশ করবে না। আর একটি অভিজ্ঞতার কথাও মনে পড়ে। বিভাগীয় প্রধানের বাড়িতে অভিভাবক — তাঁর মেয়ে চারশ পঞ্চাশের একটু বেশি পেয়েছে। সাম্মানিক শ্রেণীতে পড়তে চায়, এই অনুরোধ নিয়ে এসেছেন। বিভাগীয় প্রধান এমনই ভাবেন। তিনি কঠিন হয়ে ওঠেন, কিন্তু শোনেন না। মেয়েটিই তো মধ্যেই তাঁর অজান্তেই বিষয়টিতে সাম্মানিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে গেছে। তিনি তখন বলেন তবে, আমার কাছে এসেছেন কেন? যদি মেয়েটিকে তিনি বাড়িতে পড়ান এই অনুরোধ নিয়ে। সব প্রক্রিয়াই মূল্যবোধহীন। তিনি জানান, বাড়ীতে পড়ান না, কে পড়ান তাঁর হদিশও দিয়ে দেন। কিংবা কিছুদিন আগে অধ্যাপকদের ধর্মঘট হয়ে গেল। এ ধর্মঘটে অধ্যাপকরা ভর্তিতে সাহায্য করেন। কলেজ কবে খুলবে, এসব নিয়ে মাথা ব্যথা ছিলনা। এর মধ্যে অভিভাবক ও ছাত্র পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র- কলেজে ভর্তি হওয়া পেয়ে গেছে, তারা তখন ব্যক্তিগতভাবে কোথায় পড়া যায় তার খোঁজে ব্যস্ত। মূল শিক্ষাব্যবস্থা অপ্রাসঙ্গিক, কাজেই আস্থাভাজন নয়। এই তাৎপর্যহীন, অপ্রাসঙ্গিক শিক্ষাব্যবস্থায়, ছাত্ররা বিদ্যালয় থেকে বেসরকারী ব্যক্তিগত শিক্ষার দ্বারস্থ হয়ে, আত্মবিশ্বাসহীন — শিক্ষকপ্রদত্ত বটিকা ও পুরিয়ার ওপর নির্ভরশীল এই ছাত্ররা নিজের বুদ্ধি - কল্পনা - মেধা কিছুতেই আর বিশ্বাস করেনা। আত্মপ্রত্যয়হীন এই ছাত্রসমাজ সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর। বস্তুত যে কোন কর্তৃত্বপরায়ণ ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের সামাজিক ভিত্তি তারাই — এই উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্রসমাজ। আবার এ অভিজ্ঞতারও সম্মুখীন হতে হয়— নিজ চেষ্টায় বুদ্ধিতে পঠনে প্রস্তুত ছাত্র পরীক্ষায় তেমন ভাল ফল করলোনা, ঐ একই শ্রেণীর পরবর্তী পর্যায়ের পরীক্ষায় সে ব্যক্তিগত শিক্ষকনির্ভর ও বাজার-চালু নোট বই নির্ভর হলো - পরীক্ষায় তার ফল হলো অনেক ভালো। অর্থাৎ শিক্ষকরাও আর স্বাধীন পঠন চাননা, কারণ এ স্বাধীনতা তাঁদের ক্ষতি করে বিপাকে ফেলে। কালোটাকার বৃত্তে থাকা অধ্যাপকও তো পঠনপাঠন ভুলে গেছেন।

এই অর্থনৈতিক - সামাজিক কারণের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক কারণ। রাজনীতি এদেশে এখন প্রায়লুপ্ত। রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটা স্বপ্ন, একটা রূপান্তরের মানবিক আকাঙ্খা। 1920-21 -এর গান্ধী, বা রাশিয়ায় লেনিন কিংবা চীনে মাও জেদঙ এই রাজনীতির প্রবক্তা। এদেশে এখন রাজনীতির নামে যা চলছে তা ক্ষমতালোভীর নর্দমার বৃত্তান্ত। শুনেছি, মালেশিয়ার এক বিখ্যাত উপন্যাসিক সে দেশের রাজনীতি বোঝাতে bowel movement, excrement, scatological চিত্রকল্প, এসবের কথা বলেছেন, সামগ্রিকভাবে এই চিত্রকল্পেই দেশের রাজনীতিকে ধরেছেন। এদেশের সচেতন ঔপন্যাসিকের হাতেও রাজনীতি এভাবেই আখ্যাত হওয়ার অপেক্ষায়। রাজনীতিকে বলা হয়েছিল একসময় will of the oppressed, এখানে এখন চরিত্রহীন ও মূল্যবোধহীনদের লীলাক্ষেত্র। বাঙালী মধ্যবিত্ত একসময় জাতীয়তাবাদী, সন্ত্রাসবাদী, সমাজতান্ত্রিক নানা মূল্যবোধের রাজনীতি করতে চেয়েছিলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই মূল্যবোধ বৃটিশ ও অন্যান্য চাপের মধ্যেও একটা আলোর রেখা বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল— মেধাবী ছাত্ররা রাজনীতিতে তাই দাঁড়াবার একটা জায়গা পায়। এখন যারা মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দশজন হয় তাদের খবরে কাগজে সাক্ষাৎকারে নানা মতামতের মধ্যে একটা অভিমত সাধারণ : রাজনীতি থেকে তারা দূরে। এসব তারা বুঝতে চায়না। এর জন্য অবশ্যই কিছুটা দায়ী তাদের বড় হওয়া, তাদের শ্রেণীর ইতিহাস। তবে রাজনীতি ও রাজনীতিকদের কুৎসিত মূর্তিও এরজন্য কম দায়ী নয়। এক ধরণের বিষমিথা এদের আচরণে কাজে জাগবেই।

অথচ যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্ধতা-অধঃপতন শিক্ষাজগতের সংকটের অন্যতম উৎস বলে আমরা মনে করছি,

তাকে ভাঙতে হলে রাজনৈতিক প্রত্যয়, ইচ্ছা, ভাবাদর্শের সাহসিক স্বপ্ন ও কর্ম একান্ত দরকার। মাঝে মধ্যেই শুনি, শিক্ষাকে নষ্ট করছে রাজনীতি। এ একদম ভুল। রাজনীতি নয়, দলাদলি। পার্টিতন্ত্র। রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও চেতনাই তরুণকে তার দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে, দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেখায়, আত্মকেন্দ্রিক কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। আর যথার্থ দেশকাল-চেতনা-সম্পন্ন রাজনীতিই অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব দূর করার পথে নিয়ে যেতে পারে। শুদ্ধ চরিত্রবান রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও কর্মকাণ্ড, প্রাক্‌সিস্‌ই পারে শিক্ষাকে বাঁচাতে। এ রাজনীতি পার্টিতন্ত্র নয়, এ রাজনীতি ভোটভিখারী ক্ষমতা দখলের পিচ্ছিল পথ নয়। রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। যদিও তাঁর সমালোচনাও ছিল। এর দরজা খুলেছিল রাজনৈতিক প্রত্যয়। তিনিও শান্তিনিকেতনে উপনিবেশিক শিক্ষার বাইরে যা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, তা প্রত্যক্ষতঃ প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক না হলেও, মূলত একটা গভীর স্তরের সিভিল সোসাইটি, জনসমাজের রাজনীতিই—যার কথা গোরা উপন্যাসে তিনি বলেন। আর সেই কারণেই নানা পিছুটান, সীমাবদ্ধতা, অদ্ভুত মতামত নিয়েই আমাদের সবথেকে বড় রাজনীতিবিদ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী শান্তিনিকেতনে গেছেন, তার জন্য দায়বদ্ধ হয়েছেন। ঐ রাজনৈতিক ভাবনাতেই ছেলেরা ব্যক্তিগত সাফল্যের সঙ্কীর্ণগণ্ডী পেরিয়ে সামাজিক, সামূহিক হয়ে ওঠে : ছাত্রজীবনে এক মূল্যবোধের বীজ পায়। এখন তা অবলুপ্ত, বিশেষত বাঙালী জীবনে এর পরিণতি ভয়াবহ। বইপড়া সে হারিয়েছে, রাজনীতির স্বপ্ন ও প্রত্যয়ও লুপ্ত। স্কুলে এক শূন্যতার মধ্যে প্রায় নিরাশ্রয়, ছাত্রসমাজ একটি ভয়ঙ্কর প্রবলতার দিকে ধাবমান। শিক্ষকরা কেউ কারুর পিছনে লাগলেও বলছেন, রাজনীতি করছে। রাজনীতির এই অবমূল্যায়ন শিক্ষাজগতকে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ভ্রষ্ট ও বিকৃত করেছে। নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শিকড়হীন ব্যবস্থা ঐ সচেতন রাজনৈতিক প্রত্যয়ের অভাবজাত। তার ফলাফল ভোগ করছে গোটা সমাজ—স্বপ্ন উধাও, ভাবাদর্শের কথা বললে হাস্যকর হতে হয়।

শিক্ষার সংকটের উৎস এই অর্থনৈতিক - সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবের মধ্যে নিহিত। নিশ্চয়ই তার নিজের সংকটও আছে - ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহন করে এই অব - উপনিবেশের সাব-কলোনিয়াল শিক্ষাকাঠামো স্বাভাবিকভাবে সংকটের সব চিহ্ন বহন করছে। ইংলণ্ডে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে টিউডরযুগের সূচনার আগে যে সামন্ততন্ত্র ছিল, তাকে কোন কোন ঐতিহাসিক ''জারজ'' সামন্ততন্ত্র' বলেছেন। এদেশেও এখন এক অব বা জারজ উপনিবেশিকতন্ত্র চলছে—উপনিবেশিক শাসনেও যেটুকু শৃঙ্খলা থাকে তাও নেই। বহুজাতিক অনুপ্রবেশ, বিশ্বায়নের নামে মার্কিনায়ণের ফাঁসে এই তন্ত্র প্রত্যক্ষত উপনিবেশিক বাতাবরণ রাখে না। কিন্তু কার্যত তা এক ভয়াবহ জারজ উপনিবেশতন্ত্র নিয়ে আসে—এদেশে বৃটিশ উপনিবেশ যুগে অন্তত ভাষা একটা বাঁচবার স্পেস ছিল, প্রত্যক্ষত ইংরেজির দাপট সত্ত্বেও। তাই ঐ উপনিবেশের রমরমার মধ্যেও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ, রবীন্দ্রনাথের মতো একটি ঘটনা ঘটে। এখন এই জারজ-উপনিবেশতন্ত্রে ভাষাও আক্রান্ত—তথ্য- প্রযুক্তি ও জ্ঞান-প্রযুক্তি ভাষাকে ধ্বংস করছে, আমাদের অক্ষরও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই-ভাষা সংকট মারাত্মক। আমরা তৈরি হচ্ছি হাঁসজারুর মতন, এক ভাষাহারা প্রায়-জারজ অস্তিত্বের স্বারুক। মিডিয়া এর মাধ্যম—বিদ্যালয়ের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তো নতজানু ঘরের দূরদর্শনের সামনে, প্রায় অর্ধশিক্ষিত খবরের কাগজের কাছে। সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে যে মন, সে মন কখনোই শিক্ষার উপযোগী নয়। শিক্ষার সংকট মনের সংকট, ভাষার সংকট। আজকের মনোবিদ্যা একদিকে ইতিহাস, অন্যদিকে সমাজতত্ত্বের হাত ধরে এই সংকটের চেহারাটাকে স্পষ্ট করতে পারে। আসলে শিক্ষার রূপান্তর ঘটাতে হলে বৃহত্তর বাস্তব ও ব্যক্তি-বাস্তব দুরকম রূপান্তর এক সঙ্গে না হলে, ঘটানো যাবে না। এই অদ্ভুত আঁধারকে, চৈতন্যের মড়ককে চূর্ণ করা বোধহয় এক দীর্ঘ সময়ের মনীষার কাজ। যেহেতু মানুষ থাকে, প্রকৃতি থাকে, যেহেতু সময় থেমে যায় না, সেহেতু এই অন্ধকারেও আলোকাভিসারী তো হতেই হয়—ভরসা তো রাখতেই হয় সেই ছেলেমেয়েদের ওপর যাদের আমরা সকলে মিলে পঙ্গু ও ধ্বস্ত করতে চাইছি। কিন্তু যারাই তো হতে পারে আধুনিক রাজপুত্র।

ভাষা : দৃষ্টিহীনের 'চোখে'

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

হেলেন কেলার তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, যেদিন তিনি প্রথম 'ওয়াটার' শব্দটি উচ্চারণ করতে পারলেন, সেইদিনই তিনি উপলব্ধি করলেন, প্রতিটি বস্তুর একটা করে নাম আছে। হেলেন জলকে অনুভব করতেন স্পর্শ দিয়ে, কিন্তু একটা (তরল) পদার্থ হিসাবে জল বা ওয়াটারকে চিনতেন না । আর তাই 'মগ' আর 'জল' তিনি প্রায়ই গুলিয়ে ফেলতেন। পুতুল তো হেলেনের ছিলই, কিন্তু এই খেলার জিনিসটার নাম যে পুতুল ('ডল'), তা তাঁর জানা ছিল না। হেলেনের শিক্ষিকা যেদিন তাঁর এক হাতে পুতুল ধরিয়ে আর - এক হাতের তালুর ওপর আঙুল দিয়ে লিখে দিলেন : ডি-ও-এল-এল — সেইদিনই হেলেন বুঝতে পারলেন, তাঁর হাতে ধরা জিনিসটার নাম : 'ডল'।

প্রতিটি বস্তুর যে একটা নাম আছে, এটা আমাদের কাছে কোন নতুন কথা নয় ; কারণ আমরা বস্তুকে চিনতে শিখেছি তার নাম ধরেই। কিন্তু অতি শৈশবে দৃষ্টিহীন আর মূক - বধির হয়ে যাওয়া হেলেনের কাছে এটা ছিল একটা আশ্চর্য উপলব্ধির মতো। তিনি বস্তুকে চিনতেন চোখে দেখে বা নাম শুনে নয়, শুধু হাত দিয়ে ছুঁয়ে, ফলে বস্তুর নাম যেমন তাঁর জানা হয়নি, তেমনি গড়ে ওঠেনি বস্তুর কোন ধারণাও। ওয়াটার শব্দটির উচ্চারণ হেলেনের চেতনার জগৎ, আর সেই সঙ্গে আমাদের ভাষাচিন্তার পরিধিকেও অনেক দূর প্রসারিত করে দিল। আমরা জানলাম : নাম ছাড়া বস্তুর কোন ধারণা তৈরি হয় না। যে জীবের নাম আমরা জানি না, আমাদের চেতনার জগতে তার কোন স্থান নেই। কিন্তু যে-ই আমরা তাকে নামে চিনলাম, সে আমাদের চেতনার ভেতরে চলে এল। আমরা যখন তাকে চিনছি তার নামসমেতই তাকে জানছি। তার মানে নাম ছাড়া বস্তুর কোন অর্থ হয় না। সেই বস্তু বা বিষয়টাকে নিয়ে যদি ভাবতে চাই, তাহলে তো একটা নাম লাগবে। নাম ছাড়া ভাবব কেমন করে। কথাটা তাহলে দাঁড়াল এই যে চিন্তার জন্যে একটা ভাষা লাগে — ভাষা ছাড়া ভাবনা হয় না।

হঠাৎ শুনলে মনে হতে পারে, এ আর কী এমন নতুন কথা হলো! কিন্তু কথাটার মর্মার্থ বোঝা যাবে, যদি হেলেনের অভিজ্ঞতাটা সামনে রাখি। জল জিনিসটাকে তিনি চিনতেনই, চোখে দেখে না হলেও স্পর্শ দিয়ে তো বুঝতেন। কিন্তু যতদিন না 'ওয়াটার' শব্দটি তিনি বলতে পারছেন, তাঁর ওই চেনাটা সম্পূর্ণ হয়নি। জল যে একটা পদার্থবিশেষ — এই ধারণাটাই তৈরি হয়নি তাঁর মনে। আমরা যারা চোখে দেখতে পাই, কথা শুনতে এবং বলতে পারি, হেলেনের মতো কঠিন, ক্লেশকর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হয় না। কিন্তু জানার পদ্ধতিটা আমাদের ক্ষেত্রেও একই।

শিশুকে যখন পড়তে শেখানো হয় — একটি বস্তু বা তার ছবি সামনে রেখেই শব্দটি নিয়ে আসা হয়, যেমন ফুলের ছবির পাশে লিখে দেওয়া হলো 'ফুল' শব্দটি। এর ফলে ওই শব্দটি ওই বস্তুর চিহ্ন হয়ে গেল : ওই 'ফুল' নামের শব্দচিহ্নটি দিয়েই তাকে প্রকাশ করতে পারবে সে । ওই শব্দটি তার মনে একটি বিশেষ বস্তুর ছবির মতোই কেন গাঁথা হয়ে গেল। এরপর থেকে যতবার সে ফুল শব্দটি শুনবে বা কোথাও লেখা আছে দেখবে, ওই চিহ্নটি ততবারই তার মনে একটি বিশেষ ছবি-ই জাগিয়ে তুলবে, উদ্রিক্ত করবে একটি বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের ধারণাকে। ভাষার এই বোধকে নোয়াম চমস্কি তাই বলেছেন মানসিক প্রতিবিম্ব বা 'মেন্টাল ইমেজ'।

হেলেন কেলারের বেলায় সমস্যাটা ছিল সবচেয়ে কঠিন ; কারণ দেখা, শোনা আর কথা বলা — এই তিনটি স্বাভাবিক ক্ষমতাই তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাঁরা দৃষ্টিহীন অথচ মূক-বধির নন, তাঁদের ক্ষেত্রে একটু সুবিধা হলো যে, তাঁরা বস্তুর নামটা অন্তত কানে শুনে জানতে পারছেন, হেলেনের মতো শুধু হাতে ছুঁয়েই বুঝতে হচ্ছে না। কিন্তু বাকি প্রক্রিয়াটুকু একই। তাঁরাও একটা শব্দ কানে শুনছেন, আর সেই শব্দটা একটা বস্তু বা বিষয়ের প্রতীকের মতো তাদের চেতনায় গাঁথা হয়ে যাচ্ছে । যেমন একজন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এ - রকম : 'একদিন আমার পা লেগে দিদির দোয়াতটা পড়ে গেল। দিদি বলল, এই রে দোয়াতটা ফেললি। তখন বুঝলাম, আমার পা লেগে যেটা পড়েছে, তাকে দোয়াত বলে।' দোয়াত জিনিসটা হাতে নিয়ে তিনি হয়ত এর আগে অনেকবারই দেখেছেন। জিনিসটার আকৃতি বা গড়নের ধারণাও তাঁর ছিল। কিন্তু যেই নামটা জেনে গেলেন, তখনই সেই ধারণাটা পূর্ণরূপ পেল। এরপর থেকে দোয়াত হাতে নিয়ে গড়নটা ছুঁয়ে বুঝে নিয়েই তিনি বলে ফেলতে পারবেন : 'দোয়াত' ; আর এই নাম ধরে ভাবনার ভেতর দিয়েই বস্তুটি আপন হয়ে উঠবে তাঁর কাছে।

আর একজনের অভিজ্ঞতার কথা শুনি। সে একটি দৃষ্টিহীন কিশোর। দাদারা বলত, আকাশে ঘুড়ি উড়ছে, বুঝতাম, ঘুড়ি একটা জিনিস, যা ওড়ে। কিন্তু সে ছিঁড়ে ফেলবে বলে ঘুড়িটা তার হাতে কখনও দেওয়া হতো না। নাম শুনে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল ; কিন্তু যতদিন না ঘুড়িকে সে দুহাতের স্পর্শের মধ্যে পেয়েছে, ধারণাটা সম্পূর্ণ হয়নি। ঘুড়ি তার কাছে ছিল পাখি বা প্রজাপতির মতোই একটা উড়ন্ত জিনিস।

বহুদিন পর্যন্ত মনে করা হতো ভাষা আর চিন্তা যেন দুটো আলাদা স্রোত ধরে চলে। আমরা আগে বস্তুকে চিনি, পরে তার নাম জানি। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, শিশু যখন প্রথম একটি শব্দকে জানছে সে তাকে একটি বস্তু বা ভাবের প্রতীক হিসাবেই চিনে নিচ্ছে, এবং যখন সে কথা বলছে, ওই শব্দটিকে ব্যবহার করছে একটি অর্থপূর্ণ ভাবের প্রতীক হিসাবে। তার এই জানা বা অবধারণার (কগ্‌নিশন) কাজটা চলেছে চিন্তা বা ভাবনারই আশ্রয়ে। রুশ ভাষাবিজ্ঞানী ভাইগটস্কি তাই শব্দকে বলেছিলেন চিন্তার একক : 'ইউনিট অফ থারবাল থট'।

কথা বলতে পারাটা আমাদের অন্তর্জাত (ইন্‌নেট) ক্ষমতা। শিশু আপনা থেকেই 'মা' বলতে শিখে যায় এবং শব্দটি সে উচ্চারণ করে তার জননীর নাম হিসাবে। মায়ের যে একটা আলাদা নাম থাকতে পারে, এটাও অনেক সময় শিশুর কল্পনায় থাকে না। কারণ তার সবচেয়ে প্রিয়জন মা-কে তো সে 'মা' নামেই চিনেছে। যতবার সে মা-কে দেখে, তার মন আপনা হতেই 'মা' বলে ডেকে ওঠে। কিন্তু জন্মান্ধ শিশু মাকে চিনবে কেমন করে? সে তো তার মাকে চোখে দেখতে পাচ্ছে না। এর উত্তরে একজনের মুখে যা শুনেছি, তার ভেতর যেন একটা অনির্বচনীয় অনুভূতি রয়ে গেছে। শোনার পর কিছুক্ষণ যেন আর কথা বলা যায় না। তাঁর মনে পড়ে : 'আমার হাতটা নিয়ে মা মাঝেমধ্যে মায়ের গায়ে ছুঁইয়ে বলত — আমি তোমার মা হই, জানো তো!'

মা-কে সেই শিশু চেনে তার সর্বাঙ্গের স্পর্শ দিয়ে, 'মা' বলে সে ডাকতে পারে। কিন্তু তবু যেন তার চেনাটা সম্পূর্ণ হচ্ছিল না, যতক্ষণ না মা নিজেই 'মা' নামের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন মা মানুষটিকে। দৃষ্টিহীন শিশুকে নিজের প্রতিবন্ধিত্বটাও বুঝতে হয় একটা নাম দিয়েই। একজন যেমন বলেছেন, 'ছোট বেলায় খেলতাম, কিন্তু ভালো (খেলতে) পারতুম না। বন্ধুরা বলত এলেবেলে। তখন ঠিক বুঝতে পারতাম না, কেন আমায় এলেবেলে বলে। ব্রাইল স্কুলে ভর্তি হয়ে বুঝলাম, আমি চোখে দেখতে পাই না।'

একটি নামশব্দের ভেতর দিয়ে নিজের প্রতিবন্ধত্বটা বোঝার এক বড় প্রাণস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন আর একজন। তাঁর বাড়ি গ্রামে। 'ছোটবেলায় পথ দিয়ে চলতে চলতে একদিন শুকনো নালায় পড়ে গিয়েছিলাম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন বলেছিল, কানা—দেখতে পায় না। তারপর থেকে জানলাম, যে চোখে দেখে না, লোকে তাকে কানা বলে।'

এইসব টুকরো টুকরো কথার অনুভাবে ভারি হয়ে ওঠে আমাদের মন। কিন্তু সেই বিষণ্ণতাকে আমরা অতিক্রম করতে পারি, অনুকম্পা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি অনুবোধে, যদি মনে রাখি কী আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টিই না আমাদের দিয়ে গেছেন দৃষ্টিহীন মানুষেরা। পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎকে তাঁরা দেখেন চোখের আলোর নয় অন্তরের আলোয়, আর তাঁদের সেই অন্তরালোকের স্পর্শে অন্তর্দীপ্ত হয় আমাদের চেতনার জগৎ। তাঁরা নিজের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, কিন্তু আমাদের তাঁরা দিয়ে যান তাঁদের অন্তর্লোকের দর্শন।

বস্তুকে চোখে দেখে তার একটা প্রতিবিম্ব আমরা মনে মনে গড়ে নিই। দৃষ্টিহীন মানুষও সেই কাজটাই করেন, তবে হাতে ছুঁয়ে, কানে শুনে আর তার সঙ্গে তাঁর সহজাত মননশক্তি মিশিয়ে নিয়ে। শব্দ, আমরা জানি, বাচনের সংকেত। কিন্তু বধির হেলেনকে সেই সংকেত ভেঙে বুঝে নিতে হতো শ্রবণে নয়, হাতের স্পর্শ দিয়ে। তাঁদের এবং আমাদের সকলেরই শব্দ কিন্তু একই, ভাষায় পৌঁছনো — যে ভাষার ভেতর দিয়েই আমরা এই জগৎকে অনুধাবন করি, অনুভূতিময় করে তুলি।

সেই দৃশ্যটির কথা ভাবতে ইচ্ছে করে—যেদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল হেলেন কেলারের। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছেন, আর হেলেন তাঁর কণ্ঠদেশে হাত ছুঁইয়ে রেখে সেই স্বরের কম্পন থেকে উদ্ধার করে নিচ্ছেন তাঁর নিজস্ব ভাষার সংকেত। পরে ডায়েরিতে হেলেন লিখেছিলেন, সেই কবিতার স্বর যেন 'সঙ্গীতের মতো প্রবেশ করেছিল আমার অন্তরলোকে।'

---

১. বহুজনের দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন 'সোসাইটি ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অফ ব্লাইন্ড', সেজন্য ওই সংগঠনের শ্রীমতী হেনা কানু এবং শ্রীমতী রুমা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা হলেন : বিমল পাল, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ; বিমান দাস, আমতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ; সুজিত কর্মকার ; জলপাইগুড়ি, এবং রামু পালোয়ান, জলপাইগুড়ি। তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

পুস্তক আলোচনা

দেশভাগ : স্মৃতি আর সত্তা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, 1999, বাঁধাই, 59 পৃ., দাম 30.00 টাকা

স্বাধীনতার পঞ্চাশবছর পূর্তি উপলক্ষে দেশভাগ, হিংসা আর দাঙ্গা নিয়ে প্রকাশনা ও গবেষণার একটা স্রোত জোরালো হয়েছে গত কয়েক বছরে। এই সব লেখকেরা, যাঁদের কারো কারো মনে এখনও সেই বিপর্যয়ের স্মৃতি ধূসর হয়ে যায়নি, অথবা সেই সব লেখকেরা যাঁরা তার পরে জন্মেছেন, যেন সম্মিলিতভাবে প্রশ্ন তুলেছেন সেই অতীত বিবরণীর দিকে যা অগৌরবজনক, লজ্জার এবং ঘৃণার।

আলোচ্য বই-এর লেখক যখন কাজ শুরু করেন, তখনও দেশভাগ আর হিংসা নিয়ে কাজের স্রোত এতটা জোরালো নয়। বেশির ভাগ রচনাই ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের পাঠ। সেদিক থেকে, তিনি বিষয়টিকে নিয়ে বাংলা ভাষায় একটি ভিন্ন প্রেক্ষিতের চর্চার সূত্রপাত করেছেন। এমনকি বাংলা সাহিত্যে দেশভাগের বিবরণী খুঁজতে গিয়ে তিনি দশটার বেশি বই খুঁজে পাননা। সেখানেও দেশভাগের হিংসা আর সংকট মূল কাহিনীর উপাখ্যান হিসেবেই বেশি এসেছে। কেন? কোথাও কি রচনাকারদের মনে এই গভীর আঘাতের স্মৃতি অবচেতনে নির্বাসিত হয়ে গেছে? সাহিত্যিকদের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানীদের রচনায় দেখা গেছে 'রাষ্ট্রের কারসাজি' কিংবা 'কায়েমী স্বার্থের' ঘাড়ে দোষ চাপানো গোছের বিশ্লেষণের আধিক্য। এঁরাও কী তাহলে এই ভাবে কোনো অপরাধবোধের স্মৃতিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সমাধান করার চেষ্টা করেন? সন্দীপ তাই শুরুতেই বলেছে:

"পুরো ঘটনাচক্রটিকে ঔপনিবেশিক শক্তির কারসাজি হিসাবে দেখাতে পারলে একটা সহজ সমাধান পাওয়া যায় ; মুক্তি পাওয়া যায় নিজের দিকে ফিরে তাকানোর যন্ত্রণাদায়ক দায় থেকেও ; গোপন রাখা যায় এই প্রবল অপ্রীতিকর সত্যটিও যে, ভারতে বিভাগোত্তর হিংসাকাণ্ড হলো এমন একটা ঘটনা, সেখানে এই উপমহাদেশের তিনটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ই পরস্পরকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল, হিংসা আর রক্তাক্তের পাপ থেকে মুক্ত ছিল না কোনো সম্প্রদায়ই। বিভাজন আর তার পরিণামী মানব বিপর্যয়ের কাহিনী যদি ঠিকমতো লিখতে হয়, তাহলে তো লিখতে হয় এই কথাগুলিই। কিন্তু তা কি বলা যায়?" (পৃ. 1)

ছয়টি ছোট ছোট রচনা এবং এক নিম্নবর্গীয় লেখকের সংক্ষিপ্ত আত্মকথন নিয়ে সংকলনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এর বেশীর ভাগই নানা লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। প্রথমে সন্দীপ সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনায় দেখাতে চেয়েছেন যে বিপর্যয় বা সংকটের বর্ণনা কীভাবে অবদমিত হয়ে গেছে। আখ্যানের কাঠামো অনুভূতি বা মনের যন্ত্রণার উৎস আর তত্ত্বাবহতাকে ধরতে পারার বদলে বেশি ধরেছে ব্যক্তিযন্ত্রণাকে এক সার্বিক রাজনৈতিক / ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার ভগ্নাংশ হিসাবে। অনেকটাই দ্বিতীয়টার ফল হিসাবে। কিন্তু কেন আমাদের এই স্মৃতিচারণে অনীহা? তার উত্তরে সন্দীপ বলেছেন:

".....এই অনীহাকে কোনো একটি সূত্র দিয়ে বোধহয় বোঝা যাবে না। নানাধরণের দ্বিধা দ্বন্দ্ব স্মৃতির পথে এক কঠিন মানসিক প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। রক্তাক্ত স্মৃতিকে ভুলে গিয়ে কেউ কেউ ধরে রাখতে চান কেবল বিভাগ-পূর্ব কালের সেই সুখের দিনগুলির কথা।"(পৃ-9)

"স্মৃতি আর সত্তা" পরিচ্ছেদটি সতেরজন দেশভাগ-হিংসার শরীকদের সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে রচিত, আমার মতে যা সংকলনটির সবথেকে আকর্ষণীয় অংশ। ছোট - মাঝারী উদ্ধৃতি আর বর্ণনা দিয়ে সন্দীপ ধরার চেষ্টা করেছেন হিংসার জটিল কাঠামোটিকে। অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, হিংসা ও হত্যা, হিংসার অবয়ব, আশ্রয় সন্ধান — প্রতিটি বিষয়কে তিনি নির্মাণ করেছেন সংগৃহীত সাক্ষাৎকারের ভাষ্য দিয়ে যেখানে অনুভূতিগুলি সরব, দৃশ্যমান।

এর পরের রচনাগুলি তুলনামূলক ভাবে ছোট, যেমন : দেশভাগ : অন্যস্মৃতি (পৃ: 30-34), মহাআখ্যানের একটি উপাখ্যান (পৃ. 35-38), 1946 : লালিত ক্ষত (39-43) এবং বাংলা ভাগ আর স্বাধীন বঙ্গ (পৃ. 48-59)। তাই বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা দুইই কেশ সীমিত। তবুও বিখ্যাত যাত্রাভিনেত্রী জোৎস্না দত্তের আত্মকথন, অথবা দাঙ্গায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের দু একটি কথাবার্তা

আগ্রহ জাগায়। কারণ সন্দীপের মনে হয়েছে:

"দাঙ্গা যারা করেছে তাদের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু মনে হয় না যে, তারা মূঢ় বা স্বভাবত নিষ্ঠুর। তারা কেউই মনে করে না যে, খুনোখুনিটা খুব ভালো কাজ। কিন্তু তবু তারা সেদিন খুন করতে গিয়েছিল কারণ সেই পরিস্থিতিতে সেটাই তারা কর্তব্য বলে মনে করেছিল। এরকম পরিস্থিতি কেন, কীভাবে তৈরি হয়, সেই অনুসন্ধানের কাজটাই আজ জরুরি মনে হয়।" (পৃ.43)

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথা "অভিশপ্ত অতীত" রচনাটি সংগ্রহ করে সন্দীপ আমার মতন পাঠক/পাঠিকাদের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। মনোরঞ্জনের ভাষায় : 'সেই পূর্বপাকিস্তান নামক ভূখণ্ডের বরিশাল জেলার শিরিচপুর গ্রামে এক নমঃশূদ্র পরিবারে আমার জন্ম। শোনা যায়, ওড়াকান্দির গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্মের আগে উচ্চবর্ণের লোকেরা আমাদের আদর করে চণ্ডাল, চাঁড়াল বলে ডাকত আর মোচরামুরি হয়ে গেলে চান করতে হত (পৃ.44)। স্বশিক্ষিত এই নিম্নবর্গীয় রচনায় এক ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে বিচার করা হয় দেশভাগ আর দাঙ্গাকে। আড়াই পাতার এই ছোট রচনাটি কিন্তু আগ্রহী গবেষকের কাছে অনেক সম্ভাবনাময় অনুসন্ধানের প্রেক্ষিত এনে দেয়। হয়ত এভাবেই নিম্নবর্গ 'সরব' হয়।

সংকলনটি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সন্দীপ বিস্তারিতভাবে তাঁর পর্যবেক্ষণ/অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করেন নি। এমন কি, সাক্ষাৎকারগুলিও খুবই টুকরো-টুকরো। ফলে জীবন জগৎ (life world) নির্মাণের জন্য বিবরণীর যে ঘনত্ব পাঠক/পাঠিকা আশা করে সেটি তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। দক্ষিণ এশিয় হলোকাস্টের যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করার আহ্বান তিনি জানান, সেই মৌখিক স্মৃতির আখ্যান কি এত সংক্ষেপে বিবৃত হয়? তবুও সন্দীপকে আমাদের দরকার হয়ে পড়ে দেশভাগ আর হিংসার অনুসন্ধানে, কারণ যে প্রশ্নগুলি তিনি বাঙালি পাঠক/পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরেন সেগুলি মৌলিক এবং তা জরুরিও বটে।

বর্তমান দক্ষিণ এশিয়ায়, আমাদের আত্মপরিচিতির বিভিন্ন সংজ্ঞার গভীরতার স্তরটিকে বুঝতে গেলে, ভুলে যাওয়া হিংসা আর তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধকে সরাসরি প্রশ্ন করতে হবে। আমাদের এই অবদমিত অভিজ্ঞতা ও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আঘাতকে উপশম করার এটা একটা উপায় ও যা হয়ত ভবিষ্যতের প্রজন্মকে আমাদের চেয়েও বেশি শিক্ষিত করে তুলতে পারে। আলোচ্য বইটিকে সন্দীপের আগের দুইটি বই 'ছেচল্লিশের কলকাতার দাঙ্গা' (1992) এবং 'দেশভাগ-দেশত্যাগ' (1994) -এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে সন্দীপ মুখের কথার মাধ্যমে এই হিংসার মনোসামাজিক জগতের জটিলতায় প্রবেশ করতে চেয়েছেন এই রচনায়। ফলে এই সূচনার কাজটি তিনি সার্থকভাবেই করেছেন। এক আগ্রহী পাঠক হিসাবে আমি তাকিয়ে থাকব তাঁর পরবর্তী প্রয়াসের দিকে, যা হবে আরও বিস্তারিত এবং এই রচনার অনালোচিত মৌখিক বিবরণীর এক দীর্ঘায়িত এবং ঘন উপস্থাপনা।

অমিতরঞ্জন বসু

দ্বিতীয় জন্ম

সত্যজিৎ ঘোষ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কৃষ্ণা বসু

মনোজগৎ—প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ

মাননীয় চিকিৎসক, মানবমন,

আপনাদের পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগটি সম্প্রতি চোখে পড়তেই মনে হলো একেবারে নিজের কথা। আপনাদের সাবজেক্টে আমার ফিরে আসবার কোন রাস্তা রয়েছে কিনা জানতে চাই।

কর্মজীবনের শেষের দিকে এসে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, হতাশ ও বিপর্যস্ত আমি। এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার কোন রকম ইচ্ছেই আমার আজ আর অবশিষ্ট নেই। এক প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করি আমি। দুএক বছর বাদেই অবসর নেব। আমার অবিবাহিত জীবন কেটেছে ভায়ের সংসারে। ভাইপো ভাইঝিকে কোলে পিঠে মানুষ করে। আমার ভাইপো-ভাইঝি ছিল আমার সব কিছু। ওদের নিয়েই ছিল আমার যা কিছু স্বপ্ন, কল্পনা। বিয়ের পর ভাইঝি চলে গেছে অনেক দূরে। আমার খোঁজ সে আর তেমন রাখেই না। ভাই বছর তিনেক হলো মারা গেছে। ভাইপো আর ভায়ের বৌ, যাদের জন্য আমার জীবনের সর্বস্ব খুইয়েছি, বিষয়-সম্পত্তির প্রশ্নে আমার সঙ্গে তারা আজ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। জীবনের কোন লক্ষই নেই আমার। সমস্ত লক্ষ, স্বপ্ন, কল্পনা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে। রাস্তায় হাজার মানুষের মধ্যে দিয়ে যখন বাড়ি ফিরি, মনে হয়—'এত মানুষ। অথচ কেউই আমার আপন নয়'। আমি আজ বাড়ি ফিরি বা না ফিরি কারও কিছু এসে যায় না। আমার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় এ পৃথিবীতে কেউই কোথাও বসে নেই। না ফিরলে কেউই খোঁজ নেবে না। আমি বেঁচে থাকা না থাকায় এ পৃথিবীর আজ আর কিছু এসে যায়না। আমি মারা গেলে কোথাও তার কোন শব্দ হবে না। অসম্ভব স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীটা চলবে—ঠিক এখন যেমন চলছে। রাস্তায় মানুষ যেমন করে আনন্দ করছে, হৈ হৈ করছে—করে যাবে। দারিদ্রবোধ আর সততা নিয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছি এতদিন। নানা সমাজিক কাজকর্মের মধ্যে জড়িয়ে ছিলাম। অনেকের ভালোবাসাও পেয়েছিলাম। নানা কাজের মধ্যে দিয়ে অনেকের প্রিয়ও হয়ে উঠেছিলাম। আজ তাদের ভালবাসা মূল্যহীন আমার কাছে। আমি না থাকলে তাদের মুখে 'আহা' বা 'নাঃ মানুষটা ভালোই ছিল' জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করে আবার জনস্রোতে মিলিয়ে যাবে তারা। ডাক্তার বাবু। আমি কেন বেঁচে থাকব তাহলে—বলুন তো ! শুধু মরতে ভয় পাই বলেই বাঁচবো। না, আমার কোন ভয় নেই। মরতেও আমি ভয় পাই না।

আমার রাতগুলো আমার কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। বিছানায় শুলে ঘরের শূন্য ছাদটা আমাকে যেন হাঁ করে গিলতে আসে। রাত এত ভয়ঙ্কর হতে পারে ! দিনের বেলায় কোন ভাবে সময় কেটে যায়। রাত যত এগিয়ে আসতে থাকে আমি অস্থির হয়ে উঠি। আরও একখানা ঐরকম ভয়ঙ্কর রাত কি করে কাটাব। রাতের নিস্তব্ধতা আমাকে শুধু বুঝিয়ে দেয়—তুমি একা। এ পৃথিবীতে তোমার কেউ নেই—একেবারে একা।

আজ আমি মরবার আগে শুধু নিশ্চিত ভাবে জেনে যেতে চাই যে আমার কোন রাস্তা ছিল না বাঁচার— তাই মরেছি, আর তাই আমি হেরে যাইনি। আপনার সাবজেক্টেও বিশ্বাস করি-আমার জন্য কোনো রাস্তা নেই। যদি থাকে তাহলে তা সামনে রাখুন দেখি।

মাপ করবেন, আমার চিঠিতে যদি কোনো ঔদ্ধত্য থেকে থাকে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

শুভেচ্ছান্তে-

কুণাল মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা - 26

উত্তর

প্রিয় কুণাল বাবু,

মানবমনের দপ্তরে আসা আরও অনেক চিঠি সরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি করে আপনার চিঠির উত্তর দেওয়াটা জরুরি মনে হলো।

না, আপনি মরতে ভয় পান না, তা নয়। আপনিও আর দশটা মানুষের মতোই মরতে ভয় পান বলেই এখনও নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন, মানবমনের দপ্তরে চিঠি লিখেছেন। নিঃসঙ্গ রাত্রির মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন, তাই রাত্রি আপনার কাছে বিভীষিকা। আর এই ভয় পাওয়াটা তো খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীর সব মানুষ তার জীবনকে ভালোবাসে, বাঁচতে চায় আর

তাইতো মরতে ভয় পায়। অবশ্য যদি না কোনো উদ্দেশ্যে মৃত্যুকে বরণ করতে হয় — যেমন ঘটে থাকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ক্ষেত্রে। 'আত্মহত্যা — হেরে যাওয়া' — এ উপলব্ধি আপনার যে রয়েছে, আপনার লেখাতেই তা স্পষ্ট। তাই নিজের আত্মহত্যার পক্ষে আপনি যুক্তি খুঁজে চলেছেন। নিজের কাছে নিজেকে জীবনযুদ্ধে জয়ী দেখতে চাইছেন। শেষ পর্যন্ত নিজেকে ফাঁকি যদি দিতেও পারেন, সামাজিক ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না। সমাজ কিন্তু আপনার প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়েই আপনাকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত বলেই মনে রাখবে — যদি তেমন কোন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেন। সমাজ কি ভাবলো আপনি তা ভাবেন এবং মরবার পরও সমাজের কাছে বেঁচে থাকতে চান জয়ী হিসাবে।

আত্মহত্যা হেরে যাওয়া কিনা, হয়ত এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়ে থাকে, তবু আমরা একে হেরে যাওয়াই বলবো। কারণ বেঁচে থাকার রাস্তা তার ছিল না, তা নয়। রাস্তা থেকেই যায় — অজস্র, অসংখ্য রাস্তা। আমরা তাকে খুঁজে পাইনা। জীবনের কঠিন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাস্তা খুঁজে পেতে যে লড়াই দরকার তা অনেক সময়েই পারিনা বলেই রাস্তা খুঁজে পাই না। কিশোর কিশোরীদের আবেগতাড়িত আত্মহত্যার কথা বাদ দিন। পরিণত বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে যে হতাশাজনিত আত্মহত্যা - তা তখনই ঘটে যায়, যে মুহূর্তে তার মারা যাওয়ার থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর আর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে বেঁচে থাকা। তাই আত্মহত্যা নিঃসন্দেহে জীবনের যন্ত্রণার অনুভূতি থেকে পালিয়ে যাওয়া। এই অনুভূতিকে উপেক্ষা করে সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে যদি অপেক্ষা করেন, হয়ত দেখবেন সময় পাল্টে দিয়েছে সেই অনুভূতি। আবার পৃথিবীতে সুন্দর বাতাস বইছে, গাছের সবুজ পাতা দুলছে। আবার প্রিয়জনের উষ্ণ সম্পর্ককে মূল্যবান মনে হচ্ছে। আত্মহত্যার দরজা থেকে ফিরে আসা এমন অনেককেই বলতে শুনি, 'ভাগ্যিস তখন কিছু করে বসিনি। আজ তো তাহলে আর এই দিনগুলোকে পেতাম না। শুধু তাই নয়, আপনার যে আপনজনেরা তাদের সুখের দিনে আপনাকে অস্বীকার করছে, নিজেদের সংকটের সময় আপনাকে হয়ত তাদের মনে পড়বে আর সেদিন বুঝতে পারবে তাদের ভুল। মনের চেতনার ভেতর সম্পর্কের শেকড় কত দূর চলে যেতে পারে, বাইরে থেকে সব সময় তা বোঝা যায় না।

মানছি, আপনার অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবনের এক কঠিন সময় পার হচ্ছেন আপনি। কিন্তু আপনি একা নন। আপনার মত নিঃসঙ্গ মানুষ আরও অনেক রয়েছেন যাঁরা লড়াই করে টিকে আছেন, কাজের মধ্যে ডুবে আছেন, হাসি দিয়ে নিজেকে আড়াল করে আছেন। তাঁদের আপনি না চিনলেও আপনি তাঁদের সঙ্গেই রয়েছেন। তাদের ফেলে রেখে আপনি পালিয়ে যাবেন! জীবনের সৌন্দর্য যে শুধু সুখ আর আনন্দে নয়, সংগ্রামেও। সাংসারিক সম্পর্কের মধ্যে, মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে-বউ সব থেকেও অনেক নিঃসঙ্গ মানুষ আছেন, যাঁরা বাঁচার জন্য বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে বাঁচতে চান। আর সেই বাইরের জগৎ তো আপনার এতটুকু খোয়া যায়নি। সে জগৎ আপনার আরও সুসংহত। কারণ আপনি সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে অনেকের প্রিয়জন। আপনার প্রতি তাদের এই ভালোবাসা তুচ্ছ হবে কেন? পৃথিবীটা তো চলছে ঘর আর বাইরের সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে। আপনার নিজস্ব গুণের জন্যই আপনি অনেকের প্রিয় ছিলেন। তাদের ভালোবাসা তুচ্ছ করে দিলে তাদের শুধু ছোট করা হবে না, নিজেকেও ছোট করা হয়। খারাপ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও শুধু রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে ভাইপো ভাইঝিকেই বুকে টেনে নেবেন, তা কি কোনো মহৎ কাজ হবে? অনেক সন্তানও মা-বাবার দায়িত্ব অস্বীকার করে। জীবনের এক অধ্যায় থেকে আর এক অধ্যায় জীবনের আর এক নতুন মাত্রা নিয়ে যাত্রা করে। তখনি নিজেকে শেষ করে দেয় না।

আমার মনে হচ্ছে আপনি নিজের প্রতি অবিচার করে ফেলেছেন। আপনার নিজের উজ্জ্বল, গৌরবময় দিককে নিজের কাছে তুলে ধরুন, নতুন করে সামাজিক কাজকর্মের জীবনে নিজেকে যুক্ত করুন। আত্মবিশ্বাস বাড়াবার জন্য নিজের গৌরবময় ও আনন্দের মুহূর্তগুলোর স্মৃতিচারণ করুন। আপনারই মতো আরও যাঁরা এই প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে চলছে, নিজেকে তাদেরই একজন বলে ভাবুন। আমরা যদিও নিজেদের ছোট ছোট সংসারে ভাগ হয়ে আছি, শেষ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে আমরা কিন্তু সবাই একই সাথে রয়েছি।

কৃপালবাবু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি আবার এই ভাবে ভাবতে শুরু করবেন— আত্মহত্যা নয়, বেঁচে থাকাটাই সাহসের, কারণ যে গুণগুলো আপনাকে অন্যের কাছে প্রিয় করেছে, সেগুলোই আপনার মধ্যে শক্তি হয়ে রয়ে গেছে। খুব প্রয়োজন হলে আবার চিঠি লিখবেন। তেমন হলে মনোরোগ চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে এই অবস্থা কাটিয়ে উঠে আবার নিজের শক্তিতে এগিয়ে চলুন।

চিঠিপত্র

চিঠি— ।

এপ্রিল '99 - এর 'মানবমন' পত্রিকাটি যথাসময়ে পেয়েছি। প্রচ্ছদের পরিবর্তন ভীষণভাবে মনকে আকর্ষণ করেছে। আশা করি নতুন প্রচ্ছদের জন্য পত্রিকাটি অনেকের কাছে আকর্ষণীয় হবে। এছাড়াও এই সংখ্যায় বেশ কিছু ভাল লেখা পাওয়া গেল। যেমন স্টিফেন লেভিন এর 'সেরে ওঠা কাকে বলে' এবং গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুর যন্ত্রণা - অন্যজীবন' । বাংলা ভাষায় এই ধরনের রচনা বিরল। তবে যথেষ্ট বানান ভুল কিংবা ছাপার ভুল, যা কোন আকর্ষক রচনা পড়তে গিয়ে বারে বারে মনোযোগ বিঘ্নিত করে। বিশেষ করে দার্শনিক অলকা চট্টোপাধ্যায়ের 'স্মরণাঞ্জলি' লেখাটিতে অনেকগুলি বাক্যের মধ্যেই ফাঁকা স্থান দেখা যায়। যা লেখাটিকে গুরুত্বহীন করে তুলেছে। দার্শনিকের প্রতি অত্যন্ত দায়সারাভাবেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে — একথা অনেক পাঠকের মনে উঠতে পারে। আরেকটি বিষয়, লেখাগুলো এতটাই compact যে বেশ কিছুটা পড়ার পরেই মনের উপর চাপ পড়ে। এতটুকু ফাঁক নেই, যেখানে relax করা যায়। অন্ততঃ প্রত্যেকটা পরিচ্ছেদ যেখানে শেষ বা শুরু হচ্ছে, সেখানে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা ছাড়লে ভাল হয়। এতে হয়তো বেশ কিছু পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়বে, কিন্তু চোখের বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে, নাহলে বড় রচনাগুলি খুব বেশিক্ষণ মনোযোগ টেনে রাখতে পারবে না। এছাড়াও আরো একটি কথা এখানে বলা দরকার। মালবিকা পণ্ডিতের ' একটি গবেষণার প্রতিবেদন' লেখাটি সাধারণ পাঠকের কতটা বোধগম্য হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই ধরণের লেখা ছাপালে বুঝতে হবে 'মানবমন' এক শ্রেণীর নির্দিষ্ট পাঠকের জন্যই প্রকাশ করা হয়। 'মানবমন'-এ কি ধরণের লেখা প্রকাশ করা হবে, এ বিষয়ে আরেকটু যত্নবান হলে ভাল হয়।

'মানবমনের' শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। পত্রিকাটি আরও অনেক অনেক পাঠকের মনের কাছাকাছি পৌছাবে, এই আশা রাখি।

দিগন্ত বসু
রাজারহাট, কলিকাতা।

চিঠি - 2

এপ্রিল '99- এ প্রকাশিত 'মানবমন' এর সাম্প্রতিক সংখ্যাটি যথাসময়েই হাতে এলো। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো নতুন প্রচ্ছদটি। বোঝা গেলো, নান্দনিক দিকটার প্রতি এবার তাহলে দৃষ্টি দিচ্ছেন আপনারা। তবে 'মানবমন' লেখাটিতে 'মানব' এর পরে একটু space থাকলে ভালো হয়। নাহলে একেবারে আনকোরা পাঠকের বিভ্রম হতে পারে,'মানব মন'-এর স্থানে 'মানবমন' পড়তে পারেন।

এবার আসা যাক্ পত্রিকার বিষয়সূচিতে। 'মনের ভারসাম্য' কিংবা 'ভারসাম্যহীনতা' আপনাদের সংখ্যার সম্ভবতঃ প্রধান বিষয়। কিন্তু অদ্ভুতভাবেই লক্ষ করি, পত্রিকার বিষয় নির্বাচনে বোধহয় এক ধরনের ভারসাম্যহীনতাই ফুটে উঠেছে। পাঠক নির্বাচনেও বোধহয় কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে আপনাদের।

'ব্যাকরণ মানি না' লেখাটি এই পত্রিকার কোন স্থান পেলো জানি না। 'মুক্ত অর্থনীতি - ভারত ও চীন - জাতীয় লেখা ছাপার জন্যও বহু পত্রপত্রিকা রয়েছে। এগুলি যদি শুধুমাত্র পৃষ্ঠা সংখ্যার সমতা রক্ষার জন্য ছাপা হয়ে থাকে, তাহলে পাঠক হিসাবে একটি অযাচিত পরামর্শই দেবো — প্রয়োজনে কম পৃষ্ঠার পত্রিকাই ছাপুন। বিষয় নির্বাচনে যত্নবান হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অন্য লেখাগুলি আপনাদের পত্রিকার ঘোষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্বাচিত, একথা সত্যি। কিন্তু কয়েকটি লেখার ভাষা এখনও অবধি ছয়ের দশকে পড়ে রয়েছে। যদিও আবার আপনাদের পত্রিকাতেই 'ভাষার বিবর্তন' শীর্ষক লেখাটি ধারাবাহিক ভাবেই প্রকাশিত হচ্ছে। পাঠক যখন ক্রমশঃ আধুনিক বাংলা গদ্যে অভ্যস্ত এবং অনুরক্ত, তখন 'মানবিক চেতনার স্বরূপ সন্ধানে'-এর ভাষা - বিন্যাসে বিরক্তি আসা স্বাভাবিক।

পাঠক নির্বাচনে আপনাদের অস্পষ্টতা ফুটে ওঠে ' একটি গবেষণার প্রতিবেদন' 'মানবমনে' হঠাৎ ছেপে ফেলায়। ওই প্রতিবেদনে চিকিৎসক এবং কিছু গবেষক হয়তো উপকৃত হবেন। কিন্তু, অধিকাংশ পাঠকই সম্ভবতঃ উপরোক্ত গোত্রভুক্ত নন। হঠাৎ এমন একটি technical লেখা খানিক বিস্ময়ের অনুভূতিই সৃষ্টি করে মনে।

বিজ্ঞানী হলডেন সম্পর্কে প্রকাশিত লেখাটি বেশ ভালোই, তবে তথ্যগুলি বহু আলোচিত।

'চিত্তবিদের ডায়েরি' মনকে একই সাথে ভারাক্রান্ত এবং চিন্তিত করে তোলে। 'কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে তা আমাদের জানা নেই'— যখন পড়ি, তখন চিত্তবিদের অসহায়তা সঞ্চারিত হয় পাঠকমনেও। এই অকপট স্বীকারোক্তি আরো

একটি অনুভূতি ব'য়ে আনে— যাক্ এখনো তাহলে কেউ কেউ স্বীকার করেন সততার সঙ্গেই নিজের অক্ষমতাকে, 'সবজান্তা' হ'য়ে যাননি তাহলে সবাই। 'ভাষার বিবর্তন' লেখাটি অবশ্যই উন্নতমানের এবং অনেক অজানা দিক উদ্ঘাটিত করে তা। কিন্তু, ত্রৈমাসিক পত্রিকায় 'ক্রমশঃ'-র আধিক্য বিব্রত করে। একটির বেশি ধারাবাহিক লেখা প্রকাশ না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

তবে এবারে স্টিফেন লেভিন-এর 'সেরে ওঠা কাকে বলে' এবং তার পরিপূরক ডাঃ গৌতম ব্যানার্জীর 'মৃত্যুর যন্ত্রণা - অন্যজীবন'— অন্য একটি মাত্রা যোগ করেছে 'মানবমন'-এ। এই ধরণের লেখা মাঝে মাঝে অন্তত যদি আপনারা পাঠকদের দিতে পারেন— পাঠকের কাছে তা সমাদৃত হবে, এই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে এই সংখ্যার পত্রিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে নিজের মতামত জানালাম। সম্পাদকমণ্ডলীকে নিজের অজান্তে যদি আঘাত দিয়ে থাকি এই চিঠির কোনো বাক্যে— তাহলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আঘাত করা নয়, স্পষ্ট ভাষায় একটি গঠনমূলক সমালোচনাই আমার অভিপ্রায়। পরিশেষে একটি অনুরোধ, মনোরোগের চিকিৎসায় এ-পর্যন্ত বহু গবেষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তাঁরা কেউ চিকিৎসক, কেউ মনোবিজ্ঞানী, কেউ বা জীববিজ্ঞানী। ফ্রয়েড, পাভলভ, ঈয়ুং তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আরো অনেকেই রয়েছেন। 'মানবমন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এক-একটি সংখ্যায় এই রকম এক-একজন বিশিষ্ট মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁদের অবদান সম্পর্কে যদি লেখা প্রকাশ করা যায়, তাহলে তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে।

আপাতত, এই পর্যন্ত থাক। শুভেচ্ছা রইল আপনাদের প্রতি। 'মানবমন' আরও আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয় হয়ে উঠুক এই আকাঙ্ক্ষাও অবশ্যই রইল।

উপল চক্র
মিত্রপাড়া, মৈত্যাটি

চিঠি 3

গত বছর অর্থাৎ '98 সালের অক্টোবর মাসের 'মানবমন' (সংখ্যা-4) পত্রিকায় মোহিত রণদীপের 'স্কিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা ও রোগীর পুনর্বাসন' শীর্ষক লেখাটির মাধ্যমে ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছি। বিশেষ করে রোগটির রোগলক্ষণ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা অনেকাংশে' দূর হয়েছে। সম্পাদককে একান্ত অনুরোধ, যদি বিভিন্ন মানসিক রোগগুলির একেকটি নিয়ে প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে রচনা প্রকাশ করেন, তাহলে পাঠকরা উপকৃত হবে। কমপক্ষে সঠিকভাবে রোগলক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত জায়গায় রোগীকে পুনর্বাসনের জন্য নিয়ে যেতে পারবেন অনেকেই। পরবর্তী সংখ্যা থেকে এধরণের বিভিন্ন রোগ সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে লেখা পাবো, আশা রাখি।

রূপকথা সেনগুপ্ত
ব্যারাকপুর
উঃ ২৪ পরগণা

চিঠি 4

প্রায় একবছর আগে 'মানবমন' পত্রিকার কোন একটি সংখ্যায় ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের 'মৃত্যু ও তার মনস্তত্ত্ব' শীর্ষক লেখাটি ভাল লেগেছিল। এই ধরনের লেখা বাংলা ভাষাতে কম পাওয়া যায়। এরকম বিরল বিষয়ে উন্নতমানের লেখা পাঠককে উপহার দেবার জন্য ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। কিন্তু এরপর আর ঐ ধরনের কোন লেখা এই পত্রিকায় পাওয়া যায় নি। 'মানবমন' পত্রিকার কাছ থেকে এই প্রকার কিছু বিরল বিষয়ে উন্নত মানের রচনা প্রত্যাশা করি।

আর একটি অনুরোধ। 'মানবমন' পত্রিকাটি যখন নিজেকে সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক একটি পত্রিকা হিসাবে দাবি করে, তখন আমার মনে হয় কিছু সচেতনতা বিষয়ক রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশ করা প্রয়োজন। সচেতনতা বলতে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার বা আচার আচরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে, প্রথাগত নিয়মকানুন ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা, উপরোক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সচেতনতামূলক রচনা প্রকাশ করলে পাঠকসমাজ অন্তত: কিছুটা সচেতন হতে পারে। ব্যক্তি সচেতনতার মাধ্যমেই সমাজ সচেতনতা আসা সম্ভব।

চন্দ্রিমা বসু
খিদিরপুর, কলিকাতা।

With Best Compliments from

TORRENT PHARMACEUTICALS LTD.

TORRENT HOUSE

OFF ASHRAM ROAD

Ahmedabad – 380009, India

Phone : (079) 6585090/6583060

Fax : (079) 6582100

With Best Compliments from

TRIKO PHARMACEUTICALS

Makers of

CHLOROTAME
Tablets
CHLORPROMAZINE HCL I.P. 100 mg
TRIHEXYPHENIDYL HCL B.P. 2 mg

TRIKOTAME-5
Tablets
TRIHEXYPHENIDYL HCL B.P. 5 mg

SEIZOTOL-200
Tablets
CARBAMAZEPINE I.P. 200 mg

CLOMIDEP
Tablets
CLOMIPRAMINE HCL B.P. 10, 25 & 50 mg

ZECALM
Tablets
ALPRAZOLAM U.S.P. 0.25 & 1 mg

TRICAB-300
Tablets
LITHIUM CARBONATE I.P. 300 mg

MANABMON
Vol. 8 No. 3
Regd. No. 8520/62
Office of the Registrar of Newspapers for India
জুলাই '99
মূল্য 10 টাকা

With Best Compliments from

MICRO LABS LTD.

SYNAPSE DIVISION

No. 3, Queens Road, Bangalore

Our Specialities

Rispond
(Risperidone 1/2/3/4 mg)

Nimocer
(Nimodipine 30 mg)

Petril
(Clonazepam 0.5/2 mg)

Fludawn
(Fluxetine 20 mg)

Lithium-SR
(Lithium 250 & 300 mg)

সম্পাদক : বাসুদেব মুখোপাধ্যায়
শ্রী এস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 98, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -700 007 হইতে প্রকাশিত।
ডিলু প্রিন্টার্স, 112 বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-700 009 হইতে মুদ্রিত।

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : ডঃ দীনেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ISSN 0971-0752

মানবমন

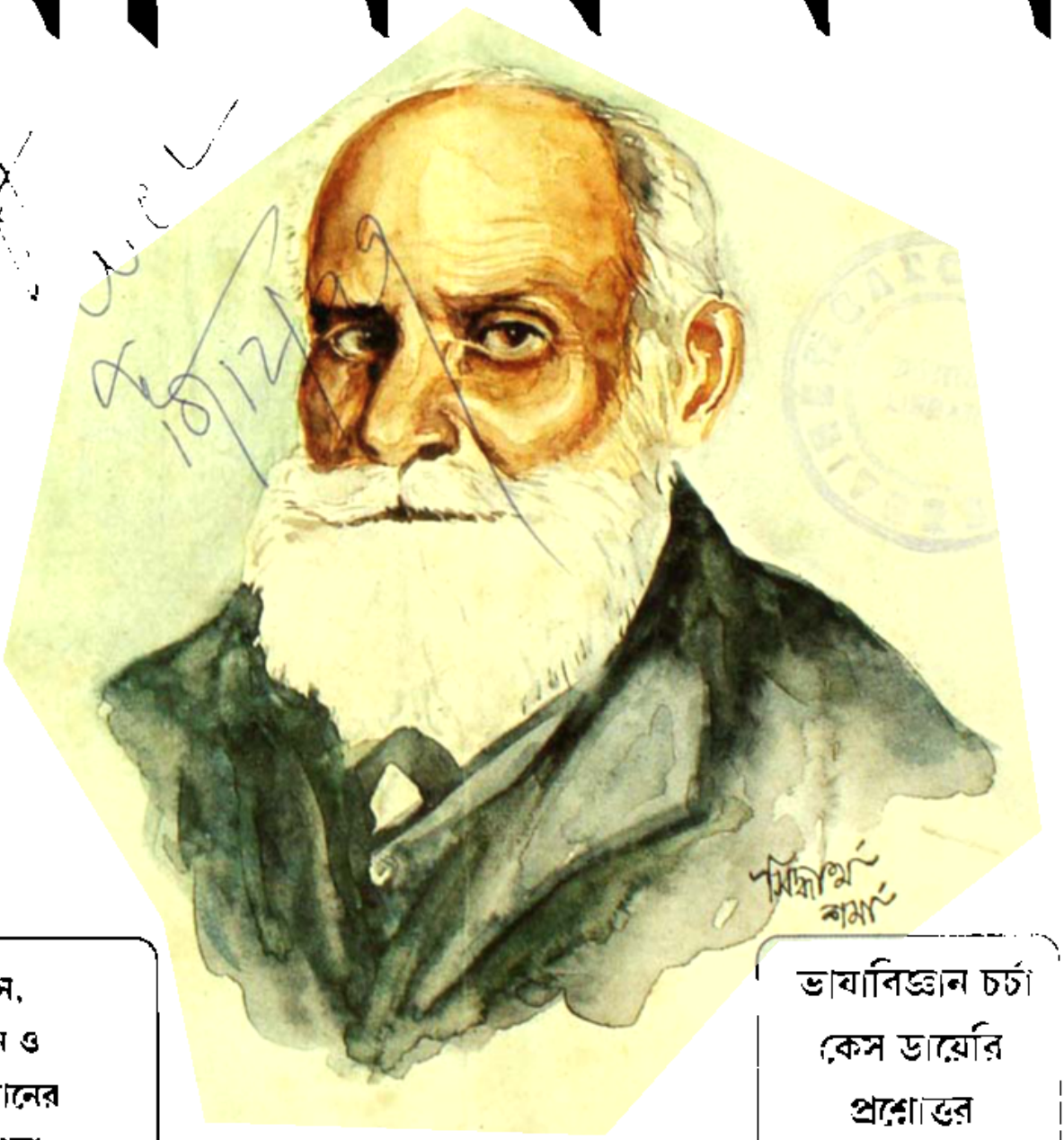

মনোবিজ্ঞান,
জীববিজ্ঞান ও
সমাজবিজ্ঞানের
আধুনিক ধারা
পরিচায়ক
ত্রৈমাসিক পত্রিকা
38 তম বর্ষ, সংখ্যা 4

ভাষাবিজ্ঞান চর্চা
কেস ডায়েরি
প্রশ্নোত্তর
আর
পাভলভকে নিয়ে
একগুচ্ছ লেখা

With Best Compliments from:

D. D. PHARMACEUTICALS

Calcutta • Jaipur

Makers of:

D. D. PRAMINE Tablets
Clomipramine HCl B.P. 10/25 mg.

D. D. LAM Tablets
Alprazolam USP. 0.25/0.50 & 1 mg

FLOXIN Tablets
Fluoxetine HCl 20 mg.

NIRA Tablets
Nitrazepam HCl 5/10 mg.

সূচিপত্র

● সম্পাদকীয়	—		2
● মানবীয় যোগাযোগ-আচরণ	—	বাসুদেব মুখোপাধ্যায়	3
● পাভলভ ও লেনিন	—	জোসেফ নীডহ্যাম	8
● পাভলভ ও মনের রোগ	—	ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	11
● স্নায়ুতন্ত্র, মনস্তত্ত্ব ও পাভলভ	—	জে. ডি. বার্ণাল	22
● পাভলভ আর ব্রিশ্‌ট	—	রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	28
● পাভলভ : তাঁর জীবন ও মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা	—	ভর্ন উইভহোল্ড	30
● পাভলভ - মনোরোগ চিকিৎসার নূতন উজ্জ্বল পথ	—	গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	36
● চিত্তবিদের ডায়েরি	—	চিত্তবিদ	41
● পাভলভীয় কন্ডিশনিং-এর ওপর সমকালীন গবেষণা	—	কে. এল. হলিস	44
● প্রশ্নোত্তর	—		53
● চিঠিপত্র	—		55
● পুস্তক আলোচনা	—		58

নিয়মাবলী

1. মানবমন ত্রৈমাসিক পত্রিকা। জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।
2. প্রতি সংখ্যা দশ টাকা। বিশেষ বইমেলা সংখ্যা কুড়ি টাকা। বার্ষিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সডাক পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দেয়। বছরের যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
3. চেক কেবলমাত্র কলকাতার জন্য। ড্রাফট, মনিঅর্ডার ইত্যাদি PAVLOV INSTITUTE & HOSPITALS অথবা MANABMON-এর নামে প্রদেয়।
4. এজেন্সি বা ব্যবসা সংক্রান্ত শর্তাদির জন্য কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। কমিশন 25%। অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি খরচ না দিলে গ্রাহকদের কাগজ বুকপোস্টে পাঠানো হয়।
5. দুঃখিত, অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

রেজিস্টার্ড অফিস
পাভলভ ইনস্টিটিউট
132 1A, বিধান সরণী,
কলকাতা—700 004

কার্যালয়
পাভলভ মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার
98, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা— 700 007
ফোন : 241-2935 (সকাল দশটা থেকে রাত্রি আটটা)

সম্পাদকীয়

পাভলভ, পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন। ইদানীংকালে তা আরও বেশি বেশি করে প্রমাণিত হচ্ছে যখন শারীরবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, প্রাণী শিক্ষাগ্রহণের গবেষক ইত্যাদি ব্যক্তিরা তাঁর কাজ থেকে নতুন নতুন কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা, গবেষণার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা পাচ্ছেন। পাভলভ কাজ শুরু করেছিলেন রক্তসংবহনতন্ত্রের স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের ওপর। সেখানে থেকে তিনি পরিপাকতন্ত্রের স্নায়বিক নিয়ন্ত্রনের বিষয়ে সরে এসেছেন। এই কাজের জন্য তিনি 1904 সালে নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রায় 35 বছর তিনি কাজ করেছিলেন গুরুমস্তিষ্কের শারীরবৃত্তির কার্যকলাপ নিয়ে। পাভলভ যখন এই কাজ রাশিয়ায় করছেন তখন ইউরোপ বা আমেরিকায় তাঁর কোন সমকক্ষ ছিলেন না। আর বলা যায় প্রায় কোন উপকরণ ছাড়াই তিনি তাঁর গবেষণার কাজ করে গেছেন। তাঁর কাজ থেকে তিনি 'মানবমন'- এর ওপর গবেষণাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক করে তুললেন। মনের কার্যকলাপের পরিমাণগত পরিমাপের জন্য তাঁর উদ্ভাবিত গবেষণা- পদ্ধতি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে. এইভাবে প্রায় পঞ্চাশ বছর গবেষণাগারে কাটিয়ে তিনি শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মনোরোগবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলিতে তাঁর প্রতিভার মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। এই অক্টোবরে তাঁর বয়েস দেড়শত বছর পূর্ণ হবে।

ভারতবর্ষ তথা এশিয়ায় পাভলভের শুরুমস্তিষ্ক- আশ্রিত মনোবিজ্ঞানের চর্চার পথিকৃৎ হলেন ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উনি পাভলভের সরাসরি ছাত্র ছিলেন না ঠিকই কিন্তু তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বহুদিন। তাই পাভলভের 'সম্মোহন অভিভাবন', 'মস্তিষ্কের টাইপ', 'পরীক্ষাগারে নিউরোসিস তৈরি', 'দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র', 'অনুযন্ত্র তত্ত্ব' ইত্যাদি বিভিন্ন মৌলিক গবেষণার বিষয়গুলি ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক- সাংস্কৃতিক পরিবেশে কাজে লাগিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে একক প্রচেষ্টায় মনোরোগচিকিৎসার একটি ঘরানা তৈরি করেছিলেন।

তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য কলকাতায় একটি সরকারি মানসিক হাসপাতালের নাম রাখা হয় পাভলভ হসপিটাল। কিন্তু যথেষ্ট পরিতাপের বিষয় সেখানকার চিকিৎসক- অচিকিৎসক কর্মীরা পাভলভ- চর্চা করা তো দূরের বিষয় ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাজকে যথেষ্ট অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের চোখে দেখেন। কিন্তু একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাই দিয়ে পাভলভ বা ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনোবিজ্ঞান বা মনোরোগচিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল্যবান গবেষণার কাজকে ছোট করা যায় না।

ইদানীংকালে পাভলভের ওপর যে অনেক গবেষণার কাজ হচ্ছে তার কিছু নথিপত্র আমাদের হাতে এসেছে। ইচ্ছা ছিল কেন কয়েকটি বাছাই করা ভালো লেখা নিয়ে আমরা একটি 'পাভলভ সংখ্যা' মানবমন এর পাঠকদের কাছে পরিবেশন করবো। কিন্তু নানা কারণে তা করা গেল না। দুটি তিনটি ননুনা লেখা আমরা এখানে রাখলাম এবং ইচ্ছা আছে প্রতি সংখ্যায় এমন একটি করে লেখা প্রকাশ করার। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো পশ্চিমী ও আমেরিকানরা পাভলভকে গৌরবান্বিত করতে চেয়ে সেই সময়কার বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সরকারকে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আমরা তাঁদের এই চিন্তাভাবনার বিরোধিতা করছি। সমস্ত ভালমন্দ নিয়ে পাভলভ ছিলেন রাশিয়ার সন্তান এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়া তাঁকে কাজ করার সবচেয়ে ভালো পরিবেশ করে দিয়েছিলো।

আমাদের অ্যাকাডেমিক সার্কেলে পাভলভের পরিচিতি প্রায় নেই বললেই চলে। কেননা আমাদের কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে যে শিক্ষাক্রম ছাত্রদের পড়ানো হয় তা অত্যন্ত পুরানো ধাঁচের এবং পাভলভ সেখানে এতটাই আধুনিক যে এই শিক্ষাক্রমের নীতি নির্ধারকরা তাঁকে পড়ানোর কথা ভাবতে পারেন না। তাই এটা পরিতাপের বিষয় যে নতুন প্রজন্ম পাভলভের দীর্ঘ গবেষণা জীবনের মূল্যবান ফসলগুলি তাদের জীবনের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারছে না।

মানবীয় যোগাযোগ আচরণের বিবর্তন (3)

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

নরবানরদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ও পরীক্ষাগারে যোগাযোগ আচরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা

নরবানরদের এমনকি মানুষেরও যোগাযোগ আচরণের মধ্যে জটিল, প্রয়োজনাতিরিক্ত, বস্তুমাত্রিক ওপ বা উপাদানের সমাবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যথা স্পর্শ, শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি এ ব্যাপারে নিযুক্ত রয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে যোগাযোগ করতে গিয়ে শিম্পাঞ্জীরা যে অঙ্গভঙ্গি করে তাতে মানুষের সঙ্গে তাদের অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়। এমনকি তাদের প্রক্ষোভিত মুখভঙ্গি যা সম্পূর্ণভাবে স্নায়বিক সংগঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে ব্যাপারেও মানুষের সঙ্গে তাদের মিল আছে। তাদের বাচিক স্বর, সীমাবদ্ধ কয়েকটি মাত্র শব্দে, নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে এবং নির্দিষ্ট কতকগুলি আবেগাহিত অবস্থায় প্রকাশিত হয় এবং এটা যেন জীনগত কর্মসূচির অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। কেননা এর কোন বৈচিত্র্য বা একাধিক বিন্যাস দেখা যায় না। সংক্ষিপ্ত আকারে বললে নরবানরদের বাচিক স্বরের সঙ্গে মানুষের বাচিক স্বরের কোন তুলনাই হয় না। পরিবর্তে বলা যায় আদিম মানুষের বাচিক স্বরের সঙ্গে এর হয়তো কিছু মিল থাকতে পারে। তবে আবেগাহিত হয়ে নরবানরা যে বাচিক স্বর ব্যবহার করে সেগুলি তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, কোন কিছু তাদের নিয়ন্ত্রনে থাকে না। সবশেষে বলতে হয় নরবানররা মানুষের ভাষা শিখতে পেরেছে এমন কোন উদাহরণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এছাড়া মানবশিশু ভাষা ব্যবহার করার শুরুতে যে স্বরগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করে তার উদাহরণ নরবানরদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

নরবানরদের ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সমস্যা দেখা দেয় তাদের স্বরযন্ত্রের ওপর কোন নিয়ন্ত্রন না থাকায়। এটার কারণ হল মানুষ ও নরবানরদের স্বরযন্ত্রের স্নায়বিক সংযোগ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির যথেষ্ট তফাৎ রয়েছে।

যদিও ভাষার ব্যবহার প্রতিটি প্রজাতির জন্য নির্দিষ্ট তবু বিবর্তনের মধ্যে দেখা যায় শ্রবনেন্দ্রিয়ের মাধ্যে ভাষার বিশ্লেষনের ক্ষমতা ভাষা ব্যবহার করার ক্ষমতার অনেক আগে এসে গেছে। আরও দেখা গেছে কথায় না ব্যক্ত করতে পারলেও নানান দেহভঙ্গি করে নরবানররা তাদের মনের ভাবে অনেকখানি প্রকাশ করতে পারে।

বহু বছর ধরে অনেক গবেষণার পর নরবানরদের যোগাযোগ আচরণ সম্পর্কে যে বিষয়গুলি নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে বলা হল।

1. কতকগুলি শব্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা শেখে এবং ব্যবহার করে। এমন কি সেই সব শব্দ যে অবস্থা বা ঘটনাকে প্রতিনিধিত্ব করে তাদের অনুপস্থিতিতেও ঐ শব্দ তারা ব্যবহার করতে পারে।
2. একে অপরের কাছে তারা নতুন শব্দ শিখতে পারে।
3. দলবদ্ধ আচরণের প্রয়োজনে তারা শব্দ ব্যবহার করতে পারে এবং একে অপরকে সেই শব্দ তারা শেখাতে পারে।
4. নিয়ম করে শব্দ ক্রমে সাজাতে পারে।
5. কোন বিষয়ের প্রতিক্রিয়ায় মন্তব্য করতে পারে।
6. উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াকলাপ ঘোষণা করতে পারে।
7. একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে এবং কি করতে চাইছে তা তারা বোঝাতে পারে।

এখানে যে বিষয়টি সবিশেষে উল্লেখ্য তা হল নরবানররা দেহভঙ্গি দিয়ে বাচিক স্বর ব্যবহারের থেকেও অনেক বেশি ভাবপ্রকাশ করতে পারে ঠিক যেমন করে থাকে মস্তিষ্কের 'ব্রোকা' ধরনের বাক্‌রোধ অসুস্থতায় ভোগা রোগীরা।

ভাষা তৈরির যন্ত্রপাতি

কেন্দ্রীয়ভাবে ভাষা তৈরি হয় মস্তিষ্কে এবং প্রান্তীয় ভাবে ল্যারিংস, জিভ, ঠোঁট, দাঁত ইত্যাদির চলনে। ভাষা তৈরির জন্য প্রাণীজগতের অঙ্গসংস্থানিক এই যে বিবর্তনগুলি ঘটেছে তার কোনটি আগে, কোনটি পরে বা সবগুলি একসঙ্গে- এইসব নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।

প্রান্তীয়ভাবে ফুসফুস বাতাস যোগান দেয় স্বরযন্ত্রের কম্পনের জন্য এবং সেই বাতাস ধ্বনিত হয়ে মুখের মধ্যে রূপান্তরিত হয় ভাষার সংকেতে। এই ধ্বনি পরিশীলিত করার জন্য একদিকে রয়েছে ফ্যারিংস, জিভ, ঠোঁট ইত্যাদি অন্যদিকে নাসিকাগহ্বরের অনুনাসিক ধ্বনি এর সঙ্গে প্রয়োজনমত মেশে।

মানুষ ও নরবানরদের স্বরযন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করলে কয়েকটি পার্থক্য স্পষ্ট হয়। যেমন ল্যারিংস বা যেখানে স্বরযন্ত্রের পেশি থাকে তার তুলনামূলক অবস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষের স্বরযন্ত্র রয়েছে ঘাড়ের কশেরুকার একটা ধাপ নিচে যেমন মহিলাদের C_5 স্তরে এবং পুরুষদের C_6 স্তরে। অন্যদিকে শিম্পাঞ্জীদের স্বরযন্ত্রের অবস্থান C_3 স্তরে। দেখা গেছে বানরদের স্বরযন্ত্র আরও ওপরে থাকে ফলে এটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না বিবর্তনের মধ্যে বানর, নরবানর ও মানুষের ক্ষেত্রে স্বরযন্ত্রের অবস্থান স্তর ক্রমশঃ নিচে নেমে এসেছে।

ল্যারিংস নিচের দিকে থাকায় সুবিধা যা হয় তা হল নাক দিয়ে শ্বাসযন্ত্রের সঙ্গে শ্বাসকার্য চলতে থাকে অবাধে এর জন্য মুখ বন্ধ করার দরকার হয় না কেননা সফট প্যালেট এপিগ্লটিসের কাজের বাধা সৃষ্টি করে না। নরবানরদের এপিগ্লটিস খাবার গেলার সময় ল্যারিংসের গহ্বরকে ঢেকে ফেলে যা মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে না।

এইসব পরিবর্তনগুলি সম্ভব হয়েছে মানুষ দুপায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর জন্য। বানর থেকে নরবানরদের মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর প্রবণতা অনেক বেশি এবং বিবর্তনে এইভাবেই মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্যে মুখমণ্ডলের যা ঘটেছে তা হল 'হনু' অংশ অর্থাৎ নিচের চোয়াল ভেতরের দিকে অনেকখানি ঢুকে গেছে ফলে স্পষ্ট চিবুক তৈরি হয়েছে তার জন্য জিভ মুখের এপাশ ওপাশ মুক্তভাবে যাতায়াত করতে পারে। এছাড়া নরবানরদের জিভ মানুষের তুলনায় পাতলা এবং দেখা গেছে এরা হাঁক দেবার সময় এদের জিভ স্থির থাকে। অন্যদিকে মানুষের জিভ পুরু এবং তাতে মাংসপেশির স্নায়ুসংযোগ বেশি ও বিচিত্র ধরনের।

এছাড়া মানুষ ও নরবানরদের স্বরযন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালীর ছোটখাট অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

অঙ্গ	মানুষ	নরবানর
থাইরয়েড হাড়	বড়	ছোট
ক্রিকয়েড হাড়	সোজা	শঙ্খের মত
ক্রিকোথাইরয়েড পেশি	নেই	আছে
হাইওয়েড হাড়	ছোট, চাপ্টা	কাপের মত
স্বরযন্ত্র	1. আসল নকল আলাদা ভাবে কাজ করতে পারে না	1. আলাদাভাবে কাজ করতে সক্ষম
	2. পর্দা পাশাপাশি মিলিত হয়	2. পর্দা কপাটিকার মত কাজ করে বলে নিয়ন্ত্রন করে যায়
পার্শ্বীয় থাইরোঅ্যারিটিনয়েড পেশি	ভোকালিস পেশির ভেতরের অংশের সঙ্গে বিশেষ সংযোগ গঠন করছে	এমন বিশেষ সংযোগ নেই

আরও দেখা গেছে শিম্পাঞ্জীরা শ্বাস ছাড়া ও নেওয়া এই দুই সময়েই স্বরযন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে মানুষ তা পারে না বিশেষ করে শ্বাস নেবার সময়।

মানুষ ও নরবানরদের স্বরযন্ত্রের গঠন ও কর্মে এইসব তফাৎগুলি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে ধ্বনি তৈরির ক্ষেত্রে বাচনক্ষমতার রূপান্তর কেমন করে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা লিখলাম।

বাচন ক্ষমতা সম্পর্কে লিবারম্যানের তত্ত্ব

বানর, নরবানর ও নরগোষ্ঠীর যোগাযোগরক্ষাকারী আচরণের বিবর্তনের ওপর লিবারম্যানের তত্ত্ব বহুল প্রচারিত। তাঁর তত্ত্বের মূল কথাগুলি এইরকম।

1. লিবারম্যান-নরবানর, মানবশিশু ও মানুষের বাচনক্ষমতার মধ্যে স্বরযন্ত্র ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অংশটুকু পরীক্ষা করে দেখালেন যে নরবানর ও মানবশিশুদের স্বরযন্ত্রের মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে তাই তাদের কণ্ঠধ্বনি প্রকাশের মধ্যেও অনেক মিল থাকবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এরা কেউ কণ্ঠধ্বনি প্রকাশের সময় জিভ ব্যবহার করে না। ল্যারিংসকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করে এরা ব্যবহার করতে পারে না এবং স্বরবর্ণের এ, আই, ঊ ধ্বনি এরা তৈরি করতে পারে না।

2. দেখা গেছে নরবানর ও মানবশিশুকে কণ্ঠধ্বনি প্রকাশের জন্য ল্যারিংসের ওপরের অংশের অস্থগুলির ধ্বনি তৈরির ক্ষমতার ওপর নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে মানুষের ল্যারিংসের ক্ষমতাই প্রধান এর থেকে প্রমাণ হয় মানবদেহের বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাচন ক্ষমতায় বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে (নিওটেনি নয়)।

3. বানর, নরবানর, আদিমানব ইত্যাদিদের করোটি ও স্বরযন্ত্রের ফসিলগুলির তুলনামূলক বিচার করে দেখা গেছে তারা এ, আই, ঊ ইত্যাদি মূল স্বরবর্ণগুলি ব্যবহার করতে পারে না। লিবারম্যানের মতে এই স্বরবর্ণগুলি চমৎকার দ্রুত যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া এরা শ্রবণেন্দ্রিয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলে ফলে অস্পষ্ট এলোমেলো বাচনের মধ্যেও এদের স্থায়ী ভাবে চিহ্নিত করা যায়। বিশেষতঃ এ, আই - এই দুটি ধ্বনি বক্তার স্বরযন্ত্রের আয়তনের নির্ধারক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। কেননা কণ্ঠধ্বনির মধ্যে মেশানো থাকায় ঐসব ত্রুটি বাচনগ্রাহ্যতার-ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

4. প্রত্যেকটি প্রজাতির কণ্ঠধ্বনি প্রকাশের সঙ্গে তার শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যক্ষমতার একটা সুন্দর উপযুক্ততা আছে, যা মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তার মূল স্বরবর্ণের বাচনভঙ্গির প্রকাশ থেকে। এই স্বরবর্ণগুলি সব ব্যবহৃত ভাষায় ওতঃপ্রোতভাবে মিশে থাকে।

মনে রাখতে হবে লিবারম্যান কখনই বলেছেন না যে ঐ মূল স্বরবর্ণগুলি ব্যবহার করার ক্ষমতা না থাকলে শ্রবণেন্দ্রিয় ও কণ্ঠধ্বনির যোগাযোগের কোন সংকেত তৈরি করা যাবে না। তিনি শুধু বলছেন ঐ স্বরবর্ণগুলির সাহায্যে আরও দক্ষতার সঙ্গে তা করা যাবে।

পরবর্তীকালে যাঁরা এইসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা লিবারম্যানেদের তত্ত্বের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি দেখতে পেয়েছেন। যেমন—

1. 'এ' স্বরবর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেললেও 'আই' বা 'ঊ' নয়।

2. 'আই' বা 'ঊ' নির্ধারক স্বরবর্ণ নয়।

3. মানবশিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বরযন্ত্রের বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে বাচনক্ষমতা ব্যবহারের কোন সামঞ্জস্য নেই।

4. লিবারম্যান করোটি ও স্বরযন্ত্রের ফসিল দিয়ে যে পুনঃনির্মান করেছেন, পদ্ধতিগতভাবে তাতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ করা গেছে।

5. প্রাণীটি কি ধরনের কণ্ঠধ্বনি গ্রহণ করছে তা স্বরযন্ত্রের আয়তনের ওপর নির্ভর করে না।

6. মানুষ এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করতে পারে তা কোনভাবেই পুনঃনির্মান করা সম্ভব নয়। এমন কি দেখা গেছে মানুষের স্বরযন্ত্র বা জিভ নষ্ট হয়ে গেলেও এই শব্দ তারা ব্যবহার করতে পারে। যেমন করে পাখি তার ঐ স্বরযন্ত্র দিয়ে মানুষের ভাষা নকল করে।

তুলনায় শ্রবণেন্দ্রিয় নিয়ে সমস্যা অনেক কম। দেখা গেছে নরবানর ও মানুষের অন্তঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণের গঠনের প্রায় কোন তফাৎ নেই। কর্মক্ষমতার বিচারে শিম্পাঞ্জীরা একটু কম কম্পাঙ্কের শব্দের ক্ষেত্রেও সংবেদনশীল এবং শব্দের উৎস সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করতে পারে। অন্যদিকে মানুষ অল্প কম্পাঙ্কের শব্দের মধ্যে একটির থেকে আর একটির বৈশিষ্ট্যকে তফাৎ করে বুঝতে পারে।

তবে যোগাযোগ আচরণের বিবর্তন নিয়ে যারা কাজ করছেন তাঁরা মানবীয় ভাষা, ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের সঙ্গে শ্রবণশক্তির সম্পর্কের ব্যাপারে তিনটি মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেগুলি এইরকম:

1. বিশেষ বিশেষ ধ্বনিসমষ্টি বাছাই করার ব্যাপারে শ্রবণক্ষমতার নির্দিষ্ট কোন স্বাধীন ভূমিকা নেই। 2. শ্রবণশক্তির স্বাধীন ভূমিকা আছে কিন্তু তা শুধু শুরুতে ধ্বনি গঠনের ক্ষেত্রে আর সেটা নির্ধারক ভূমিকা নয়। 3. শ্রবণশক্তি,ধ্বনিসমষ্টির প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস তৈরি করার ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা রেখেছে এবং এরই ওপর ভিত্তি করে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপযুক্ত উদ্দীপকগুলি তৈরী হয়েছে যা পরে বাচনক্ষমতার বিবর্তন ঘটিয়েছে।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণী ব্যবস্থা (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র)

একটা কথা এখনও বলা হয় যে এমন কোন সংগঠন মানবমস্তিষ্কের মধ্যে নেই যার আদি বিকাশ নরবানরদের মস্তিষ্কে ঘটে নি। জীববিদ্যার আচরণবিদরা ঘনিষ্ট প্রজাতিগুলির মধ্যে আচরণের মিল খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন বিশেষতঃ প্রাণীদের অঙ্গ-সংস্থানের গঠন আকৃতির সাদৃশ্যের দিক থেকে। যোগাযোগ আচরণের ক্ষেত্রে এমন কিছু প্রাসঙ্গিক ব্যবহার এবং তার প্রান্তীয় আঙ্গিক গঠন প্রণালী জীববিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন। মস্তিষ্ক যেন যথেষ্ট কড়া ও রক্ষণশীল অভিভাবক। একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। আমাদের মধ্যকর্ণের ছোট ছোট কয়েকটি হাড় আদি স্তন্যপায়ীর নিচের চোয়ালের হাড় থেকে এসেছে। দেখা গেছে এদের পেশির সংযোগরক্ষাকারী স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ এসেছে মুখের স্নায়ু থেকে যেমন ফেসিয়াল ও ট্রাইজেমিন্যাল স্নায়ু। মস্তিষ্কের এই রক্ষণশীল অবস্থার জন্য অনেক বিজ্ঞানী এমন মতামত পোষণ করেন যে জ্ঞানাত্মক স্তরে নরবানরদের পরে মানুষের বিবর্তনে যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, তা শুধুমাত্র পরিমাণগত, গুণগত কিছু নয়। দেখা গেছে যোগাযোগ আচরণে প্রক্ষোভজনিত যে সব ব্যবহার নরবানররা প্রাকৃতিক পরিবেশে করে তার সঙ্গে মানুষের আচরণের যথেষ্ট মিল আছে। এগুলি ছাড়া রয়েছে সংকেত তৈরি ও আদানপ্রদান করার ক্ষমতা এবং এর মধ্যে বৈজ্ঞিক ও অবৈজ্ঞিক সংকেতগুলি ব্যবহার ও অভ্যস্ত হওয়া ইত্যাদি। এইসব কিছু বিচার বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা নরবানর ও মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তন, বৃদ্ধি ও বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্তে এসেছেন।

বিজ্ঞানীরা বলছেন এইসব বিষয়ে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন 1. উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য স্নায়বিক সংগঠন পরিমাণে অনেক বেড়েছে 2. ঐ সংগঠনের মধ্যে দুটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে তা হল স্বয়ংযন্ত্র গ্রহণেন্দ্রিয়ের সংযোগরক্ষাকারী বৈজ্ঞিক, অপ্রক্ষোভিক স্নায়বিক সংগঠনের ক্রমাগত বিশেষত্ব অর্জন, আর ধারণা তৈরির জন্য অসম্ভব জটিল সংকেতবার্তা গঠন করার ক্ষমতা অর্জন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এর জন্য মস্তিষ্কে অভিনব কোন স্নায়বিক সংগঠন গঠিত হয়নি তবে তুলনামূলকভাবে মানবমস্তিষ্কের আয়তন অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে মস্তিষ্ক, যোগাযোগরক্ষা-কারী গুণের জন্য আরো বেশি বেশি উপাত্ত সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি অর্জন করেছে।

উপরের এই ধারণাগুলিকে যদি সঠিক বলে মেনে নিতে হয় তাহলে আমাদের নরবানর ও মানবমস্তিষ্কের গঠন আকৃতি ও কার্যকলাপের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখতে হবে।

মস্তিষ্কের তুলনামূলক গঠন আকৃতির বর্ণনা

তুলনামূলকভাবে মানবমস্তিষ্কের ওজন, আয়তন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর থেকে বড়। কিন্তু এমন অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে যাদের মস্তিষ্কের ওজন মানবমস্তিষ্কের থেকে বড় । যেমন তিমির কথাই ধরা যায় যার মস্তিষ্কের ওজন প্রায় 2940 গ্রাম যা মানুষের মস্তিষ্কের ওজনের প্রায় দ্বিগুন। অথচ কার্যকলাপের দিক থেকে মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে তিমির মস্তিষ্কের কোন তুলনাই চলে না। এক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হল দেহের ওজনের অনুপাতে মস্তিষ্কের ওজন বিচার করা। দেখা গেছে মস্তিষ্কের মধ্যে জ্ঞানাত্মক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় দেহের ওজনের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বিবর্তনের উচ্চতর স্তরে প্রাণীর দেহের ওজন কমে গেলেও মস্তিষ্কের ওজন সেই অনুপাতে কমেনি যা মানুষের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এই বিষয়টিকে একটা মাপা পদ্ধতির মধ্যে আনা উচিত তাই দেহের ও মস্তিষ্কের তুলনামূলক ওজনের ক্ষেত্রে একটি সূচক কিছু থাকা উচিত। এ ব্যাপারে অনেক মস্তিষ্ক বিজ্ঞানীর অভিমত হল নরবানরদের মস্তিষ্কের ওজন সূচক কিছু হিসাবে কাজ করতে পারে।

দেখা গেছে মস্তিষ্কের বাচনক্ষমতার জন্য যে স্নায়ুসংযোগ ঘটেছে তা বিবর্তনের সর্বশেষ সংযোজন এবং তাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন 'নিয়োকর্টিনেসিস'। হিসাব করে দেখা গেছে কথা বলার জন্য প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1,40,000 বার পেশির সঙ্গে স্নায়ুসংযোগ ঘটে। এর জন্য বানরজাতীয় প্রাণীদের মস্তিষ্কের কয়েকটি অংশের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছে যেমন সেরিবেলাম ও গুরুমস্তিষ্কের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটি ঘটেছে। পরবর্তীকালে দেখা গেছে মটর কর্টেক্স, সেনসরি কর্টেক্সের তুলনায় বেশি বিকশিত হয়েছে। এর সঙ্গে মস্তিষ্কের বাক্ ও বাচনের অনুষঙ্গ অঞ্চল যেমন ব্রডম্যান অঞ্চল 44, 45, 22, 37, 39, 40 ইত্যাদি বিকশিত হয়েছে। এই বৃদ্ধি বিকাশ আরো ভালোভাবে বোঝা গেছে নরবানর ও আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের তুলনা করে। এমনকি আমাদের

লিম্বিক তন্ত্রের সঙ্গে ভাষা তৈরির স্নায়ুসংযোগ রক্ষার ব্যাপারে আলাদাদের মধ্যে যে নিউক্লিয় কেন্দ্র রয়েছে (অ্যান্টিরিয়ার সিনসিপ্যাল ও ল্যাটারেল ডরসাল) তা নরবানরদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নরবানরদের মস্তিষ্কে মানুষের মত ব্রোকা অঞ্চল (ব্রডম্যান 44, 45) এবং ভার্ণিক অঞ্চল (ব্রডম্যান 22) রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নরবানরদের, ব্রোকা ও ভার্ণিক অঞ্চল সংযোগকারী আরকুয়েট ফ্যাসিকুলাস অনুপস্থিত তার ফলে অনুমান করা হয় শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে তারা ভাষাকে চেষ্টিয় অঞ্চলে স্থানান্তরিত করতে পারে না। ফলে তারা ভাষা শিখতে পারে না। ঠিক তেমনি মস্তিষ্কের দুইভাগের অপ্রতিসম অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট কাজকর্ম হয়েছে এবং দেখা গেছে মানুষের মস্তিষ্কের উত্তীর্ণ হওয়ার অনেক আগে এই অপ্রতিসম আঙ্গিক গঠন শুরু হয়েছে।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতির বিবরণ

নরবানরদের মস্তিষ্ক নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নিউনিখে ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট অব সাইকিয়াট্রির কাজ। এঁনারা দেখিয়েছেন নরবানরদের কণ্ঠধ্বনি প্রকাশের নিয়ন্ত্রণ সবটুকু অবৈচ্ছিক এবং তা লিম্বিকতন্ত্রের নিয়ন্ত্রনে। নরবানরদের মস্তিষ্কে ভাষা তৈরির জন্য যে স্নায়ুসংগঠন গঠিত হচ্ছিল তা যেন গুরুমস্তিষ্কের স্বৈচ্ছিক নিয়ন্ত্রনের জায়গায় গিয়ে থেমে গেছে। এর জন্য মানবমস্তিষ্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠিত হয়েছে যথা এন্টিরিয়ার সিনগুলার কর্টেক্স ও সাপ্লিমেনটারি মোটর এরিয়া। এরা যেন লঘু মস্তিষ্ক থেকে ভাষার নিয়ন্ত্রনটা গুরুমস্তিষ্কে টেনে নিয়েছে। তাই গুরুমস্তিষ্কের ভাষার নিয়ন্ত্রনের অংশটুকু কেটে বাদ দিলেও বানর ও নরবানরদের কণ্ঠধ্বনি প্রকাশের কোন অসুবিধা হয় না।

কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে মানুষের মত মনুষ্যেতর প্রাণীদের ভাষা উৎপাদনের কেন্দ্র না তৈরি হলেও ভাষার গ্রাহীকেন্দ্র এদের রয়েছে এবং তা যথেষ্ট সক্রিয়। কেননা গুরুমস্তিষ্কের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংযোগের অনুষঙ্গ অঞ্চল নষ্ট করে দিলে মনুষ্যেতর প্রাণীরা তাদের নিজেদের ভাষার সঙ্গে মানুষের ভাষার তফাৎ করতে পারে না। এর থেকে বোঝা যায় ভাষা গ্রহণ করার স্নায়ুসংগঠন, উৎপাদনের অনেক আগেই বিবর্তিত হয়েছে।

উপসংহার

ভাষা যোগাযোগরক্ষাকারী আচরণের বিবর্তনের মধ্যে আমরা দেখাতে চাইলাম যে দুটি দিকে এটি অগ্রসর হয়েছে। এর একটি ভাষা উৎপাদন নিয়ন্ত্রন ও অন্যটি বিশ্লেষণ। এই অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে বানর, নরবানর ও মানুষ এই ক্রমে ভাষার স্নায়ুসংগঠন গড়ে ওঠেছে তা কোথাও আংশিক, কোথাও সম্পূর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায়। কখনো ব্যাপারটা এমন ঘটেনি যে মানুষের ভাষা তৈরি করার ক্ষমতা বা গুণ হঠাৎ করে অর্জিত হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

এ সংখ্যার সঙ্গে যাঁদের গ্রাহক চাঁদা ফুরোচ্ছে তাঁদের কাছে আমরা চিঠি পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি গ্রাহক চাঁদা পাঠিয়ে দিন।

—অধ্যক্ষ, মানবমন

পাভলভ ও লেনিন

জোসেফ নীডহ্যাম

৮৬ বছর বয়সে অধ্যাপক ইভান পেত্রভিচ পাভলভ-এর মৃত্যুসংবাদ গত বৃহস্পতিবার (ফেব্রুয়ারি 27, 1936) সারা পৃথিবীর ভাবৎ বিজ্ঞানকর্মী গভীর দুঃখের সঙ্গে জেনেছেন। এই মৃত্যুতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হারাল তার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে আর সামগ্রিকভাবে বিশ্ব হারাল এ যুগের সেই আধডজন মহামূল্যবান বিজ্ঞানীর একজনকে, আসন্ন প্রজন্মগুলির কাছে যাঁদের নাম আমাদের প্রজন্মকে বিশিষ্টতা দান করবে। আইনস্টাইন, ফ্রয়েড, ক্রেজার ও রু (Roux). হপকিন্স্ ও ওয়ারবার্গ, শেরিংটন ও হেড-এর মতো চিন্তাবিদদের সঙ্গে একযোগে তিনিও এমন এক পৃথিবী রেখে গেলেন যা তাঁর চিন্তা ও কর্মের ফলে একেবারে আমূল বদলে গেছে।

একথা সুবিদিত যে, পাভলভ-এর বাবার ইচ্ছা ছিল তিনি যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন। সেইমতো বছরখানেক পড়াশুনো করার পর তিনি অবশ্য উপলব্ধি করেন, তাঁর আগ্রহ বিজ্ঞানের দিকে। সুতরাং তিনি জীববিদ্যার চর্চা শুরু করেন। এই পরিবর্তনটুকু না ঘটলে পৃথিবীর কত না ক্ষতি হতো!

1870 সাল নাগাদ, ফ্রাঙ্ক-প্রুশিয়ার যুদ্ধ ও প্যারী কমিউনের সময়ে, স্নায়ু জলে পাওয়া যায় এমন এক ধরনের স্নায়ুকের শারীরবিদ্যা সংক্রান্ত ডক্টরেট-গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেন তিনি। তখনও তিনি তাঁর জীবনের আসল কাজ খুঁজে পাননি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উচ্চতর প্রাণীদের পরিপাক-ক্রিয়া নিয়ে তিনি অনুসন্ধান শুরু করেন। পরিপাক যন্ত্রের যে জটিল নিঃসরণ ও শোষণ প্রক্রিয়া আমাদের খাদ্যবস্তুকে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে পরিণত করে, সে সম্পর্কে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অনেকখানিরই ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি। তাঁর কাজের আগে এ ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতার দশা ছিল কেমন তা এখন কল্পনা করাই কঠিন। এই পরীক্ষাগুলির জন্য শল্যবিদ্যার অসাধারণ সব পদ্ধতির পাশাপাশি আরও সাধারণ ক্রিয়াকৌশল—দু-একটি প্রয়োজন হয়েছিল।

পাভলভের কাজের অনেক আগে, নেপোলিয়নের মৃত্যুর সময়ে, আলেক্সি স্যাঁ মারত্যাঁ নামে এক ফরাসি-কানাডিয়ান গাইডের দেহে বন্দুকের গুলির আঘাত লাগে এবং যা শুকিয়ে গেলেও তাঁর পাকস্থলীর গায়ে ছিদ্র থেকে যায়। উইলিয়াম বেমোন্ট নামে এক তরুণ আমেরিকান সেই ছিদ্র দিয়ে পরিপাক-ক্রিয়া সরাসরি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। তাঁর অনুসন্ধানলব্ধ কাজ এখন জীববিদ্যা-চর্চায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ বলে স্বীকৃত। বোমোন্টের কপালে যে সুযোগ দৈবক্রমে ঘটেছিল, পাভলভ তা করলেন জীবজন্তুর শরীরে অসাধারণ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে। ওইসব অস্ত্রোপচার জীবজন্তুগুলির পক্ষে একটু অসুবিধাদায়ক হলেও, পাভলভ এর সাহায্যে পরিপাক ক্রিয়ার দুর্বোধ্য পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হলেন।

1900 সাল নাগাদ তিনি প্রবেশ করলেন মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষেত্রে (গবেষণায়), কারণ ততদিনে এটা জানা গেছে যে মানুষের পরিপাক-ক্রিয়া কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে। ফলে তিনি স্নায়ুতন্ত্র বিশ্লেষণের একটা উপায় পেয়ে গেলেন। আজ আমরা জানি যে আমাদের শরীরের অনেক ক্রিয়াই "স্বয়ংক্রিয়", অর্থাৎ মস্তিষ্ক বা চেতনাকে না যুক্ত করে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি থেকে স্নায়ুসংবাদ সুষম্নাকাণ্ডকে উদ্দীপ্ত করে, যেখান থেকে সাড়া-প্রদানকারী অঙ্গগুলো নির্দেশ পায়। হাঁটুর ঝাঁকুনি এমনই একটা উদাহরণ। এই ধরনের পরাবর্ত-ক্রিয়া অনেক সময়েই বেশ জটিল, যা জীবজন্তুর পূর্ব-ইতিহাস, যেমন লব্ধ শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। এর থেকেই পাভলভ তাঁর জগদ্বিখ্যাত অভিজ্ঞতার অনেক— খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে জড়িত প্রতিক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণের দ্বারা আমরা কোনো প্রাণীর শিক্ষা ও বিচারক্ষমতার প্রভাব কতখানি তা অনুধাবন করতে পারি।

যে-কোনো জন্তুর মুখের কাছে খাবার রাখলেই তার লালা নিঃসরণ হতে থাকে। সহজ কথায় খাবার দেখলে জিভে জল আসে। এটাকে বলা হয় শর্তহীন পরাবর্ত (unconditioned reflex)। যদি প্রতিবার খাবার দেওয়ার সময়ে ঘন্টা বাজানো হয়, তবে দেখা যাবে, কিছুদিন পরে শুধুমাত্র ঘন্টাধ্বনিই জিভে জল আসার পক্ষে যথেষ্ট হচ্ছে। তার মানে "শর্তাধীন পরাবর্ত" (conditioned reflex) তৈরি হয়েছে। দৃষ্টি বা ঘ্রাণ যে কোনো ধরনের ইন্দ্রিয়কেই এই ধরনের পরাবর্ত-ক্রিয়ার উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

স্বরের বিভিন্ন রকমের তীক্ষ্ণতাকে একটা কুকুর কতখানি প্রভেদ করতে পারে, অথবা একেবারে প্রতিষ্ঠিত পরাবর্ত-ক্রিয়া একটা জন্তুর ভুলতে বা বদল করতে কতখানি সময় লাগে— তার একটা পরিমাপও করা সম্ভব হয়েছে এই পদ্ধতির সাহায্যে। জন্তু জানোয়ারের স্নায়ুতন্ত্র বিকল করে, আবার তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনাও সম্ভব হয়েছে এই পদ্ধতিতে। অর্থাৎ বলা যায় ঘুনাপায়ী প্রাণীর অতি জটিল স্নায়ুতন্ত্র (যার প্রকৃতি তীব্রণ জটিল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর মতো) বিশ্লেষণ করার অভূতপূর্ব ক্ষমতা আমরা এই পদ্ধতিতে লাভ করলাম।

এই আবিষ্কার মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। সংগ্রহশীল সমাজ থেকে সহযোগিতাশীল সমাজে উত্তরণ সম্ভব— এই মতের যাঁরা বিরোধী তাঁদের মূল যুক্তি হলো, "মানুষের প্রকৃতি কখনও বদলাতে পারে না", আর তাই তার উন্নতির আশা করা অর্থহীন। বিপরীতপক্ষে কিন্তু স্নায়ুতন্ত্র সবকিছু শিখে চলেছে এবং কোনো "আদি পাপে" নিয়তিনির্দিষ্ট থাকার বদলে, মানুষের স্নায়ুতন্ত্র নমনীয় এবং বর্তমানে আগ্রাসী, অধিকারবাদী পরিবেশের বদলে ভালো পরিবেশের প্রভাবে সাড়া দিতে সক্ষম। "মানুষের প্রকৃতিকে আগে পরিবর্তন করতে হবে, তবে সমাজ পরিবর্তন করা যাবে"— ধর্মীয় মতবাদের এই ভিত্তিও এর ফলে ধসে পড়ে। পক্ষান্তরে কিছু আইন অন্যগুলির তুলনায় ভালো এবং সেইসব ভালো আইনের আওতায় আনলে মানুষ তাতেই সাড়া দেবে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ব্যক্তিগতভাবে যোগানোর কোনো ভূমিকাই নেই। কিন্তু ভালো আইন যা করে তা হলো: মানুষের সামাজিক তাড়নাগুলিকে উদ্দীপ্ত করা এবং সমাজবিরোধী তাড়নাগুলিকে নিবৃত্ত করা।[1]

ইভান পেত্রভিচ, যে নামে তিনি রুশ বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত, গোড়ার সেই মহান জার্মান, কার্ল লুডভিগ-এর ছাত্র ছিলেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লর্ডার ব্রানটন ও গ্যাসকেল-এর সঙ্গে একযোগে তিনি কাজ করেছিলেন লাইপজিগ-এ তাঁর গবেষণাগারে। তাঁর নিজের খ্যাতি এত বিপুল ছিল যে তাঁর ছাত্রসংখ্যা ছিল সমুদ্রের বালুকণার মতো। সেই ছাত্রকুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, নেঙকি, যিনি জীবরসায়নে বিশেষ দক্ষতালাভ করেছিলেন এবং তাঁর নাম বহন করছে পেত্রোগ্রাডের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি। এছাড়া ছিলেন ওয়েডেনস্কি ও বাবকিন— দুই বিখ্যাত স্নায়ুবিদ; বাবকিন ও লণ্ডন, পরিপাক-ক্রিয়ার দুই বিখ্যাত গবেষক, এবং ওরবেলি, যিনি লেনিনগ্রাদের সুবিখ্যাত সামরিক চিকিৎসা আকাদেমি-তে শারীরবিদ্যা বিভাগে পাভলভের পদ অলংকৃত করে আছেন। তরুণতর প্রজন্মের রয়েছেন অ্যানরেপ, যিনি কারয়োর মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা বিভাগের প্রধান হওয়ার আগে ছিলেন কেমব্রিজে সহকারী অধ্যাপক; এছাড়া আছেন রোসেনথাল, কোনোরস্কি ও অন্যরা।

1917 -এর আগে ইভান পেত্রভিচ ছিলেন মৃদু সমাজবাদী, কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলা ও দুর্বিপাক তাঁকে বলশেভিকদের বিরোধী করে তোলে। অদম্য অধ্যবসায় নিয়ে তিনি যুদ্ধ ও সংঘাতের মধ্যেও তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল না, গবেষণাগারে আলোর ব্যবস্থা হতো পাইন কাঠের মশালের আলোয়। ঘর গরম রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, ওভারকোট ও স্নো-বুট পরে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। পরীক্ষার প্রয়োজনে আনা জন্তুগুলি ঠাণ্ডায় ও খাদ্যাভাবে গবেষণাগারে মারা যেতে থাকে। পাভলভ ও তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই বীরোচিত কাজ বিজ্ঞানীদের কাছে এক উদ্দীপনাময় উদাহরণ— যাঁরা মৌলিক গবেষণা এবং দীর্ঘস্থায়ী পরীক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন এবং সেই কারণেই জাতীয় সংকটকালে নিজেদের আরব্ধ কাজ ফেলে চলে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হন। সুখের কথা, সরকারি কাজকর্মের কঠিনতম সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও, নতুন সরকার তাঁর আচরণে নিরুৎসাহ হননি। লেনিনের সহকর্মী, চিকিৎসক সেমাশ্‌কো, যাঁর ওপর স্বাস্থ্য পরিষেবা পুনর্গঠনের দায়িত্ব ছিল ও অন্য যাঁরা বিজ্ঞান ও চিকিৎসার ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, মিলিতভাবে, তাঁদের সাধ্যানুযায়ী তাঁকে সাহায্য করেছেন যাতে সমাজবাদী স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তাল রেখে পাভলভ ধাপে ধাপে তাঁর কাজের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি পেতে পারেন। তাছাড়া তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, চিকিৎসা এবং জীববিদ্যা, স্বাস্থ্য ও শিশুপরিচর্যা সম্পর্কে বলশেভিকদের কথা ও কাজে ফারাক নেই।

তাই তাঁর জীবনের শেষ দশ বছর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির পরিকল্পনাগুলির দৃঢ় সমর্থক ছিলেন এবং সোভিয়েত জীববিদ্যা সংগঠিত করার কাজে বিপুলভাবে যোগ দেন। মৃত্যুর ঠিক আগে শেষবার তিনি যখন তাঁর জন্মস্থান রিয়াজান-এ যান, এক বক্তৃতায় তিনি বলেন :

"আমি বলতে চাই বিজ্ঞানের প্রতিনিধিরা আগেও সংবর্ধনা পেতেন, কিন্তু সেইসব অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র সমগোত্রীয়দের সংকীর্ণ ঘনিষ্ঠ চক্রের মধ্যে— বিজ্ঞানীদের মধ্যে। এখন আমি যা প্রত্যক্ষ করছি তার সঙ্গে সেইসব সংকীর্ণ অনুষ্ঠানের কোনো মিল নেই। আমাদের দেশের সমস্ত মানুষই এখন বিজ্ঞানকে সম্মান দেয়। সেটি আমি প্রত্যক্ষ করেছি রেলস্টেশনে, যৌথ খামারে, এখানে আসার পথে। যদি আমি বলি এর কৃতিত্ব প্রাপ্য আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন সরকারের, সেটা নিশ্চয়ই ভুল বলা হবে না। আগে বিজ্ঞান ছিল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, জনসাধারণ থেকে বিযুক্ত, কিন্তু এখন দেখছি ঘটনা অন্যরকম— সমগ্র জাতিই বিজ্ঞানের সম্মান করে, মর্যাদা দেয়। আমি আমার পানপাত্র আমার দেশের সরকারের সাফল্য কামনা করে তুলে ধরছি— পৃথিবীর এই একমাত্র সরকার যেটি তা ঘটিয়েছে এবং বিজ্ঞানকে এই উচ্চমূল্য দিয়েছে এবং এতখানি সহায়তা দান করে চলেছে।"

---

1. 'অর্জনীন পরাবর্তগুলি বিষয়ে বক্তৃতাবলি', খণ্ড 2, পৃ. 33 ও 117 তুলনীয়।

বিশ্বের সব দেশেই তাঁর কাজ সংবর্ধনা পেয়েছে। অনেক আগে, 1904 এ তিনি জীববিদ্যায় নোবল পুরস্কার পান— এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হওয়ার প্রথম দিকের অনুষ্ঠানে। ব্রিটিশ শারীরবিদ্যা সমিতি 1908 -এ তাঁকে অনুরূপভাবে সম্মানিক সদস্যপদে বরণ করেন। সভা জগতের সর্বত্রই তাঁকে অনুরূপভাবে সম্মানিত করা হয়। 1923 -এ এডিনবরা-য়, আন্তর্জাতিক শারীরবিদ্যা কংগ্রেস-এ যে বিপুল সংবর্ধনা তিনি লাভ করেন তা এখনও আমার স্মরণ আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক কংগ্রেস-এর 1935 সালের অধিবেশনে প্রতিনিধিদের উদ্দেশে মঞ্চ থেকে স্বাগত ভাষণদান কালে এই ওপ্রকেশ, ওভস্কজ বিজ্ঞানী যে সংবর্ধনা লাভ করেন তার কাছে তা কিছুই নয়। এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল উরিটস্কি ভবনের বিশাল সেই হলঘরে, 18 বছর আগে যেখানে বসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সোভিয়েত-এর প্রথম সম্মিলন।

মেচ্নেলেয়েভ (যিনি আমাদের বিশ্বের মৌলিক উপাদানগুলিকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন), মেংসনিকভ (যিনি জীবদেহের ফাগোসাইটিক আত্মরক্ষকদের রূপ প্রকাশ করেছিলেন), টিমিরিয়াজেভ (যিনি গাছের শারীরবিদ্যা চর্চা করেছিলেন) ক্রেপোটকিন (যিনি নিম্নস্তর প্রাণীদের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন)— এই মহান রুশ চিন্তানায়কদের কাছে কিন্তু অবশ্যই ঋণী। বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজবাদের সঙ্গে এঁদেরও যোগ ছিল, কিন্তু পাভলভের ছিল বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ যোগ। স্নায়ুতন্ত্র নমনীয়, পরাবর্ত-ক্রিয়া যে বাইরের উদ্দীপক-সাপেক্ষ হতে পারে, জীব যে প্রকৃতই শিখতে পারে, এবং পরবর্তীকালে ওই শিক্ষার সুফল আপনা-আপনিই প্রকাশ করতে পারে— এসবের দ্বারাই "মানব-প্রকৃতি"র মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী মতই সমর্থিত হয়— আমরা আজ তা জানি।

অবশ্য, (সমাজে-) বিবর্তনের অব্যাহত ধারায় সমাজবাদের অনিবার্যতা সম্ভবত মার্কসবাদীদের মহত্তম আবিষ্কার। যদি তা হয়ও তবু আমাদের কালে যাঁরা সার্থক সমাজবাদ গড়ে তুলেছেন তাঁদের শক্তিকে তা খর্ব করেনি। কোনো কিছুর অনিবার্যতা জানা মানে এটা স্বীকার করা নয় যে, ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকেই তা রূপায়নের প্রতিভূ। এটা করা যায়— একথা জানার অর্থ এই নয় যে, সে-সার্থকতা শতাব্দীর পর শতাব্দীর কাজ— কেন মানুষ কে পরিবর্তন এতই দুঃসাধ্য। আর এটাই ছিল লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি : "কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই", লেনিন লিখেছেন, "উক্রেইন-এ সমাজবাদ কায়েম সম্পন্ন হবে", অথবা অন্য কোনো বিশেষ জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে টাইপিস্টদের মধ্যে গুঞ্জন, সচিবদের সভা— নিশ্চয়ই তিনি কয়েক বছর বলতে চেয়েছেন? কিন্তু না, কয়েক সপ্তাহ মাত্র। ইতিহাসের সেই-সব মহান শক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকতে তিনি তৈরি ছিলেন না। এবং আমরাও, অনেক ছোটো মাপে, একই অবস্থানে রয়েছি। আমরা প্রত্যেকে যা করছি তার দ্বারাই মানুষের মুক্তি ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত হয়ে চলেছে। পাভলভের সারা জীবনের কাজ প্রমাণ করেছে যে ত্বরান্বিত করার লেনিনীয় প্রক্রিয়ার সাফল্যের সম্ভাবনা কতখানি।

লাল গ্রানাইট ও কালো ডিওরাইটের পাশে
ল্যাব্রাডোরাইটের নীলকান্ত স্ফটিক
দুয়ারে প্রতিবিম্বিত আলোয়
মহার্ঘ-মণিকের দ্যুতিতে ঝলমলিয়ে উঠছে
তার পেছনেই রয়েছে লেনিনের হাড়ের চিরন্তন বাস্তবদীপ্তি।[1]

বর্তমান শতাব্দীকে রাশিয়ার উপহার হিসেবে পাভলভ ও লেনিন ইতিহাসের অন্তিমকাল পর্যন্ত স্মরণীয় থাকবেন। দুই বিশাল ব্যক্তি— একজন জ্ঞানের আর একজন সহযোদ্ধৃতার— পথ দেখাচ্ছেন নতুন পৃথিবীর, যার আবির্ভাব শেষ পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য।

অনুবাদ : মল্লিকা মুখোপাধ্যায়, কেন্দুকড় (কেওনঝড়)

প্রথম প্রকাশ : গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র, 'ডেলি ওয়ার্কার', 1936। পরিমার্জিত পাঠ : 'থিংস্ ইজ অন আওয়ার সাইড', লণ্ডন: জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন লিমিটেড, 1946। এই সংস্করণে একটি টীকার নীডঘ্যাম যোগ করেন: "প্রবন্ধটি যখন লেখা হয়েছিল, তখনও 'শতাব্দীর পরাবর্তগুলি বিষয়ে বক্তৃতাবলি' (ডবলিউ এইচ গান্ট সম্পাদিত; লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট, লণ্ডন)-র দু খণ্ড হাতে পাওয়ার সুবিধা আমাদের ছিল না; দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় 1941-এ।"

1. হিউ ম্যাকডায়ারমিড, "ভবিষ্যের কবিতা"।

পাভলভ ও মনের রোগ

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মনের রোগ কাকে বলে? কোনো ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, আচার ব্যবহার, কথাবার্তার অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকত্ব দেখলে আমরা সাধারণত মনে করি সে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে। এই অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কোনো আঘাত, রোগজীবাণুঘটিত আক্রমণ, অথবা টিউমার থেকে ঘটতে পারে। শারীরিক অসুস্থতার বা কোনো মাদকদ্রব্যের প্রভাবেও মানসিক রোগ-উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই লেখায় আমরা শুধু মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যিক বিশৃঙ্খলার (functional disorder) দরুন রোগ-উপসর্গের আলোচনা করব। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হলে যে সব মনের অসুখ দেখা দিতে পারে, সেই অসুখই আমাদের আলোচ্য।

এইসব অসুখের শ্রেণীবিভাগ মাঝে মাঝেই বদলাচ্ছে। এক এক দেশে আবার এক এক ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। তবে এক ব্যাপারে সকলেই মোটামুটি প্রায় একমত : সব মনের রোগকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা চলে। অভিযোজনের আংশিক অসুবিধা হলে ব্যক্তি বাস্তব ও সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে কোনো রকমে চলতে পারে। এর ফলে যে-সব রোগ উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে, তাদের বলা হয় 'নিউরোটিক' রোগলক্ষণ। এই জাতীয় মৃদু রোগের নাম 'নিউরোসিস', বাংলায় বলা হয় উন্মাদুরোগ। 'নিউরোসিস' কথাটি শিক্ষিত সমাজে বেশি পরিচিত। পরিবেশের চাপে বা অন্য কারণে যখন বড় রকমের বিশৃঙ্খলা ঘটে, তখন ব্যক্তি বাস্তবজীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের কল্পনার জগতে বাস করে। সেই কাল্পনিক জগতের বিধিবিধান, নিয়মশৃঙ্খলা অন্য মানুষের জগতের নিয়মকানুনের সঙ্গে মেলে না। তবে সেখানেও তাদের সমস্যা আছে, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আছে। সে জগতেও তাদেরও সুখ-সুবিধা, দুঃখ-অসুবিধা আছে। বাস্তব জীবনের অন্য মানুষকে তারা পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে পারে না; এবং তাদের অসুবিধা ঘটাই প্রধানত আমরা— যারা সুস্থ বলে অভিহিত। এই বড় রকমের বিশৃঙ্খলাকে বলে উন্মত্ততা, ইংরেজিতে 'সাইকোসিস'। প্রধানত সুবিধার জন্য, মনের রোগকে প্রধানত উন্মাদ ও উন্মত্ততা (neurosis and psychosis) এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করার পর আবার উপসর্গ অনুযায়ী উপবিভক্ত করা হয়েছে। নিউরোসিস চার রকমের : (1) উৎকণ্ঠিত বা আতঙ্কিত অবস্থা (anxiety state) ; (2) হিস্টিরিয়া (hysteria) ; (3) আবেশ বা আচ্ছন্ন অবস্থা (obsessional neurosis); (4) নিউরোটিক বিষণ্ণতা (reactive depression) । উন্মত্ততা প্রধানত দু'রকমের : (1) চিত্তভ্রংশ বাতুলতা বা খণ্ডিতসত্তাবস্থা (schizophrenia) এবং (2) খেয়োন্মত্ত বাতুলতা (manic-depressive psychosis)।

পাভলভ মস্তিষ্কের টাইপ-অনুযায়ী নিউরোসিসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যাদের মস্তিষ্কে প্রথম সাঙ্কেতিক স্তরের প্রাধান্য, তারা হিস্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে; দ্বিতীয় সাঙ্কেতিক স্তরের প্রাধান্য যাদের, তাদের রোগের তিনি নাম দিয়েছেন চিন্তারোগ বা সাইকাস্থেনিয়া; আর যাদের মস্তিষ্কে কোনো স্তরেরই প্রাধান্য নেই তারা ভোগে নিউরাস্থেনিয়া রোগে। আজকাল সাইকাস্থেনিয়া ও নিউরাস্থেনিয়া নাম দুটি ব্যবহৃত হয় না। সাইকাস্থেনিয়াকে আবেশ বা আচ্ছন্ন অবস্থার (obsession) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, নিউরাস্থেনিয়াকে নিউরোটিক বিষণ্ণতা হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসকের মতে আবার নিউরোসিসের শ্রেণীবিভাগ অর্থহীন ; কেননা রোগীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের রোগলক্ষণ ও উপসর্গ প্রকাশ হতে দেখা যায়। পাভলভের বিচারে খেয়োন্মত্ত বাতুলতা, কোলেরিক টাইপের মধ্যে উগ্রতার লক্ষণ এবং মেলানকলিক টাইপের মধ্যে বিষণ্ণতার লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে। চিত্তভ্রংশ বা স্কিজোফ্রেনিয়া রোগ সম্পর্কে পাভলভের বিচার ও পর্যবেক্ষণ অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তাঁর দু'একটি মন্তব্য সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ মনোরোগচিকিৎসক জানেন উন্মাদ রোগও একই রোগীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

স্কিজোফ্রেনিয়া সম্পর্কে পাভলভ

পাভলভই প্রথম প্রমাণ করেন যে স্বাভাবিক মননক্রিয়ার অধস্তরে উচ্চমস্তিষ্ক। এবং এইভাবে বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেন। তিনিই আবার অস্বাভাবিক মননক্রিয়ার শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে মনোরোগবিদ্যাকে প্রকৃত বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

প্রখ্যাত শারীরবৃত্তবিদ শেরিংটন বলেছেন, মস্তিষ্কের সঙ্গে মানসিকতার বা মননক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। সে-আমলের যে সব বিজ্ঞানী দ্বয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁরাও মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তিক জ্ঞানের অভাবে মনোরোগের নিদান ও বিকারতত্ত্বের গবেষণায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্ব ও পরীক্ষাধীন নিউরোসিস সৃষ্টি মনোরোগবিদ্যাকে বিজ্ঞানানুমোদিত পথে অগ্রগমনের পন্থার নির্দেশ দিয়েছে। ক্লিনিকে মনের অসুখের পর্যবেক্ষণ করার পর অনেক রোগ-উপসর্গের মস্তিষ্ক-ভিত্তিক সঠিক কারণ নির্দেশ করে তিনি বিষয়মুখীন গবেষণার পথ প্রশস্ত করেন।

স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অন্যান্য মনোরোগীর তুলনায় অনেক বেশি। স্কিজোফ্রেনিয়া সব থেকে জটিল ধরনের মনোরোগ: স্কিজোফ্রেনিয়া আবার অনেক উপশ্রেণীতে বিভিক্ত। সব দেশে গবেষকদের দৃষ্টি এই দুরারোগ্য ব্যাধিটির প্রতি বিশেষভাবে নিবদ্ধ। বর্তমানে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের মস্তিষ্কের জৈবরসায়নিক তথ্য কিছু কিছু জানা গেছে এবং তার উপর ভিত্তি করে রোগ নিরাময়ের ওষুধও তৈরি হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পাভলভের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা পরবর্তীকালের এই সব গবেষণার সাফল্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী।

স্কিজোফ্রেনিয়ায় উচ্চমস্তিষ্কের কোষে ক্রমবর্ধমান নিস্তেজনার ফলে সম্মোহন পর্ব ও আনুষঙ্গিক প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ক্ষতিকর বস্তুর প্রভাবে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগে বিশৃঙ্খলা ঘটতে থাকে, দুটি সাঙ্কেতিক স্তরের মধ্যেও বিযুক্তি ঘটে। এছাড়া, পেশী সম্পর্কিত কিছু চেষ্টীয় কোষ শারীরবৃত্তিক দিক থেকে অনড় হয়ে যায়। পাভলভ প্রথমে স্কিজোফ্রেনিয়ার এক বিশেষ অক্রিয় অবস্থা (catatonia, - এই অবস্থায় রোগী পুরোপুরি অক্রিয়, অচেতন, অনড় অবস্থার মধ্যে থাকে) সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। বলেন, এই অবস্থা ঘটেছে রোগীর গুরুমস্তিষ্কের চেষ্টীয় অংশের (motor area of the cerebral cortex) বিচ্ছিন্নতা ও আংশিক নিস্তেজনার ফলে। সম্মোহনের এক বিশেষ পর্বের সঙ্গে এই অবস্থা তুলনীয়। পাভলভ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, স্কিজোফ্রেনিয়ার বিশেষ বিশেষ অবস্থা আসলে দীর্ঘস্থায়ী সম্মোহিত অবস্থারই অনুরূপ; স্কিজোফ্রেনিয়া দুর্বল মস্তিষ্কের রোগ। এই দুর্বলতার মূলে বহির্বস্তুবের উপাদানের সঙ্গে জন্মগত কারণও থাকতে পারে। এদের স্নায়ুতন্ত্রের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতার স্বল্পতাই রোগলক্ষণের জন্য দায়ী। পাভলভের মতে স্কিজোফ্রেনিয়ার উপসর্গগুলি প্রধানত প্রতিরক্ষামূলক। কোন্ ধরনের ক্ষতিকর প্রভাবে স্কিজোফ্রেনিয়াগ্রস্তের মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়ামূলক উপসর্গ সৃষ্টি হয়? তিনি প্রথমে বলেছিলেন — এক ধরনের অধিবিষ বা টক্সিনই বোধ হয় এই ক্ষতিকর উপাদান; আরও মনে করতেন, স্কিজোফ্রেনিয়ায় একই সঙ্গে বিকারভিত্তিক (pathological) ও শারীরবৃত্তিক উপসর্গের (প্রতিরক্ষা প্রয়াসের) অভিব্যক্তি দেখা যায়। পাভলভের পরবর্তী বক্তব্যের মধ্যেও এই দুই ধরনের (বিকার ভিত্তিক ও শারীরবৃত্তিক) ক্রিয়ার সমকালীন উপস্থিতির উল্লেখ আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সমর্থিত।

পাভলভের মতে স্কিজোফ্রেনিয়া অন্যান্য মনোরোগের মতই মস্তিষ্কের ক্রিয়া-কাণ্ডের বিশৃঙ্খলার ফল, কার্মিক (functional) ব্যাধি। এ রোগ-প্রক্রিয়া অপরিবর্তনীয় নয়; অর্থাৎ স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা কোনো সময়েই সুদূরপরাহত নয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক নিস্তেজনা কমার ফলে, কিছু কিছু রোগী আপনা থেকেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। সোভিয়েত চিকিৎসকরা স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে খুব পুরনো স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের গতিও পরিবর্তিত হতে পারে।

পাভলভ তাঁর অভিমতে ক্ষয় ও সমন্বয়ের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। আরো বলেছেন, মনের রোগ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে। 'ফাংশনাল' ও 'অরগ্যানিকের' মধ্যে কোনো অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান তিনি দেখেননি। সব শেষে পাভলভের বক্তব্য: মনের রোগের মধ্যে দেব বা দানবের খেলা নেই, রহস্যময়তা, অলৌকিকতা নেই, মনের তথাকথিত গভীরে রোগের মূল অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই; মনের রোগ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগসঞ্জাত।

পাভলভীয় চিকিৎসা পদ্ধতি

এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর মুক্তি, বুদ্ধি, চেতনা বাড়িয়ে তার মানসিক বিশৃঙ্খলা দূর করার চেষ্টা করা হয়। সম্মোহন ও অভিভাবনের সাহায্য অনেক সময় প্রয়োজন হতে পারে। কথা-বিশেষ করে অভিভাবনমূলক কথাকেই-পাভলভীয় চিকিৎসার

বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। তবে অন্যান্য স্কুলের সম্মোহন-অন্তর্ভাবন চিকিৎসকের ও পাভলভীয় চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সে-পার্থক্য এই দুই দলের চিকিৎসকের জীবনদর্শনের পার্থক্য, দ্বৈতবাদী ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের পার্থক্য। তবে কেউ যেন মনে না করেন যে পাভলভ প্রবর্তিত চিকিৎসাতে সব সময় সুফল পাওয়া যাবে।

পাভলভের পরীক্ষামূলক নিউরোসিস

পাভলভের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষামূলকভাবে নিউরোসিস সৃষ্টি নিঃসন্দেহে মনোরোগের গবেষণায় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে পাভলভের পরাবর্তমূলক গবেষণা ও নিউরোসিস সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানসম্মত মনোরোগবিদ্যার অনুশীলন ও চর্চা শুরু হয়েছিল। ফরাসীদেশে অষ্টাদশ শতকে যুক্তিবাদী ভাবধারার প্রভাবে ফিলিপ পিনেল ও এস্‌কুইরোলের মত প্রখ্যাত চিকিৎসক মনোরোগবিদ্যাকে বস্তুবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন এবং অনেকখানি সাফল্য লাভ করেন। জার্মানিতে উইলহেলম গ্রাইসেঙ্গার স্পষ্টই বলেছিলেন যে, মনোরোগ মানে মস্তিষ্কের রোগ এবং মননক্রিয়া মাত্রেই পরাবর্তক্রিয়া। সুবিখ্যাত বৃটিশ চিকিৎসক হেনরী মণ্ডস্‌লে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সব রকমের মানসিকতার বস্তুবাদসম্মত ব্যাখ্যা দেবার এবং ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ-ভিত্তিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার সনদে স্বাক্ষরকারী বেঞ্জামিন রাশ তাঁর দেশে মনোরোগবিদ্যা ও চিকিৎসার প্রবর্তন করেন। বস্তুবাদী মতামতের জন্য তাঁকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। এই বস্তুবাদী ধারা উনিশ শতকের শেষের দিকে সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে মিলিত হয় এবং মনোরোগের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। জার্মান চিকিৎসক এমিল ক্রেইপলিন এবং রুশ চিকিৎসক সার্গাই কোরসাকভ সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যার নিদানতত্ত্ব ও উপসর্গ বিচার বিধি অনুযায়ী মনের রোগের শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করেন। বিভিন্ন মনের রোগের বিশেষ বিশেষ উপসর্গগুলি এবং রোগীর মানসিক বৈশিষ্ট্য ও অস্বাভাবিকতার সঙ্গে চিকিৎসকরা এই সময় থেকেই পরিচিত। প্রকোষ্ঠভিত্তিক ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষার পাশাপাশি তিরিশের দশক থেকে ইনসুলিন চিকিৎসা, দীর্ঘস্থায়ী ঘুমের চিকিৎসা ও মস্তিষ্কে তড়িৎ প্রয়োগ চিকিৎসা সর্বদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। মাথা ঠাণ্ডা করার (ট্রাংকিউলাইজার) ও বিষণ্ণতা দূর করার (অ্যান্টিডিপ্রেসাণ্ট) ওষুধের সফলতা সপ্রমাণ হবার পর, মনের রোগ তথা মানসিকতার ভিত্তিভূমি যে মস্তিষ্ক এই ধারণা অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই ওষুধগুলি মস্তিষ্ক কোষকে নিস্তেজিত অথবা উত্তেজিত করে মনকে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দিয়ে এই সব ওষুধের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা চলে না। বর্তমানে সবদেশে মনোরোগবিদ্যার শিক্ষক ও ছাত্রদের একাংশ পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোবিদ্যার অধ্যয়ন ও অনুশীলনে আগ্রহী। মনোরোগবিদ্যার সঙ্কট সমাধান বস্তুবাদীদের প্রতিফলনতত্ত্ব ও পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তের চর্চা ছাড়া যে হতে পারে না— এই অভিমত পশ্চিমী অনেক চিকিৎসকই এখন পোষণ করেন। 1960 সালের অক্টোবরে নিউইয়র্ক বিজ্ঞান পর্ষৎ কর্তৃক এক পাভলভীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবার পর এদিকে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

1922 থেকে 1925 সালের মধ্যে পাভলভের পরিচালনাধীন প্রথম পরীক্ষামূলক নিউরোসিস নিয়ে গবেষণা করা হয়। পেত্রভার পরীক্ষাধীনে ছিল দুটি বিপরীত টাইপের কুকুর। একটির মস্তিষ্ক অতি উত্তেজনাপ্রবণ, অন্যটির মস্তিষ্কে ছিল অতি নিস্তেজনাপ্রবণতা। দুটিকেই ছয়টি শর্তাধীন পরাবর্ত শেখানো হলো। তারপর এদের আরো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হলো। বেশ জোরালো বিদ্যুৎ তরঙ্গের শক্ খাদ্য-পরাবর্তের উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহার করলেন পেত্রভা। সাধারণত এই ধরনের উদ্দীপকে শর্তহীন প্রতিরক্ষা-পরাবর্ত দেখা দিয়ে থাকে। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে প্রাণীমাত্রেই এই ধরনের বেদনাদায়ক উদ্দীপক এড়িয়ে চলে। কিন্তু শিক্ষা দেবার ফলে কুকুর দুটি এই উদ্দীপকে প্রথমদিকে ঠিকমত সাড়া দিল; তাদের খাদ্য-পরাবর্ত গড়ে উঠল। পরীক্ষক বারবার ওদের এই কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে লাগলেন; বৈদ্যুতিক শকের মাত্রাও বাড়িয়ে দিলেন। কুকুর দুটির স্নায়ুমণ্ডলী এই চাপ সহ্য করতে পারল না : তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। আগেকার তৈরি পরাবর্তগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। অতি উত্তেজনাপ্রবণ কুকুরটির নিস্তেজনা ক্ষমতা আরো কমে গেল, অতিমাত্রায় চীৎকার ও লাফঝাঁপ আরম্ভ করে দিল; অতি-নিস্তেজনা-প্রবণ কুকুরটির ইতিবাচক পরাবর্ত ভেঙে পড়ল, সে দিনরাত ঝিমুতে লাগল। এইভাবে ল্যাবরেটরিতে প্রথম নিউরোসিস সৃষ্টি করলেন পেত্রভা। এই অবস্থা বেশ কয়েকমাস স্থায়ী হল। নিস্তেজনাধর্মী কুকুরটি কয়েকমাস বিশ্রামেই সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু উত্তেজনাধর্মীটির বেলায় শুধু বিশ্রামে কাজ হল না। ব্রোমাইড জাতীয় ওষুধের প্রয়োজন হয়েছিল তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে।

তাদের অসুস্থতার কারণ কি? উপসর্গের এই বৈপরীত্যই বা কেন?

উত্তেজনা ও নিস্তেজনাক্রিয়ার তীব্র সংঘাত থেকে অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে— পাভলভের এই অভিমত। বেদনাদায়ক উদ্দীপকের দরুণ সহজাত আত্মরক্ষার পরাবর্ত নিবৃত্ত করতে হচ্ছে। আবার সেই উদ্দীপককে ভিত্তি করে শর্তাধীন খাদ্য-পরাবর্ত গড়ে তুলতে হচ্ছে। এই দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার পরস্পর বিরোধিতার ফলে মস্তিষ্ককোষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আর অন্যটির বেলায় উত্তেজনা-ক্ষমতা আরো কমে যাওয়ায় কুকুরটি দুর্বল, নিস্তেজ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

প্রখ্যাত একজন গবেষক রিকম্যানের পরীক্ষাধীন কুকুরটিও ছিল অতি-নিস্তেজনা-ধর্মী। রিকম্যান কুকুরটির উপর অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি অস্বাভাবিক জোরালো উদ্দীপকের প্রভাব পরীক্ষা করতে চাইলেন। দর্শন ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে বিশেষভাবে উত্তেজিত করল এইসব উদ্দীপক। প্রতিক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। কুকুরটা প্রথমটায় বিচলিত ও অস্থির হয়ে উঠল। তারপর স্থির ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের পা দুটো প্রসারিত, মাথা পেছন দিকে হেলানো, চোখ দুটি ঠেলে বেরিয়ে আসছে; অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করল কুকুরটি। সব পরাবর্ত ভেঙ্গে পড়ল। দু-সপ্তাহ ধরে এই অবস্থা রইল; কিন্তু এরপরও ঐসব অস্বাভাবিক উদ্দীপকের যে কোনো একটা প্রয়োগ করলেই কুকুরটি অসুস্থ হয়ে পড়ত।

এবার উত্তেজনা-নিস্তেজনার সংঘাত নয়; নিউরোসিস সৃষ্টি হয়েছে মাত্রাধিক উত্তেজনার দরুন। নিস্তেজনা-প্রক্রিয়া উচ্চ-মস্তিষ্ক থেকে মধ্যমস্তিষ্ক পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাত্রাধিক উত্তেজনা প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা ঘটিয়েছে। ল্যাবরেটরিতে রিকম্যান 'নার্ভাস ব্রেকডাউন' সৃষ্টি করেছেন। ।৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেনিনগ্রাডে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার সময় এই কুকুরটি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। এবার আরো স্থায়ী হয়েছিল 'নার্ভাস ব্রেকডাউন'। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাত্রাধিক উত্তেজনার দরুন নিউরোসিস ঘটাতে পারে।

প্রথম শিকলার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে মনে হয়েছিল যে সুষম টাইপ বুঝি নিউরোসিসে আক্রান্ত হয় না। আরো মনে হয়েছিল যে, উপসর্গগুলোর সব সময়েই বুঝি নার্ভতন্ত্রের টাইপ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য থাকে। পরবর্তী গবেষণার ফলে এই ধারণার পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে। আরো অনেক নতুন তথ্য সংগৃহীত হবার ফলে পাভলভের তত্ত্ব আরো বেশী সমৃদ্ধ হয়।

মস্তিষ্কের টাইপ সব সময়ে অসুস্থতা-সুস্থতার নির্দেশক নয়। যে কোনো সবল সুষম টাইপেরও নিউরোসিস হতে পারে বা 'নার্ভাস ব্রেকডাউন' ঘটতে পারে : নির্ভর করছে পরিবেশের জটিলতা ও চাপের উপর। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও যোগাযোগ থেকে মানসিক রোগ দেখা দেয়। ঘটনার বিশেষ ধরন এবং প্রাণীর পূর্ব-অভিজ্ঞতাজাত মানসিকতাও মানসিক বিপর্যয়কে প্রভাবিত করে। পর পর অনেক আঘাত বা কঠিন কাজের সম্মুখীন হলে সবল সুষম প্রাণীও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

পেত্রোভা ও রিকম্যানের পর ল্যাবরেটরিতে আর এক ধরনের কারণ নির্ণয় করা হল। দেখা গেল, উদ্দীপকের পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার হেরফের করেও কুকুরকে বিভ্রান্ত ও অসুস্থ করা যায়; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দীপক-ভিত্তিক শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তোলবার পর যদি উদ্দীপকের সময় এদিক-ওদিক করা হয়, তা হলে অনেক সময় কুকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছে দেখা যায়। বাঁধাধরা অভ্যাসের ব্যতিক্রম এখানে অসুস্থতার কারণ। মানুষের বেলাতেও এই ধরনের অসুস্থতা দেখা দিয়ে থাকে। পরিবর্তন ঘটলে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর কিছু ক্ষেত্রে নিউরোসিস দেখা যায়। পেত্রোভার পরীক্ষাধীন কুকুরদের নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার উপর অতিরিক্ত চাপ পড়েছিল, রিকম্যানের পরীক্ষায় উত্তেজনা-প্রক্রিয়ার মাত্রাধিক পীড়ন ঘটেছিল, আর এই ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের গতিময়তার উপর বেশি চাপ পড়েছে। উত্তেজনা, নিস্তেজনা আর গতিময়তা-এই তিন প্রক্রিয়ার উপর অতিরিক্ত পীড়নের ফলে এই প্রথম নিউরোসিসের মডেল তৈরি হলো। ক্লিনিকে কারণ বিশ্লেষণ করে পাভলভ নিজের যুক্তির সমর্থন পেলেন। আকস্মিক মানসিক আঘাত বা বিপর্যয়, বিপরীতধর্মী কার্যকলাপ বা চিন্তা ভাবনার সংঘর্ষ এবং অভ্যস্ত জীবনযাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন— এই তিন কারণেই মানুষের নিউরোসিস হয়ে থাকে। পরীক্ষামূলক নিউরোসিস থেকে পাওয়া আরও একটি তথ্য মনের রোগের হাসপাতালে সমর্থিত হলো। রোগ-উপসর্গের প্যাটার্ণ সম্পর্কিত ধারণাও বদলে গেল। জানা গেল যে মস্তিষ্কের টাইপ আর রোগের টাইপের পূর্ববর্ণিত সম্পর্ক সবসময় সব অবস্থায় সঠিক নয়।

নিউরোসিস ও সম্মোহন

পরীক্ষামূলক নিউরোসিসের উপসর্গ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাভলভ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে মস্তিষ্কের যে জটিল ক্রিয়া প্রক্রিয়া ও অস্বাভাবিক ব্যবহারের হদিশ পাওয়া গেল। সম্মোহনের বিভিন্ন পর্ব-সংশ্লিষ্ট এই আবিষ্কার পাভলভীয় মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। মানসিক ধর্ম ও মনোরোগীর অনেক তথাকথিত দুর্বোধ্য আচরণ ও সংলাপ যে মস্তিষ্কের নিদ্রা-জাগরণের পরিবৃত্তি-কালীন অবস্থার ও পরিবেশের প্রভাব সঞ্জাত — পরীক্ষাগারে সঞ্জাত তথ্যের সাহায্যে সেই ধারণা প্রমাণিত হল।

পরীক্ষাধীন কুকুর মৃদু একঘেয়ে উদ্দীপকের প্রভাবে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ত। বলা চলে, তারা সম্মোহিত হয়েছে। এই জাগ্রত থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় উপনীত হবার মধ্যে তিনটি পর্ব বা দশার সন্ধান পেলেন পাভলভ। সম্মোহনের এই তিন পর্ব নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার বিস্তার সাপেক্ষ। এই তিন পর্বে মস্তিষ্কের ধর্ম তিন রকমের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়ে থাকে। প্রথম পর্বের নাম সমতাপর্ব বা phase of equalisation; এই পর্বে জোরালো এবং ক্ষীণ উদ্দীপক একই মাত্রার সাড়া জাগায়। জাগ্রত অবস্থায় উদ্দীপক-শক্তির তারতম্যের সঙ্গে সাড়ার মাত্রা বেশি কম হয়। দশ মাত্রার উদ্দীপকে শক্তির তারতম্যের সঙ্গে সাড়া দেবার মাত্রা বেশি কম হয় যেমন দশ মাত্রার উদ্দীপকে যদি দশ কৌটা লালা ঝরে, তবে কুড়ি মাত্রার কুড়ি কৌটা, তিরিশ মাত্রায় তিরিশ কৌটা ইত্যাদি। সমতা পর্বে এই স্বাভাবিক ব্যবহার বা প্রতিক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। নিস্তেজনা এই পর্বে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় পর্বের নাম আপাত স্ববিরোধী বা paradoxical পর্ব। এই পর্বে জোরালো উদ্দীপকে নামমাত্র সাড়া জাগে অথবা একেবারেই জাগে না; অথচ ক্ষীণ উদ্দীপকে সাড়া জাগায়, বেশ জোরালো সাড়া জাগায়। নিস্তেজনার আরো বিস্তার ঘটেছে। তিরিশ মাত্রার উদ্দীপকে লালা ঝরছে না, কুড়িমাত্রার উদ্দীপকে হয়ত বা পাঁচ কৌটা পড়ল, কিন্তু দশমাত্রার উদ্দীপকে লালার মাত্রা অনেক বেড়ে গেল। সম্মোহিত অবস্থায় সংবেদকের মৃদু নির্দেশ জোরালো উদ্দীপকের কাজ করে, আমরা জানি। পাভলভের মতে সম্মোহিত অবস্থা পরীক্ষাধীন paradoxical phase-এর সঙ্গে তুলনীয়। সম্মোহন, পাভলভ মনে করেন, মস্তিষ্কের আংশিক নিস্তেজনার ফল; আর ঘুমে নিস্তেজনাপ্রবাহ প্রায় গোটা মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে।

তৃতীয় পর্বকে বলা হয় অতি স্ব-বিরোধী বা ultra paradoxical পর্ব। এই সময় নেতিধর্মী উদ্দীপক ইতিবাচক হয়ে ওঠে, ইতিধর্মী হয়ে ওঠে নেতিবাচক।

সুস্থ মস্তিষ্কে এই পর্ব তিনটি ক্ষণস্থায়ী এবং তৃতীয় পর্বের পরই প্রাণী ঘুমিয়ে পড়ে। অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু যে কোনো একটি পর্ব কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

সম্মোহন-পর্বের আবিষ্কারের ফলে বোঝা গেল যে নিউরোসিসের উপসর্গ হয় উত্তেজনাভিত্তিক না হয় নিস্তেজনাভিত্তিক হবে (পেত্রভের প্রথম পরীক্ষা)-এ ধারণা ঠিক নয়। উত্তেজনাভিত্তিক উপসর্গের সঙ্গে যে কোনো সম্মোহন পর্বের উপসর্গও দেখা দিতে পারে; আবার নিস্তেজনাধর্মী প্রাণীর উপসর্গেও উত্তেজনার প্রকাশ থাকতে পারে। মানুষের হিস্টিরিয়া প্রথম সাংকেতিক-তন্ত্রের প্রাধান্য সূচিত করে এবং তা প্রধানত দুর্বল মস্তিষ্কের রোগ। কিন্তু সব হিস্টিরিয়া রোগী যে দুর্বল হবে এবং তাদের মস্তিষ্কে প্রথম সাংকেতিক-তন্ত্রের প্রাধান্য থাকবে এমন কোনো কথা নেই।

শক্তি, ভারসাম্য ও গতিময়তা— মস্তিষ্কের এই তিনটি প্রধান ধর্মের যে কোনো একটির অতিমাত্রায় পীড়নের ফলে সকল দুর্বল সব রকমের প্রাণীরই নিউরোসিস দেখা দিতে পারে। ল্যাবরেটরির প্রথম দিকের পরীক্ষামূলক নিউরোসিস থেকে এইটুকু

"There is a special group of chronic disturbances of the higher nervous activity which develop so to say, leisurely, are not connected with any obviously difficult task and consequently do not have the character of an acute nervous breakdown.

"In some cases, usually after long and uninterrupted laboratory work with one and the same conditioned stimulus (for 2 to 4 years and more) all conditioned reflexes began to fade away and vanish..." (I. Smolensky, *Pathophysiology of the Nervous system*)

জানা গেল। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, মনোবিকার অতি পীড়নের অব্যবহিত পরেই ঘটবে— এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। দু'চার দিন পরেও অসুখ দেখা দিতে পারে। (I. Smolensky, *Pathophysiology of the Higher Nervous Activity*. P-15. Moscow 1954) এরপরও অবশ্য আরও অনেক জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা চালান পাভলভ। মস্তিষ্কের অংশ বিশেষের গুরুতর অবস্থা বুঝতে নতুন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। অবসেসন বা আচ্ছন্ন অবস্থার আলোচনার সময় সেইসব পরীক্ষার ফলাফল উত্থাপন করা হবে। পাভলভের নির্দেশিত পথে যে কোনো মানসিক অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এখন ল্যাবরেটরিতে প্রাণীর উপর পরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য এবং জ্ঞান কিভাবে ক্লিনিকে প্রযুক্ত হল, আমাদের জানা দরকার। উচ্চমস্তিষ্কের কার্মিক ব্যাধি অন্য ভাবে, খুব ধীরে ধীরে দেখা দিতে পারে।

এখানে পরীক্ষামূলক নিউরোসিস সৃষ্টির পূর্ববর্ণিত তিনটি কারণের একটিও বর্তমান নেই, তথাপি উচ্চমস্তিষ্কের কাজকর্মের বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে—অনেকটা ল্যাবরেটরিতে সৃষ্টি নিউরোসিসের মত। আগেকার দেখা শর্তাধীন পরাবর্ত ভেঙ্গে পড়েছে, প্রায়কোরা নতুন পরাবর্ত সৃষ্টির খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে অন্তর্জাত নিস্তেজনার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ উত্তেজনা আপনা থেকে কমছে না।

ক্লিনিকে রোগী সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকেও এই ল্যাবরেটরিতে পরিলক্ষিত, আপাত দৃষ্টিতে কারণবিহীন, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা নিউরোসিসের সমর্থন মেলে। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে কারাবাসের একঘেয়েমিতে এই ধরনের অসুস্থতা দেখা দিয়ে থাকে। বেশ কিছু কাল বিশ্রাম এবং নানা রকমের আনন্দদায়ী মৃদু উদ্দীপনার ফলে এই অসুখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেরে যায়।

পরীক্ষামূলক নিউরোসিস থেকে মনোরোগের প্রাথমিক সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হল, কিন্তু শেষ অভিমত প্রকাশের মত জ্ঞান অর্জন করা হল না। কুকুরের উপর পরীক্ষিত তথ্য যান্ত্রিকভাবে মানুষের উপর প্রয়োগ করা চলে না। কুকুরের স্নায়ুতন্ত্র ও মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যমূলক পার্থক্যের কথা পাভলভ সব সময় মনে রেখেছেন। কথা বলার ক্ষমতা মানুষকে প্রাণীজগৎ থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক শক্তির অধিকারী করেছে। বাকতন্ত্র বা এই দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের কথা বিচার না করে মানুষের রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসা সম্ভব নয়। এই দ্বিতীয় তন্ত্র বিবর্তনের শেষ ধাপে গঠিত হয়েছে এবং এই তন্ত্র জাগ্রত মানুষের চিন্তা-ভাবনা আচার-ব্যবহারের প্রধান নিয়ন্ত্রক। এখানে ফ্রয়েডের সঙ্গে পাভলভের মতভেদ লক্ষণীয়। সহজাত প্রবৃত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু মানসিকতার নিয়ামক নয় —এই হচ্ছে পাভলভের বক্তব্য। ফ্রয়েড গুরুত্ব দিয়েছেন নির্জ্ঞান-এর উপর, পাভলভ দিয়েছেন চৈতন্যের উপর। মনোরোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্য জীবনের শেষ কয়েক বছর পাভলভ মানসিক রোগের ক্লিনিকে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেন। নিউরোটিক ব্যবহারের মূলে নার্ভতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও অনেক কিছু বিচার্য বলে তিনি বিবেচনা করলেন। রোগীর সমাজজীবন, পারিবারিক জীবন, কর্মস্থান, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি জীবনের সব কিছু না জানলে কারণ নির্ণয় বা চিকিৎসা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি বা তাঁর ছাত্ররা কখনও নির্জ্ঞান প্রেরণ বা অবদমিত ইচ্ছা নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁরা মনে করেন নিউরোটিক ব্যবহারের জন্য স্নায়ুতন্ত্রের বৈকল্য বা বিশৃঙ্খলা দায়ী। তাঁদের প্রধান বিচার্য কিভাবে এবং কেন এই স্নায়ুতন্ত্রের প্রক্রিয়াগত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মানসিক আঘাত, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং জীবনের বিশেষ পরিবর্তনের ইতিহাস থেকে তিনি এর উত্তর পাবার চেষ্টা করেন। আপাতদৃষ্টিতে অন্য স্কুলের চিকিৎসকদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁদের কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আঘাত ও দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা ও তা থেকে সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে পাভলভ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারেন।

কুকুরের উপর পরীক্ষালব্ধ তথ্য প্রাথমিক জ্ঞানের সূচনা মাত্র। ক্লিনিকে সেই জ্ঞান প্রয়োগের ফলে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল, জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত হল। পরীক্ষামূলক নিউরোসিস পাভলভ-তত্ত্বের প্রধান অবলম্বন এবং মনোরোগের সহজ সাধারণ মডেল। মস্তিষ্কাশ্রিত মনোবিজ্ঞান পাভলভের এই গবেষণার ফলে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

এক কথায় বলতে গেলে, নিউরোসিস চলমান ভারসাম্যের বিপর্যয়। জীবন-পথে চলতে গিয়ে মানুষকে অনেক আঘাত, অনেক দ্বন্দ্ব, বিরোধ, সমস্যা, অনেক পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়। আঘাত সহ্য করে, দ্বন্দ্ব-বিরোধের সঙ্গে লড়াই করে,

সমস্যা সমাধান করে, বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানুষ মানিয়ে নেয়। এইভাবে চলমান ভারসাম্য বজায় থাকে। যখন বহির্বাস্তবের চাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন ঘটে নার্ভ-প্রক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা।

অনুরূপ পদ্ধতিতে কিভাবে ফ্রয়েডিয়ানরা সাইকো-এ্যানালিসিস করে থাকেন, তা অনেকেরই জানা থাকার সম্ভাবনা। কেননা অনেকদিন ধরেই এ-বিষয়ে পুঁথি পুস্তক, পত্র-পত্রিকা বাজারে পাওয়া যায়। পাভলভের রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণের ধারা তত পরিচিত নয়। তাই এ সম্বন্ধে আরো দু-একটা কথা বলা উচিত মনে করছি। পাভলভ ও ফ্রয়েডের তত্ত্বগত পার্থক্যও এর ফলে পাঠকের কাছে অনেকটা সহজবোধ্য হবে।

নিস্তেজনা ও মনোরোগ

কুড়ি বছর ধরে হাসপাতালের বিছানায় নিশ্চল নির্বাক হয়ে শয্যাগত থাকার পর একজন রোগী অল্প নড়াচড়া কথা বলা আরম্ভ করলেন যখন, তখন তাঁর বয়স ষাট। এতদিন তাঁকে টিউব দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে। এই খাদ্য হজম করা ছাড়া আর কোনো সক্রিয় জীবনের লক্ষণ তাঁর মধ্যে ছিল না। অবশ্য অগভীর শ্বাসপ্রশ্বাস ও দুর্বল নাড়ির স্পন্দন থেকেও বোঝা যেত যে তিনি জীবিত আছেন। তবে তাঁকে দেখে চট করে বোঝা যেত না যে তিনি জীবিত না মৃত। এই জীবন্মৃত অবস্থা ক্রমশঃ কেটে যেতে লাগল; নিজের চেষ্টায় বসতে পারলেন, কথাও বলতে লাগলেন। নিজের অবস্থা প্রসঙ্গে বললেন যে তিনি সবকিছু শুনতে পেতেন, বুঝতে পারতেন, কিন্তু কথা বলার বা নড়াচড়া করার শক্তি ছিল না। হাত -পা- জিভ সবই পাথরের মত ভারী মনে হত। কথা ত দূরের কথা, নিঃশ্বাস নেওয়াই ছিল এক প্রাণান্তকর কঠিন ব্যাপার।

পাভলভের আগে বহু চিকিৎসকই এই রোগীকে দেখেছিলেন এবং এ-নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছিলেন। এই অসাড় নিশ্চল অবস্থা, অনেকে মনে করেছিলেন— তীব্র প্রকোপের ফল। এঁরা কেউই মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামালেন না। শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা দিতে প্রথম এগিয়ে এলেন পাভলভ। এই অনড় অচল অবস্থার জন্য উচ্চমস্তিষ্কের কি ধরনের বিকলতা দায়ী সেই বিচারে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। পাভলভের রোগনির্ণয় পদ্ধতি ও বিশ্লেষণের রীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সব সময়েই রোগীর নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের বৈকল্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন। কেন অসুস্থতা? সমাজ ও পরিবেশের কোন আঘাত কোন দ্বন্দ্ব অসুস্থতার কারণ? নিঃসন্দেহে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পাভলভ এ প্রশ্নের জবাব ত খুঁজতেনই , উপরন্তু নার্ভতন্ত্রের বিকার বৈকল্য সঠিকভাবে অনুধাবন করে রোগী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন। বিষয়ীগত (subjective) খুঁটিনাটির দিকে নজর না দিয়ে বিকারতত্ত্বের দিকে বেশি মনোনিবেশ করতেন। উপসর্গ সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ করতেন স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা-নিস্তেজনা গতিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে। ফ্রয়েড রোগ উপসর্গের কারণ বিশ্লেষণ করতেন নির্জ্ঞানরাজ্যে, পাভলভ অনুসন্ধান করতেন কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে; বিশেষ করে গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে, সজ্ঞান রাজ্যে। কেননা, পাভলভের মতে মনের বিকার গুরুমস্তিষ্ক ক্রিয়ার বিকার ছাড়া ঘটে না।

পাভলভের কাছে এই রোগীর উপসর্গগুলির বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রতিভাত হল? উচ্চমস্তিষ্কের কোন্ ধরনের বিশৃঙ্খলা এই অনড় অশক্ত অবস্থার জন্য দায়ী? প্রধানত তার পেশিগুলোর উপর সে কর্তৃত্ব হারিয়েছে, ইচ্ছামত দেহের কোনো অংশই নাড়াতে পারছে না, দেখা শোনা বোঝার ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং উচ্চমস্তিষ্কের শুধু একটি বিশেষ অংশ, যা অঙ্গ সঞ্চালনের জন্য দায়ী, যাকে বলা হয় চেষ্টীয় অংশ— এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে, এর বেলায় যা ঘটেছে তাকে বলা চলে— শুধুমাত্র চেষ্টীয় অংশের ব্যাপক নিস্তেজনা।

এ ধরনের বিশেষ নিস্তেজনা ল্যাবরেটরিতে কুকুরের মস্তিষ্কে পাভলভ দেখেছেন, মানুষের ও অবস্থার কথাও তিনি জানেন। এ অবস্থা এক ধরনের সম্মোহিত অবস্থা। সম্মোহনের নানা পর্ব নিয়ে পাভলভের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা আমরা জানি; সম্মোহনের এক পর্বে মানুষের ঠিক এই অবস্থা হয়। সবই সে বুঝতে পারে, শুনতে পারে; কিন্তু পেশিগুলো স্বেচ্ছাচালিত অবস্থায় থাকে না। ঘুম ভাঙার পর কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকার অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়ত আছে। শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে রোগী আংশিক ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন বা সম্মোহিত।

•• এখন প্রশ্ন আসবে মস্তিষ্কের অংশবিশেষের এই নিস্তেজনার কারণ কি? কি ভাবে এবং কেন কি-এই নিস্তেজনা ঘটেছে?

উত্তরে পাভলভ প্রধানত দুটি কারণের নির্দেশ দিলেন। হয়ত মস্তিষ্কের চেষ্টায় পদার্থ নিঃশেষিত হয়ে গেছে কোনো বিশেষ কষ্টসাধ্য কাজের ফলে; কিম্বা অন্য কোনো স্নায়ুর ক্ষয়ক্ষতির দরুণ সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মস্তিষ্ক; ফলে ঘটেছে চেষ্টায় অংশের এই নিস্তেজনা। ষাট বছর বয়সে আপনা থেকে রোগী আরোগ্য লাভ করছে— এ থেকে পাভলভ মনে করলেন তাঁর বক্তব্য সঠিক ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। বার্ধক্যে নিস্তেজনা স্বভাবত হ্রাস পায়। অনেকে ষাট-পঁয়ষট্টির কোঠা পেরিয়ে প্রগলভ, চপলমতি হয়ে দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলে থাকেন। চলতি কথায় এই অবস্থাকে বলে 'বাহাত্তুরে পাওয়া'। শারীরবৃত্তিক পরিভাষায় বার্ধক্যে নিস্তেজনা কমতে থাকে ; ফলে কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে অসংযমী হয়ে ওঠেন অনেক বৃদ্ধ।

এবার যে পরীক্ষাটির কথা বলতে যাচ্ছি, আবেশ বা অবসেসনকে (obsession) বুঝতে সেটি আমাদের অনেকখানি সাহায্য করবে। এটিরও সূত্রপাত করেন পেত্রভা। সিঁড়ির উঁচু ধাপে পরীক্ষাধীন কুকুরটিকে খাবার দেওয়া হচ্ছিল; একবার এই অবস্থায় উঁচু থেকে কুকুরটি মেঝের উপর পড়ে গেল। এরপর কয়েক বার এই পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়। ফলে কুকুরটির মধ্যে নিউরোসিসের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পেল, সঙ্গে সঙ্গে উঁচু জায়গার ভয়ও দেখা দিল। খেতে অনিচ্ছা, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অক্ষমতা, সব সময় ঘরের দেওয়াল ঘেঁসে চলা— ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পেল : 'অবসেসনের' একটি মডেল তৈরি হল। উঁচু জায়গায় ভয়— এই উপসর্গগুলোর মধ্যে প্রধানতম উপসর্গ হিসাবে দেখা দিল।

অন্যান্য পরীক্ষাগুলো থেকে পেত্রভার এই পরীক্ষাটির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কোথায়? অন্যান্য পরীক্ষাগুলোতে গোটা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের বিকার ও ত্রুটি ঘটেছে, এখানে বিশেষভাবে একটি বা কয়েকটি কোষসমষ্টিতে অসুস্থতা প্রকাশ পেয়েছে। পাভলভের ভাষায়— 'অ্যান এনটায়ারলি আইসোলেটেড এরিয়া অফ দি কর্টেক্স' অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মস্তিষ্কের চলমান ভারসাম্যের অভাব থেকে এই অসুস্থতা সৃষ্টি হয়েছে। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে খাদ্য গ্রহণের সময় কুকুরটিকে এক ধরনের 'ডায়নামিক স্টিরিওটাইপ' বজায় রাখতে হয়েছিল। কয়েকবার পড়ে যাবার ফলে চলমান ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। নিজেকে বিশেষ অবস্থায় মানিয়ে নেবার অক্ষমতা থেকে মস্তিষ্কের কয়েকটি বিশেষভাবে সম্পর্কিত বিন্দুর নিস্তেজনা-ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, বিন্দুগুলি উত্তেজিত অবস্থায় অনড় হয়ে পড়েছে। উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাবার ভয়ের দরুণ উত্তেজনা সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়েনি বটে, কিন্তু ঐ বিশেষ বিন্দুগুলিতে যেন অবস্থান ধর্মঘট করে বসে আছে। স্নায়ুধীন পরাবর্তটি যেন এক জায়গায় জমে 'ফ্রোজন' হয়ে পড়েছে। কণ্ডিশন বদলে গেছে, তবুও পরাবর্তটির পরিবর্তন ঘটছে না; কেননা উত্তেজিত বিন্দুটির উত্তেজনা প্রায় স্থায়িত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আশেপাশের অন্যান্য অংশ সুস্থ রয়েছে, কাজেই যুক্তিবুদ্ধি সাধারণভাবে মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করছে। কিন্তু অসুস্থ অংশগুলোর ক্রিয়াকলাপে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটছে, যুক্তিবুদ্ধি উত্তেজিত অংশের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে পারছে না।

অনেক সময় দেখা যায় যে অবসেসনাল নিউরোসিসের রোগীর মনে পুরনো ধারণার বিরোধী অবস্থার প্রকাশ ঘটেছে। নিজের দৈহিক সুস্থতা যার গর্বের বিষয় ছিল, সেই লোক রোগের ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। চিরদিন সততা ও সামাজিকতায় অভ্যস্ত ব্যক্তির মনে ভয় ঢুকেছে যে সে অসৎ, অসামাজিক কাজ করে বসতে পারে। সন্তানকে যে নিজের থেকেও ভালবাসে, তার মনে ভয়— সন্তানকে সে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে। সাধারণভাবে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ধরে নেওয়া হয় যে রোগীর নির্জ্ঞানে ঐ ধরনের কোন অবদমিত ইচ্ছা রয়েছে, অথবা অন্য কোনো অপরাধবোধ থেকে এই অপরাধবোধ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যে ভাবেই ব্যাখ্যা দেওয়া যাক না কেন রোগী আরও বেশী আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পাভলভ নির্জ্ঞানবাদ বা রহস্যবাদের সাহায্য না নিয়ে এই বিশেষ মানসিকতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মস্তিষ্কের এই অতি স্ব-বিরোধী অবস্থার (আলট্রা প্যারাডক্সিক্যাল) শারীরবৃত্তিমূলক তাৎপর্য পূর্বেই বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে। বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিকের কাছে বৈপরীত্যের ডায়ালেকটিক্স অতি পরিচিত ঘটনা।

* The exclusion of the activity of only the motor region of the cerebral hemispheres.

* The patient would present an example of chronic partial sleep or hypnosis.

এইবার যে প্রশ্নটি উত্থাপন করব, সেটি নিয়ে পাভলভপন্থীদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। কোন ধরনের মস্তিষ্ক আবেশিক নিউরোসিসে আক্রান্ত হয়? একদল বলেন যে আবেশিক বা অবসেশনাল নিউরোসিস দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য থেকে সৃষ্টি হয়। 'সাইকেস্থেনিয়া' দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের অতিপ্রাধান্যজনিত রোগ। সাধারণভাবে একে হ্যামলেটের মানসিক বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। 'হবে কি হবে না?' এই নিয়েই এদের চিন্তা। অবশ্য কোনো শারীরিক রোগ বা মানসিক দুর্যোগ আগে থেকে মস্তিষ্ককে দুর্বল করে দেবার ফলেই আবেশিক নিউরোসিসের আক্রমণ ঘটে। এই মতাবলম্বীরা এই রোগকে দুরারোগ্য বলে মনে করেন।

অন্য এক দলের মতে, আবেশিক নিউরোসিস শুধু বুদ্ধিবাগীশদের রোগ নয়। যখন বুদ্ধিবাগীশরা এই রোগে আক্রান্ত হন তখন হয়ত এর আরোগ্য দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা এবং অন্যান্য অনেক কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। প্রথম সাংকেতিক স্তরের আধিক্য যে মস্তিষ্কে, সে মস্তিষ্কেও আবেশিক নিউরোসিস দেখা দিয়ে থাকে। পেত্রভার পরীক্ষাধীন কুকুরটি উল্লেখ করে এঁরা বলেন যে, পশুর মধ্যে আতঙ্কের আবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে; পশুর দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের বালাই নেই। কাজেই অবসেশনকে এঁরা সাইকেস্থেনিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে চান না। অবসেশন এঁদের চিকিৎসায় আরোগ্য হয়েছে বলে এঁরা দাবী করেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, শিল্পী-মস্তিষ্কও (যাদের মধ্যে প্রথম সাংকেতিক স্তর বা অনুভূতি-সংবেদনের আধিক্য) আবেশিক নিউরোসিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে। শিল্পী-মস্তিষ্ক সাধারণ অভিভাবনে সাড়া দিয়ে থাকে, কাজেই এই টাইপের রোগীদের আরোগ্যের সম্ভাবনা বেশি।

আবেশিক অবস্থা বা বাধ্যকারী (কমপালসিভ) ক্রিয়াকলাপ সব সময়েই শুধু নিউরোসিসের উপসর্গ নাও হতে পারে। স্কিজোফ্রেনিয়ার মত সাইকোসিসেও অনেক সময় আবেশিক উপসর্গ, বিশেষ করে রোগাতঙ্কের (হাইপোকন্ড্রিয়া) লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অন্যান্য সাইকোসিস বা উন্মাদ রোগেও আবেশিক রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। আবার অন্যান্য নিউরোসিসের সঙ্গেও আবেশিক বা বাধ্যকারী উপসর্গের আবির্ভাব ঘটতে পারে। প্রথমদিকে নিউরোসিস বিশেষ একটি ধরনের উপসর্গ নিয়ে দেখা দিলেও কিছুদিন পরে নানা উপসর্গের সৃষ্টি হয়। একেবারে অবিমিশ্র নিউরোসিস খুব কমই পাওয়া যায়।

নিউরোসিস ও জৈবরসায়ন

পাভলভ-ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে নিউরোসিসের কারণ সম্পর্কে আর যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, এখানে তার অবতারণা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নিউরোসিস-উৎপাদন পরীক্ষা থেকে প্রাণীর নানা রকম দৈহিক উপসর্গ দেখা দিয়েছে এবং দেখা দিয়ে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের হ্রাস-বৃদ্ধি, রক্তচাপ কমা-বাড়া ইত্যাদি উপসর্গ সব রোগীর বেলাতেই লক্ষ্য করা যায়। ল্যাবরেটরির কুকুরের উপর পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য করা গেছে যে তাদের লালা নিঃসরণ বিনা কারণে বাড়ছে, লোম পড়ে যাচ্ছে, একজিমা জাতীয় চর্মরোগ বা অন্য ধরনের ক্ষত দেখা দিয়েছে। এ-ছাড়া যে কোনো আন্তরযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা নিউরোসিসে দেখা দিতে পারে। হজমের গোলমাল, ডিসপেপসিয়া, অম্লক্ষত ইত্যাদি নানা রকমের রোগলক্ষণ পরীক্ষাধীন কুকুরগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আমেরিকান চিকিৎসকরা (সাইকো-সোমাটিস্ট) মানসিক বিশৃঙ্খলা থেকে উৎপন্ন শারীরিক ব্যাধি বলে যে সব উপসর্গের নামকরণ করেছেন, পাভলভিয়ানরা সেগুলোকে কর্টিকো-ভিসেরাল, অর্থাৎ মস্তিষ্ক প্রভাবিত আন্তর-যান্ত্রিক গোলযোগ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। পাভলভের প্রতায় অনুযায়ী গুরুমস্তিষ্ক শুধু যে বহির্বাস্তবের সঙ্গে প্রাণীর সামঞ্জস্যবিধান করে তাই নয়, প্রাণীর দেহের ভিতরকার প্রতিটি যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণও করে। মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা কয়েকটি কেন্দ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সাধারণভাবে সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে, কাজেই দেহমনকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। পাভলভের মৃত্যুর পর কলাতুসীর গবেষণাগারে বিকফ ও তাঁর সহকর্মীরা এ নিয়ে অনেক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং তার ফলে বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে।

এইবার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এ যাবৎ বাইরের জগতের উদ্দীপক থেকে সৃষ্ট নিউরোসিসের কথাই আমরা বলেছি। গবেষণাগারের পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্তরযন্ত্রের অর্থাৎ দেহের

ভিতরকার বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় থেকে নিউরোসিস সৃষ্টি হতে পারে। একটু আগে মানসিক কারণে শারীরিক অসুস্থতার কথার উল্লেখ করেছি। আন্তরযন্ত্রের বিকলতা থেকে সৃষ্ট নিউরোসিসের সঙ্গে 'কটিকো-ভিসেরাল সিনড্রোম'কে এক করে ফেললে আমরা ভুল করবো। এখানে শারীরিক অসুস্থতা থেকে মানসিক বিকারের সৃষ্টি হয়, ফলে শারীরিক অসুস্থতা অনেক সময় আরো জটিল হয়ে ওঠে ও দুরারোগ্যের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে।

এ সম্পর্কে দুটি একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রাণী মাত্রেরই গর্ভধারণকালে ও সদ্যোজাত শাবককে লালনপালনকালে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। এই সময় নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়ে; নিষ্ক্রেজনা-উত্তেজনা প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। এগুলো অবশ্য স্বাভাবিক শারীরবৃত্তিক পরাবর্ত; অসুস্থতার নিদর্শন নয়। হরমোনের প্রভাবে মস্তিষ্কের এই পরিবর্তন ঘটে।

পাভলভের গবেষণাগারে পুং হরমোন, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড এবং পিটুইটারী হরমোনের সঙ্গে নিউরোসিসের সম্পর্ক নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কুকুরকে খাসী করার পর তার স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রতিক্রিয়া নানাদিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর ফলে মস্তিষ্কবোধের উত্তেজনা-নিষ্ক্রেজনা শক্তি, ভারসাম্য ও গতিময়তা—তিনদিকই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, দেখা গেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন চিরস্থায়ী নয়। ধীরে ধীরে কিছু দিনের মধ্যে প্রাণীটি তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, এর পর খুব সহজেই এই সব কুকুর নিউরোসিসে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। এই সব প্রাণীদের উপর নিউরোসিস আরোগ্যের নানাবিধ চিকিৎসা প্রণালী প্রয়োগ করার ফলে চিকিৎসা বিষয়ে অনেক নতুন জ্ঞান লাভ হয়েছে। আবেশিক নিউরোসিসে অনেক পাভলভীয় মনোচিকিৎসক নিয়ম করে পুং হরমোন ইঞ্জেকশন দিয়ে থাকেন।

মাদকদ্রব্য

অন্যান্য হরমোন প্রভাবিত নিউরোসিস নিয়ে এখনও গবেষণা চলেছে। সুনির্দিষ্ট কোন ফলাফল পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই। উচ্চমস্তিষ্কের উপর নানারকমের বিষ ও মাদকদ্রব্যের প্রভাব নিয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে।

এর মধ্যে এ্যালকোহলের প্রভাব সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলো খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। নিয়মিত এ্যালকোহল সেবনের ফলে কুকুরের নিষ্ক্রেজনা প্রক্রিয়া প্রথমে দুর্বল হয়ে পড়ে, তার আত্মসংযমের অভাব ঘটে। তারপর উত্তেজনা প্রক্রিয়াও দুর্বল হতে থাকে। এরপর আসে সম্মোহন পর্ব, প্রথমে সমমাত্রিক, তারপর ঘষিরোধী ও অবশেষে অতি-ঘষিরোধী অবস্থা। এই পর্ব প্রতিরক্ষা মূলক নিষ্ক্রেজনা পর্ব, প্রাণীর আত্মরক্ষার শেষ উপায়। কিন্তু এ্যালকোহলের প্রভাব থাকার দরুণ এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ক্রমশ প্রাণী আবেশিক নিউরোসিস, আতঙ্ক ও ভ্রান্তিমূলক উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

পাভলভ 'নিউরোসিস' সৃষ্টি এবং নিউরোসিস-এর কারণ নির্ধারণ ছাড়াও উন্মাদ রোগের উপসর্গ ব্যাখ্যায় মনস্তাত্ত্বিক বিকারের (psychopathological) প্রচলিত ধারণার পরিবর্তে মনের অন্তরস্থ মস্তিষ্কের কোষক্রিয়া-ভিত্তিক— শারীরবৃত্তিক বিকার (patho-physiological) -এর ওপর গুরুত্ব দিলেন। *Twenty Years of Objective Study* বইটির 725 পৃষ্ঠায় তিনি বললেন, "The physiological study of higher nervous activity provides the clue to an understanding of certain sides and phenomena of the pictures of psychosis".

উন্মাদরোগ

উন্মাদরোগে মাঝে মাঝে দেখা যায় রোগী একই কথা বারবার বলছে, একই কাজ বার বার করছে। প্রায়ই এইসব কথা বা কাজের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক রকমের স্কিজোফ্রেনিয়ার (catatonic schizophrenia) রোগী একই ভাবে হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা, অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে। পাভলভ এই ধরনের রোগ উপসর্গের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন যে, মস্তিষ্কবল্কলের চেষ্টীয় অংশের (motor area of the cortex) সংশ্লিষ্ট কোষের সক্রিয়তা নষ্ট হয়েছে, কোষগুলো অনড় (inert) হয়েছে। কখনও মস্তিষ্কবল্কলের মাত্র কয়েকটি কোষ, কখনও বা চেষ্টীয় অঞ্চলের অনেকখানি জুড়ে এই অনড়তা আসতে পারে। এর ফলে

শুধু পেশির সঞ্চালনে অক্ষমতা বা কয়েকটি পেশির বারবার একই ধরনের উদ্দীপনা ঘটতে পারে, এ-ছাড়া উপলব্ধিরও (perception) অনড়তা দেখা দিতে পারে। কারণ মস্তিষ্কবল্কলের অনড়তার দরুণ অন্তর্মুখীন ও বহির্মুখীন দুধরনের উদ্দীপকই ঠিকমত সাড়া জাগাতে পারে না।

এই অস্বাভাবিক বিকারভিত্তিক অনড়তা মস্তিষ্ককোষের সর্বস্তরে উদ্ভূত হতে পারে। প্রাথমিক ও দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরে, (first and second signalling system) অর্থাৎ অনুভূতি ও বাচনভিত্তিক উপলব্ধির স্তরে সঞ্চালিত হলে অনড়তার মাত্রার তারতম্য অনুযায়ী বিকৃত ধারণা বা বিকৃত অনুভূতির উদ্রেক হবে। ভ্রান্তিমূলক অসুস্থচিন্তা (delusion) ও অমূলকতাবোধের ব্যাখ্যায় এই অনড়তার ভূমিকারও উল্লেখ করেছেন পাভলভ। (*Ibid.* pp. 644-45)

নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার পরিক্রমা কেন্দ্রীভবন, বিশেষ করে সম্মোহন ঘুমের, বিভিন্ন স্তরে এর গভীরতার সঙ্গে উন্মাদ রোগীর বেশ কিছু রোগলক্ষণ সম্পর্কিত। বলা যেতে পারে, উন্মত্ততার অনাকিছু উপসর্গেরও শারীরবৃত্তিক অসুস্থতাভিত্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন পাভলভ। সম্মোহনপর্বে নিস্তেজনা প্রক্রিয়া যখন চেষ্টীয় বিশ্লেষণী অঞ্চলে (motor-analyser area) বিস্তারিত হয়, তখন অতি-স্ববিরোধী অবস্থার (ultra-paradoxical phase) দরুণ রোগীর মধ্যে নাস্তিক্যভাব বা যুক্তিহীন বিরোধীভাবের (negativism) উদয় হয়। নিস্তেজনা যখন আরো নিচের দিকে নেমে আসে তখন নিশ্চলতা বা অচৈতন্যভাব দেখা দিয়ে থাকে।

স্কিজোফ্রেনিয়া সম্পর্কে পাভলভের বক্তব্য আগেই বলা হয়েছে। খেদোন্মত্ত বাতুলতা সম্পর্কে (manic-depressive psychosis) পাভলভের শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করছি।

স্নায়ুসংস্থার অতিরিক্ত পীড়ন অথবা কোনো রকমের শারীরিক অসুস্থতার ফলে উত্তেজনাপ্রবল ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের অসুখ দেখা যায়। এদের স্বাভাবিক নিস্তেজনা-ক্ষমতার স্বল্পতার ফলে অতিরিক্ত পীড়নের সুষ্ঠু পরিপূরণ ঘটে না। উত্তেজনা সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে; কোষের কর্মশক্তিকে ব্যাহত করে, মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের তথা মানসিকতার বিশৃঙ্খলা ঘটায়। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের মধ্যে উত্তেজক-পদার্থ নিঃশেষ হয়ে গেলে গোটা মস্তিষ্কে সক্রিয় শর্তহীন নিস্তেজনা (protective inhibition) নেমে আসে। এর ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের ছন্দপাত ঘটে। সার্বিক নিস্তেজনা কিছুদিন ধরে চলার পর আবার মস্তিষ্কে উত্তেজক পদার্থ জমতে থাকে। বহির্বাস্তব অর্থাৎ পরিবেশের যে-সব উদ্দীপক অতি-উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য দায়ী, তারা বিদ্যমান থাকে; কাজেই উত্তেজক বস্তুর মাত্রা বাড়লেই আবার অতি-উত্তেজনা পর্বের শুরু হয়। এই ভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে উত্তেজনার পর নিস্তেজনা এবং নিস্তেজনার পর আবার উত্তেজনা—অবশ্য অস্বাভাবিক ও অসুস্থভাবে দুই পর্বেই মাত্রাধিক্য বিদ্যমান থাকে। "Hence in particularly difficult conditions of life or in certain conditions unfavourable for the organism, there sets in, finally, manic depressive psychosis" (Pavlov, *Twenty Years of Objective Study*, p. 677).

পাভলভ পরিচিতি থেকে

প্রকাশের অপেক্ষায়

পাভলভ পরিচিতি (অখণ্ড)

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দাম - 150.00

স্নায়ুতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও পাভলভ

জে. ডি. বার্নাল

পরিপাকক্রিয়া

বহু শতাব্দী ধরেই পরিপাকক্রিয়া ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টা করে আসছিল মানুষ। কিন্তু সে-প্রচেষ্টা ছিল বিশৃংখল। সেই প্রচেষ্টায় দুটি নতুন প্রণোদনা এল। একটি এল প্রাণ-রসায়নের দিক থেকে।.. অন্যটি এল পরীক্ষাভিত্তিক শারীরতত্ত্বের দিক থেকে। টায়ালিন, পেপসিন এবং ট্রিপসিন নামক তিনটি উৎসেচক (enzyme) খাদ্যবস্তুকে কীভাবে বাপে বাপে ভেঙে নেয়; পরিপাক করা পদার্থগুলিকে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucosa) কীভাবে শোষণ করে নেয়; অতঃপর তাদের কী ধরনের রূপান্তর ঘটে এবং কীভাবে তারা যকৃতের মধ্যে সঞ্চিত হয়— সেসবই প্রাণ-রসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে জানা সম্ভব হল। এর প্রত্যেকটিই হচ্ছে একেকটা সুবিস্তৃত রসায়নিক প্রক্রিয়া, এবং এদের প্রত্যেকটিকেই আলাদা করে অনুধাবন করা সম্ভব। কিন্তু এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ব্যাপারটিকে বুঝতে হলে সমগ্র জীবের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতটিকে মাথায় রাখা দরকার।

1897 সালে পাভলভ সেই কাজটিই করলেন। তাঁর নিজস্বতা এইখানে নয় যে তিনি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের পথটি অনুসরণ করেছিলেন। কেননা সে ব্যাপারে তিনি স্পালানজানি (Spallanzani, 1727-99) এবং বোমঁ (Beaumont, 1785-1853)-র উত্তরসূরী মাত্র। পাভলভের সত্যিকারের নিজস্বতা পরিলক্ষিত হয় এক নতুন ধরনের সুশৃঙ্খল, পরিমাপাত্মক শারীরবৃত্তিক অনুসন্ধান-প্রক্রিয়ার প্রবর্তনে। এ ক্ষেত্রে তিনিই পথপ্রদর্শক। পরীক্ষা-সহযোগে বিশেষ কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার সময় আনুষঙ্গিক গৌণ প্রতিক্রিয়াকেও লক্ষ্য করবার, ও তা নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাবার এক আশ্চর্য প্রতিভা ছিল তাঁর। পাচক রসের ক্ষরণ-হার নির্ণয় করতে গিয়ে এইভাবেই তিনি শর্তাধীন পরাবর্ত (conditioned reflex) ব্যাপারটা আবিষ্কার করেন। এ নিয়ে পরে আলোচনা করব। পাভলভ প্রমাণ করলেন যে, পরিপাক-ক্রিয়ার ঘটনাটা মোটেই নিছক পাকস্থলীর নিজস্ব কারিকুরি নয়। পাকস্থলী, মুখগহ্বর, নাক এবং চোখ থেকে যেসব উদ্দীপনা পরিবাহিত হয়, সমগ্র জীবদেহে তার অতি জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে, এবং তারই সম্মিলিত পরিণতিতে পরিপাক-ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সেই সব উদ্দীপনা যুগপৎ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং সমবেদী (sympathetic) স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ মারফত পরিবাহিত হয়। অর্থাৎ জীবদেহের যে সংহত ঐক্য তা জীবদেহের গঠনের মধ্যেই অন্তর্গ্রথিত। এবং সেই গঠনটি সুদীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া

পরিবেশের সঙ্গে জীবের যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে ইন্দ্রিয়, স্নায়ুতন্ত্র এবং পেশির সম্মিলিত সক্রিয়তা জড়িত। স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে মানুষ বিজ্ঞানের উদ্ভবকাল থেকেই চর্চা করে আসছে। বিশে শতাব্দীতে যেসব গবেষণা চলেছে তা এ বিষয়ে আমাদের ধারণাকে বহু দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। উনিশ শতকের শেষ দিকের মধ্যেই মানুষের এবং নানা ধরনের প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের কাঠামোগত চিত্র আঁকা সম্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন প্রাণীর ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে, স্নায়ুতন্ত্রের কোন অংশের কী ধরনের রোগে বা আঘাতে শরীরে কোন অংশের নড়াচড়া বা সংবেদনশীলতা ব্যাহত হয় তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। সেই সব পর্যবেক্ষণের সহায়তায় স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান প্রধান সংযোগপথগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। দেখা যায়, মানুষ এবং উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (যার মূল রয়েছে মস্তিষ্কে) এবং একটি সমবেদী ও একটি পরাসমবেদী (sympathetic and parasympathetic) স্নায়ুতন্ত্র। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রটিই প্রাণীর সচেতন সংবেদন এবং ঐচ্ছিক চলনের জন্য মূলত দায়ী। অপর স্নায়ুতন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত কম কেন্দ্রীভূত। এরা শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ইচ্ছানিরপেক্ষ চলন ও রসক্ষরণের জন্য দায়ী।

স্নায়ুতন্ত্রের বৈদ্যুতিক চরিত্র

এতদসত্ত্বেও, স্নায়ুবার্তা কীভাবে প্রেরিত হয় এবং কীভাবে তারা সুসমঞ্জস উদ্গম ধারণ করে তার প্রায় কিছুই বিশ শতকের গোড়ায় আমাদের জানা ছিল না। জীব-পদার্থবিদ্যা এবং প্রাণ-রসায়নে ব্যবহৃত আধুনিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ না ঘটালে ঐ

ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত মূল কাঠামোগুলো এবং প্রক্রিয়াগুলো কেমন তার কিছুই জানা সম্ভব হতো না। 1926 সালের পরের বছরগুলোতে এড্রিয়ান ও অন্যেরা ইলেকট্রনিক বিবর্ধন-ব্যবস্থার প্রয়োগে দেখাতে সমর্থ হন যে, প্রতিটি স্নায়ু-সংকেত সমান শক্তির কতকগুলি স্পন্দ (pulse) দ্বারা গঠিত। সেইসব স্পন্দের বৈদ্যুতিক বিভব (potential) সর্বদাই সমান থাকে, কিন্তু তাদের কম্পাঙ্ক, একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাদের প্রাথমিক উদ্দীপনার শক্তির সঙ্গে সমানুপাতিক হয়। সুতরাং স্নায়ুগুলি কোনো অভিঘাত (impulse) সম্বন্ধে কেবল পরিমাণগত তথ্যই প্রেরণ করে; আর সেই অভিঘাতের নির্দিষ্ট গুণগত বৈশিষ্ট্যটি (যথা রং, সুর বা অনুভূতি) প্রেরিত বার্তার পরিবহন-পথের অবস্থান অনুযায়ী নির্ণীত হয়।

মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়া এবং চৈতন্যকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ বিপুল প্রভাব ফেলেছে এবং বিপুলতর প্রভাব ফেলবে। বহু স্নায়ুবার্তা আমরা আমাদের চৈতন্যকে স্পর্শ করে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা অসমন্বিত। অনেক স্নায়ুবার্তা একেকটি পরাবর্ত-আর্কের (reflex arc) মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সেই আর্কে কোনো একটা বিশেষ সংবেদন স্বতই একটা বিশেষ চলনের সৃষ্টি করে। 1897 সালে পাভলভ এ ব্যাপারে যে কাজের সূত্রপাত করেন তা বিশে শতাব্দীর সুমহান কীর্তিগুলির অন্যতম। পাভলভ দেখান, এই সব পরাবর্ত পুরোপুরি মানস-নিরপেক্ষ নয়, তাদের পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় এবং চৈতন্যের সাহায্যে তাদের সংপরিবর্তিত করে নেওয়া যায়। শর্তাধীন পরাবর্ত নিয়ে যে পরীক্ষানূলক অনুসন্ধানকার্য তিনি চালান তার মধ্য দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াসমূহকে শারীরবৃত্তীয় ভিত্তিতে অনুধাবন করার প্রয়াসের শ্রেষ্ঠতম উদ্যোগের সূচনা ঘটে।

স্নায়বিক অভিঘাতের মধ্যে ক্রিয়ারত বৈদ্যুতিক বিভবের চলন নিয়ে অতঃপর গবেষণা করেন বুখতাল (Buchthal), হজকিন এবং অন্যান্যেরা। তাঁরা দেখেন যে ঐ চলনের মূলে আছে বৈদ্যুতিক মেরুভবনের (polarization) একটি বিশেষ অবস্থার বিস্তৃতি। সেই মেরুভবন ঘটে একটি ঝিল্লি বরাবর। সেই প্রক্রিয়ার ধাতুর আয়নসমূহ একধার থেকে অন্যধারে চলে যায়। পক্ষান্তরে, স্নায়বিক অভিঘাত যে-প্রক্রিয়ায় চলন ঘটায় বা সংবেদন গ্রহণ করে, তা মূলত রসায়নিক বলে প্রমাণিত হয়। 1929 সালে ডেল এবং ডাড্‌লি দেখান যে, কোনো একটি স্নায়ুর প্রান্তে বা দুটি স্নায়ুর মধ্যে সংযোগ-সাধনকারী স্নায়ুসন্ধিতে (synapse) যখন একটি বৈদ্যুতিক অভিঘাত এসে পৌঁছয়, তখন একটি রসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়। সেই রসায়নিক পদার্থটি আবার একটি কোষকে উদ্দীপিত করে। উদ্দীপিত সেই কোষটি তখন বৈদ্যুতিক অভিঘাতটিকে অন্য একটি কোষে চালান করে দেয়।

স্নায়ু-সংযুক্তি ও ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাদি

শরীরে, বিশেষ করে মস্তিষ্কে, বিভিন্ন স্নায়বিক অভিঘাতের পারস্পরিক সংযোগ নিয়ে চর্চার মধ্যে দিয়ে জীববিজ্ঞান অগ্রসর পদার্থবিদ্যার সঙ্গে, বিশেষত ইলেকট্রনিকসের সঙ্গে উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 1928 সালে বার্জার একজন রোগীর মাথায় বসানো দুই তড়িৎদ্বারের মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভবস্তরসের সঞ্চালন লক্ষ্য করেন। এই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ তৈরি হয় মস্তিষ্ক-তরঙ্গলেখ যন্ত্র (electro-encephalograph), যা খুবই সংবেদী। সন্ন্যাস রোগ প্রমুখ মস্তিষ্কঘটিত অসুখের নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য এই যন্ত্র অতীব প্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয়, গ্রে ওয়ল্টার প্রমুখ গবেষক এই যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের অবধারণ (perception) এবং চিন্তাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক ঘটনাবলীর ওপর আলোকপাত করেন।*

অপেক্ষাকৃত কম উন্নত প্রাণীর মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করেও অনেক কিছু জানতে পারা গেছে। কম্বোজকের (mollusc) মধ্যে যারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান সেই অক্টোপাসদের মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করেন জে. জেড. ইয়ং। ইন্দ্রিয় থেকে আহরিত সংবেদন কী ধরনের সংযোজক স্নায়ুর মাধ্যমে পেশির সংকোচনে পরিণত হয় (যে-সংকোচন চলনকে নিয়ন্ত্রণ করে) সে সম্পর্কে এর ফলে কিছু কিছু ধারণা গড়ে ওঠে।

---

* এইসব পদ্ধতি সহযোগে হয়তো অদূরভবিষ্যতে সরাসরি ভাব-বিনিময়ের একটা পন্থা গড়ে উঠবে। গ্রে ওয়ল্টার দেখিয়েছেন, একটি উদ্দীপনা মস্তিষ্কের মধ্যে যে-তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার সাহায্যে আর একটি উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায়। এ থেকে, নিছক চিন্তার সাহায্যে কী করে একটি যন্ত্রে সংকেত সৃষ্টি করতে হবে, এবং অতঃপর কোনো একটি সূত্রের (code) সাহায্যে কার্যক্ষেত্রে কীভাবে ভাব-বিনিময় ঘটানো যাবে, তা নিয়ে নিতে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়। এমন আশা করা যেতে পারে যে ঐ পদ্ধতিতে মানুষের চিন্তার ফসলকে অনেক দ্রুতগতিতে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। কথা বলার তুলনায় দ্রুতগতিতে, প্রত্যক্ষপক্ষে পাঠ করার সঙ্গে তুলনীয় গতিতে ভাববিনিময় সম্ভব হবে :— জে.ডি.বি

ইলেকট্রনিক এনজিনিয়াররা এইসময় নানাবিধ সার্কোকৌশল ও কম্পিউটারের প্রতিরূপ বিকাশ ঘটাচ্ছিলেন। এইসব কৌশলের সঙ্গে মস্তিষ্কের কর্মপ্রক্রিয়ার সাদৃশ্যটা স্বভাবতই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইসব কৌশলের অবয়বগত তিনটি মুখ্য উপাদান হলো: (1) সূত্রকারক (coder), যা বহিরাগত বার্তাকে মেশিনটির ব্যবহার্য ভাষায় অনুবাদ করে। (2) মূল যন্ত্র, যার মধ্যে থাকে স্মৃতিভাণ্ডার। যে সব নির্দেশবার্তা আশুব্যবহার্য নয় সেগুলোকে সঞ্চিত করে রাখাই এই স্মৃতিভাণ্ডারের কাজ। (3) সূত্রবিশ্লেষক (decoder), যা মেশিনের বার্তাকে কোনো বাহ্য ক্রিয়ার রূপান্তরিত করে। এই তিনটি অঙ্গ প্রাণীদের বাহ্যেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক এবং পেশিকাঠামো বা অন্যান্য কর্ম-অঙ্গের সঙ্গে মোটামুটি তুলনীয়। অবশ্য খুবই অনুন্নত প্রাণীর মস্তিষ্কেও যে ধরনের কাঠামো এবং সক্রিয় সংযোগক্ষেত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে, ইলেকট্রনিক গণকযন্ত্রকে তারও এক নিতান্তই অভিসরলীকৃত সংস্করণ বলে মনে হয়। ঐ সব কাঠামো আর সংযোগক্ষেত্রে মানুষের মস্তিষ্কে বহু বহু গুণে জটিল ও উন্নত রূপ ধারণ করেছে। বোধশক্তি নিয়ে যে সব গবেষণা চলে তাতে দেখা যায় মস্তিষ্কের মধ্যে অণুবীক্ষণ সহযোগে দৃষ্ট বিভিন্ন সংযোজক-ব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বর্তনীসজ্জার (circuitry) মধ্যেকার সংযোজক-ব্যবস্থাগুলোর নানাদিকে সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন ধরা যাক, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ দর্শন-সংক্রান্ত বহিঃস্তরটির কথা। এটি কেন কয়েকটি স্তর সহযোগে গঠিত। প্রথম স্তরটির কাজ হলো অক্ষিপটের (retina) ওপর যে চিত্রটি এসে পড়েছে তাকে কার্যকররূপে বিশ্লেষণ করা। অন্যান্য স্তরগুলির কাজ হলো সেই চিত্রটির মর্মোদ্ধার করা এবং প্রাথমিক অবধারণাটিকে (percept) একটি মোটামুটি সু-বিশ্লেষিত ধারণায় (concept) রূপ দেওয়া (যথা একটি চলমান বস্তুর ধারণায়)। যে কারণে বস্তুটির অবস্থান, রং এবং আকার বদলে গেলেও তাকে আমরা একটি বস্তুসত্তা (entity) রূপেই ধারণা করতে পারি। জটিলতার দিক থেকে মস্তিষ্কের ধারে কাছে আসতে পারে এমন কোন কৌশল বা প্রক্রিয়া তৈরি করার সম্ভাবনা অবশ্য আজও সুদূর পরাহত। প্রধান ব্যাপারটা এই যে মস্তিষ্ক নামক অঙ্গটি হচ্ছে একটি অতিক্ষুদ্রায়িত ব্যবস্থা। উদ্দীপন এবং সম্প্রেরণের (transmission) একেকটি ক্রিয়ার প্রথতাজনিত ঘাটতি সেখানে পূরণ হয়ে যায় প্রতিক্রিয়ারত কোষের বিপুল সংখ্যাধিক্যের দ্বারা: মস্তিষ্কের কোষসংখ্যা এক হাজার কোটির মতো। এ আলোচনা থেকে কেউ যেন একথা না ভাবেন যে, মস্তিষ্ক হচ্ছে একটি গণকযন্ত্র। আদৌ তা ঠিক নয়। ঠিক যেমন চোখ আর ক্যামেরা এক জিনিস নয়। আমাদের বক্তব্য কেবল এই যে, যেসব ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে বহুযুগধরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে, আর মানুষ কৃত্রিমভাবে যেসব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, এ দুয়ের মধ্যে তুলনাটা খুবই শিক্ষাপ্রদ। কারণ স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত এসব ব্যবস্থা যে পরিবেশকে অনেক ভালোভাবে বুঝতে, সুষ্ঠুতররূপে বিশ্লেষণ করতে ও শ্রেষ্ঠতররূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তা প্রমাণিত। আর মানুষও কৃত্রিম ব্যবস্থা গড়ে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই।

পশু আচরণ

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পশুদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে দিয়ে বিশে শতাব্দীতে প্রাণীদেহের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়-প্রক্রিয়াটিকে জানবার একটি ভিন্নতর পথও গড়ে ওঠে। পাভলভের কাজের সূত্রে এইসব পর্যবেক্ষণকে স্নায়বিক কর্মপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ জন্তুদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে আসছে। পুরাপ্রস্তর যুগে মানুষ যখন জন্তু শিকার করতে আরম্ভ করে, এবং নবাপ্রস্তর যুগে মানুষ যখন প্রথম তাদের পোষ মানাতে আরম্ভ করে, তখনই সম্ভবত সে-পর্যবেক্ষণ সবচেয়ে নিবিড়ভাবে শুরু হয়। কিন্তু তারপরে সেই জ্ঞান নিছক লোকবিশ্বাসে পরিণত হয়। নতুন নতুন দিক সম্বন্ধে আগ্রহ হ্রাস পায়। সে জ্ঞান প্রথমে ছিল প্রয়োজনসাধক; পরে তা হয়ে উঠল জাদুবিশ্বাস-আশ্রয়ী, ভবিষ্যদ্বাণী করার হরেক পন্থার মধ্যে একটি। তারও পরে সে জ্ঞান হয়ে ওঠে নৈতিক উন্নতিসাধনের বাহন। গ্রীক-রোমান যুগের পশুভিত্তিক নীতিকাহিনীর বা মধ্যযুগের পশুপুরাণের সাহসী সিংহ, ধূর্ত শৃগাল কিংবা আত্মদানকারী পেলিক্যান তার নিদর্শন। অবশেষে ভিক্টোরিয়া যুগে তা হয়ে ওঠে চিত্রধর্মী বা কাহিনীমূলক এবং ভাবালু। সে যুগের প্রধান আগ্রহটা ছিল জন্তুজানোয়ার পোষার দিকে; তা ছিল একটা ব্যসন। আসলে পশু নিয়ে সনিষ্ঠ কোনো পরিমাণাত্মক চর্চা শুরু হতে যে এত দেরি হলো তার প্রধান কারণ লোকের তখন ধারণা ছিল, এ নিয়ে ব্যাখ্যা করার আদৌ কিছু নেই। যেহেতু পশুদের বিচারবুদ্ধি নেই, তাই তারা যা কিছু করে সবই প্রবৃত্তির তাড়নায় করে। এতেই সব বলা হয়ে গেল বলে ভাবা হতো। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এক নতুন জগৎ আবিষ্কারের অপেক্ষায় পড়ে ছিল। এক্ষেত্রেও চার্লস ডারউইন ছিলেন অগ্রণী পথপ্রদর্শক। তাঁর *Expressions of the Emotions in Man and Animals* তার নিদর্শন।

সহজাত প্রবৃত্তি ও শিক্ষাগ্রহণ

পশু-আচরণ নিয়ে পরীক্ষাভিত্তিক গবেষণা শুরু করেন সি.এল. মর্গ্যান (1852 - 1936)। মুরগি এবং ইঁদুর থেকে আরম্ভ করে বাঁদর পর্যন্ত পশুরা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে, কীভাবে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পায়, তা নিয়ে গবেষণা করেন তিনি। এ ধরনের গবেষণার সবচেয়ে মুশকিল হলো, এমন পরিস্থিতি তৈরি করা চাই যা পশুদের পরিচিত হবে অথচ সরলও হবে—এতটা সরল যাতে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাখ্যার কাজটি সম্ভব হয়। কাজেই গোড়ার দিকে বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে যে সব ফল পাওয়া গেল তার মধ্যে অনুসন্ধানকারীদের নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন যতটা ঘটল, পশুদের আচরণের প্রতিফলন ততটা ঘটল না। আমেরিকাতে ওয়াটসন (1878-1958) এবং জার্মানিতে কোয়েলার (Kohler) এ নিয়ে কাজ করেন।

এঁদের একজন প্রাণীদের সম্পূর্ণ চেতনাবিহীন, অর্থাৎ মনের ক্রিয়াবর্জিত আচরণ লক্ষ করলেন। অন্যজন আবার চিন্তাচালিত আচরণ লক্ষ করলেন। ফলে দুজনে দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী তত্ত্ব প্রণয়ন করলেন। ওয়াটসন মন ব্যাপারটাকে পুরোপুরি খারিজ করে দিলেন। তিনি বললেন, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর বাস্তবীয় আচরণের মূলে রয়েছে কেবল নানাবিধ উদ্দীপনার যথাযথ সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া। অপরদিকে কোয়েলার বললেন, প্রাণীদের মনের মধ্যে নানান সুসম্পূর্ণ ও সুবদ্ধ কাঠামোর অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি এইসব নতুন জিনিসগুলোর নাম দিলেন 'গেস্টাল্ট' (Gestalt) বা মানসরূপ। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রতিধ্বনিত হলো প্লেটোর সুপ্রাচীন ভাববাদ।

পরবর্তীকালে এই ক্ষেত্রে আরো বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা চলে। ফলে বিভিন্ন প্রাণীর বিশেষ ধরনের আচরণ নিয়ে জ্ঞানলাভের নতুন পথের সন্ধান মেলে। সবচেয়ে বড়ো কথা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের যে ব্যাপারটির গুরুত্ব সর্বাধিক সে সম্পর্কেও কিছু কিছু ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়াটির সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়াটি নিছক সরল প্রক্রিয়ার চাইতে আরো অনেক অগ্রসর। আচরণের একটি 'শিক্ষিত' ধরন প্রতিষ্ঠা করার আগে নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। তুলনামূলক বিচারের মধ্যে দিয়ে তাদের বাছাই করে নিতে হয় এবং নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। শিক্ষাগ্রহণের এই ধারণাটিকে খুবই সরলীকৃত রূপে ইলেকট্রনিক মেশিনে প্রয়োগ করা হয়েছে। হয়তো একদিন এর ফলে যন্ত্রপ্রাণী নির্মাণ সম্ভব হবে; সে নিজে নিজেই চলে ফিরে বেড়াতে এবং পরিপার্শ্বের পরিস্থিতি অনুযায়ী 'শিক্ষিত' ধরনে সাড়া দেবে।

স্মৃতি

পশুদের স্মৃতি ব্যাপারটা নিয়ে নানান পদ্ধতিতে পরীক্ষা চলে। তা থেকে এই রকম মনে হয় যে স্মৃতি জীবজগতের এক অতি প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। কৃমিকীট জাতীয় অতি নিম্নস্তরের জীব নিয়ে যে যে সব পরীক্ষা চালান তাতে দেখা যায়: তাদের সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়াটি গোটা দেহে ছড়িয়ে যায়। কেটে টুকরো করে ফেলার পর যখন তাদের দেহ নতুন করে গড়তে আরম্ভ করে, তখন সেইসব নবজাত খণ্ডদেহের মধ্যে তাদের পূর্বতন অভিজ্ঞতার কিছু স্মৃতি থেকে যায় বলে মনে হয়। ইঁদুরদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে সংবেদন-গ্রাহী ইন্দ্রিয় সমূহের ভেতরকার নিউক্লীয় অ্যাসিডের পরিবর্তিত রকমফেরের মধ্যেই স্মৃতি সঞ্চিত থাকে, সম্ভবত মস্তিষ্কে অবস্থিত নিউক্লীয় অ্যাসিডের মধ্যেও। এই ব্যাপারটার সত্যতা যদি পাকাপাকিভাবে প্রমাণিত হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে স্মৃতি হলো একটা আলোকচিত্রের মতো জিনিস; তফাৎ এই যে সে-আলোকচিত্র সিলভার নাইট্রেটের বদলে নিউক্লীয় অ্যাসিডে ছাপা হয় এবং প্রয়োজনমতো উপযুক্ত উদ্দীপনার সাহায্যে তাদের বার বার জাগিয়ে তোলা যায়। আরেকটি মধ্যবর্তী ধারণাও চালু আছে; সেটি হলো: স্মৃতি আর স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে একই বার্তা ক্রমাগত সক্রিয়ভাবে পুনরাবৃত্ত হয়ে চলে। এই ধারণাটি সম্ভবত বাতিল করতে হবে, অন্তত আংশিকভাবে। তবে স্মৃতি যে কেবল এক রকমেরই হয়, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। হয়তো স্বল্পমেয়াদী আর দীর্ঘমেয়াদী, দুরকমেরই স্মৃতি আছে।

সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং সুকৌশলে পরিকল্পিত নানান পরীক্ষানিরীক্ষার সমন্বয়ে প্রকৃতিতে পশুদের আচরণকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাদের যৌন মিলন, সন্তান পরিচর্যা, নিজ কিংবা অপরাপর প্রজাতির প্রাণীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক — এসব আচরণকেই এখন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে। এইসব গবেষণা এখন চিরাচরিত কাহিনী-নির্ভর প্রকৃতি-ইতিহাসের স্থান দখল করে নিয়েছে। পশুদের ভাষা রপ্ত করার ইচ্ছা মানুষের অনেক দিনের। সে ইচ্ছাও এবার পূর্ণ হচ্ছে। দেখা গেছে, মানুষের ভাষার

তুলনায় যতই সরল হোক, পশুদের ভাষাও খুবই জটিল। সিনবার্জেন প্রমুখ পর্যবেক্ষকদের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, চলাফেরা ও খাওয়ার জন্য প্রাণীদের যে আচরণ-প্রণালী রয়েছে তাকেই প্রয়োজন মতো বদলে নিয়ে, সংপরিবর্তিত (modify) করে নিয়ে বা অতিরঞ্জিত করে তুলে অন্য প্রাণীদের কাছে অর্থবহ বার্তা প্রেরণ করা বা তাদের যথাযথ আচরণ করতে প্ররোচিত করা সম্ভব। যেমন, পাখির গান সঙ্গীকে আহ্বান জানানোর কাজে লাগে, আবার সেই গানেরই সাহায্যে প্রতিপক্ষকে ভয় দেখিয়ে দূর করা যায়। জন ক্রিস্প যে অনবদ্য গবেষণা করেন, তা থেকে জানা যায়: মৌমাছিরা নাচের ছন্দের নিজস্ব ভাষায় বার্তা জ্ঞাপন করে, জানিয়ে দেয় কোন দিকে এবং কোথায় আছে মধু। প্রায় প্রতিটি সমাজবদ্ধ পশুরই কোনো না কোনো ভাষা রয়েছে, এই ধারণা গবেষণার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, কোনো কোনো ভাষা দৃশ্য বা ধ্বনির মাধ্যমে পরিবাহিত না হয়ে গন্ধের মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফেরোমোন, কিংবা খাদ্যের অস্তিত্ব বোঝাবার জন্যে পিঁপড়েরা যে বিশেষ ইঙ্গিত ব্যবহার করে তা এর উদাহরণ। এইসব গবেষণার গুরুত্ব খুবই বেশি। কেননা, এর ফলে যে কেবল স্নায়বিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধেই জ্ঞান বাড়ে তা নয়, মানুষের বার্তাবিনিময়ের উদ্ভব ও চরিত্র সম্বন্ধেও ধারণা স্পষ্ট হয়। বার্তাবিনিময়ের মধ্যে দিয়ে মানুষের যে সমাজ গড়ে উঠেছে ও দৃঢ়বদ্ধ রূপ ধারণ করেছে, সেই সমাজ সম্বন্ধেও ধারণা জন্মায় এর ফলে। আর সেই কারণেই, পশু আচরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষকে যেসব বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, তার সবটাই যে নিছক জটিল বৃত্তিপ্ররোচনের সমস্যা তা নয়। আসলে জ্ঞানচর্চার এই অঙ্গনটি এমন এক সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত যে এই ক্ষেত্রে মানুষের নিজস্ব চিন্তাভাবনার ও ভাষার অতীতরূপের অবশেষকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক বিচার করা শক্ত। শক্ত আরো এই কারণে যে, অতীত রূপের সেইসব অবশেষ মানবিকতা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

মনস্তত্ত্ব ও মনোরোগ-চিকিৎসা*

একই কথা আরো বেশি করে প্রযোজ্য মনের অসুখ সংক্রান্ত গবেষণার অগ্রগতি সম্বন্ধে। মনের অসুখ মানসিক ও দৈহিক উভয় রূপই পরিগ্রহ করতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রের যাবতীয় বিভাগের মধ্যে এটি নবীনতম এবং দুরূহতম। এক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিপুল আগ্রহ জেগেছে, কিন্তু বিরাট কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। বিতর্ক আর চলতি রেওয়াজ এই ক্ষেত্রটিকে ছেয়ে রয়েছে। একটা সময় অনেকেই বলতেন, ফ্রয়েডের কাজ আইনস্টাইনের আবিষ্কারের মতোই যুগান্তকারী। একটা নেতিবাচক অর্থে একথা অবশ্যই ঠিক। কেননা মনস্তত্ত্বের অঙ্গন থেকে বিপুল পরিমাণ দার্শনিক আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব। কিন্তু তার বদলে যা হাজির করা হলো তা নিছক আপাতত কাজ-চলার মতো কতকগুলো নবনির্মিত শব্দরূপ মাত্র। যথা: নির্জ্ঞান মন (unconscious), অদস্ (id), গুটিয়ে, অবদমিত ইচ্ছা। পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহের বুদ্ধিজীবী মহলে এসব শব্দ চালু হয়ে গেল। মনস্তত্ত্বের এই অধিবিদ্যক ভিত্তির কোনো অকাট্য পরীক্ষা-সমর্থিত প্রমাণ কিন্তু মেলেনি। মানসিক অসুখ সারানোর ব্যাপারে খাঁটি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব বা ঐ তত্ত্ব-ভিত্তিক অন্যান্য মনস্তত্ত্ব মোটেই আশানুরূপ ফল দেখাতে পারেনি। তবে একথা অবশ্য ঠিক, ঐ চিকিৎসার ব্যয় বহন করার ক্ষমতা যাদের আছে, ঐ চিকিৎসা তাদের খানিকটা সান্ত্বনা যোগাতে সমর্থ হয় কিন্তু মানসিক বৈকল্যের চিকিৎসার অন্য বিকল্পগুলোও ক্রমশই পরিত্যক্ত হতে থাকে— ওষুধ, কড়া বৈদ্যুতিক ও অস্ত্র-চিকিৎসা, শক্-চিকিৎসা, মস্তিষ্কের বিশেষ কোনো অংশ কেটে বাদ দেওয়া (lobectomy) ইত্যাদি। মস্তিষ্কের গঠন যে কত জটিল সেটা উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠার ফলেই ঐ সব বিকল্প পথ পরিত্যক্ত হচ্ছে। অপরদিকে, এ ব্যাপারটাও ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে যে, অন্যতম প্রধান মানসিক রোগ স্কিজোফ্রেনিয়া বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতার আদিক কারণ হলো স্নায়ু-রসায়নিক পরিবর্তন; তবে এর সূত্রপাত এবং প্রকোপবৃদ্ধি হয়তো বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। স্নায়ুতন্ত্রের আর স্নায়ু-রসায়নিক প্রক্রিয়ার এইসব পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জট ছাড়ানোর জন্য বিপুল উদ্যমে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

---

* মানসিক অসুখ। 'মনোরোগ-চিকিৎসার ক্ষেত্রে আজ কিছুটা অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছে।... ফ্রয়েডের মৃত্যুর পর থেকে এ ব্যাপারে যেটুকু পরিবর্তন এসেছে তা মূলত সামাজিক ক্ষেত্রে। স্নায়ুর মনোভাব এবং স্থিরনিশ্চিত ধারণা অতীতের মতো আর অত প্রবল নয়। মনোরোগ-চিকিৎসা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিভক্তরূপ করতে অধিকতর আগ্রহী। শুধু তাই নয়; যেসব মৌলিক সমস্যার সমাধান কিছুতেই করা সম্ভব হচ্ছে না, সে সব ব্যাপারে আগন অজ্ঞতাকে আরো সক্রিয়ভাবে উপলব্ধি করে নিচ্ছেন মনোরোগ-চিকিৎসকেরা। বিশ্লেষণীর আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে থেকে আজ যদি গ্রহণ করছেন তাঁরা, যথা: মৃগুত্ব, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং শর্তা।... সাম্প্রতিকালের যে ঘটনাটি সম্বন্ধে সবচেয়ে তা হলো আচরণবাদের (behaviourism) অবসানঘটন।... পরিবারের মূল কারণ ভিত্তিহীনে এই পুনরুদ্ধান ঘটেছে।' (ডেভিড. এইচ. ফ্রেডম্যান, Psychiatry, 1979, পৃ. 9-10 দ্রষ্টব্য)

মানুষের মন কতকগুলো স্নায়ুবর্তনীয় সমষ্টি মাত্র নয়; আত্মার আত্মা, প্রবৃত্তি, গুঁয়েষা ইত্যাদির মতো কতকগুলি নিরেট সত্তার (entelechies) আধারও নয়। আপন পরিপার্শ্বের মোকাবিলা করার জন্য মানুষ 'মন' নামক এই উপকরণটির উদ্ভব ঘটিয়েছে—একলা-মানুষ নয়, সমাজবদ্ধ মানুষ। এবং সেই পরিপার্শ্বও উত্তরোত্তর সমাজ-সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে। কাজেই মনস্তত্ত্ব যদি সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে তা দিগ্‌ভ্রান্ত হতে বাধ্য।

শ্রেণীসমাজে মনস্তত্ত্ব

মনস্তত্ত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখানে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মনস্তত্ত্ব বিষয়টির কিছু কিছু অংশ, যেমন সংবেদন-মনস্তত্ত্ব এবং স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ, মূলত জীববিজ্ঞানেরই অংশ, এবং খুব সম্ভব সেই পথেই তা বিকাশ লাভ করবে। তবে এ প্রসঙ্গে পাভলভ এবং তাঁর ঘরানার কাজকর্মকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যক্তিমানুষের জীবন ও অনুভূতির ওপর সমাজ যেভাবে প্রতিফলিত হয়, সেটাই হচ্ছে মনস্তত্ত্বের প্রধান অংশ। ব্যক্তিমানুষকে সমাজ যেমন গড়ে তোলে, তেমনি ব্যক্তিমানুষও আবার সমাজকে কল্যাণের কাজে অবদান রাখে। পুঁজিতান্ত্রিক দেশের আধুনিক মনোরোগ-চিকিৎসায় মনোবিকলন, ওষুধ বা শল্যচিকিৎসার সাহায্যে ব্যক্তির ওপর সমাজের কু-প্রভাবের কিছু কিছু উপশম ঘটানো সম্ভব হলেও সমস্যার মূলে পৌঁছনো তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে-বিজ্ঞানের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এইসব পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো হয়, তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধতার যাবতীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট। একদিকে ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল বিমূর্ত যুক্তিধারা, অন্যদিকে বিশুদ্ধ জীববৈজ্ঞানিক সাদৃশ্যসন্ধান—এই দুটি পথই মনস্তত্ত্বে গুরুতর ভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। এইসব ভ্রান্তি থেকে মুক্ত না হলে পূর্বোক্ত সীমাবদ্ধতা থেকেও মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

অনুবাদ : আশীষ লাহিড়ী

বিজ্ঞানের ইতিহাস

মানবমন : বিশেষ সংখ্যা

বিজ্ঞানের শতাব্দী : শতাব্দের বিজ্ঞান

একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে গত একশো বছরে মানবমন তার মহত্তম কীর্তির পরিচয় রেখেছে বিজ্ঞানে। আবার একই সঙ্গে মানুষের কঠিনতম দুঃখেরও কারণ হয়েছে এই বিজ্ঞান। বিশ শতাব্দী তাই একাধিক অর্থেই বিজ্ঞানের শতাব্দী।

বিশ শতক ফুরোলো। স্বভাবতই ইচ্ছে হয় বিজ্ঞানের একটা 'শতক-তামামি' নিতে। বিজ্ঞানবাহিত হয়ে গত একশো বছরে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছলাম আমরা? কোন কোন আবিষ্কার এই শতককে অমর করে রেখে দিল? কোন কোন বাঁকে তা মরণের তরঙ্গের দুঃস্বপ্ন হয়ে রইল? সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতির সঙ্গে কোন অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা পড়ল বিশ শতকের বিজ্ঞান? কোনখানেই বা কেটে গেল তার? মানবমনকে কতটুকু আলোকিত করতে পারল এই শতকের বিজ্ঞান?

এই সমস্ত প্রশ্নের সুবিন্যস্ত আলোচনা নিয়ে 2000 সালের প্রথম বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে

মানবমন বিশেষ সংখ্যা - বিজ্ঞান ও বিশে শতাব্দী

এই সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ হল : বিশ শতকে বিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাস নিয়ে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম -এর একটি রচনার বঙ্গানুবাদ। এছাড়া থাকছে বিজ্ঞানের ইতিহাস, মার্কস-এর বিজ্ঞানভাবনা, বিজ্ঞানের দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক রচনা। বহু যত্নে সংকলিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের একটি বর্ষানুক্রমিক পঞ্জি এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

বিজ্ঞানের বিশে শতাব্দীকে জানতে হলে মানবমন পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটি আপনাকে পড়তেই হবে।

পাভলভ আর ব্রিশ্‌ট্‌

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান কি নন্দনতত্ত্ব আলোচনার কোনো কাজে লাগতে পারে? আলাদা করে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা চোখে পড়ে নি। তবে, বের্টল্ট ব্রেশ্‌ট্‌ (1898-1956) -এর নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা বুঝতে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান খুবই সাহায্য করে অনেকদিন থেকেই কথাটা মনে হয়েছে। অন্যত্র এ বিষয় কিছু লিখেওছি।[১] এখানে সে-নিয়ে আরও দু-চার কথা বলা যাক।

একটু পেছন থেকে শুরু করলে সুবিধে হবে। মানুষের ভাষাকে পাভলভ বলেছিলেন তার দ্বিতীয় সঙ্কেততন্ত্র, (সেকেণ্ড সিগন্যালিং সিস্টেম)। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে সঙ্কেততন্ত্র একটাই— ইন্দ্রিয়গত; তার ভেতর নিয়েই শর্তাধীন পরাবর্ত (কণ্ডিশনড্‌) রিফ্লেক্স গড়ে ওঠে। কিন্তু ভাষা হলো মানুষের নিজস্ব উদ্ভাবন; তার মস্তিষ্কেই এর ব্যবস্থা আছে। প্রকৃতির আর সব দানের (ইন্দ্রিয়, অনুভব, আবেগ ইত্যাদি) সঙ্গে একেএক করা যায় না। অথচ ভাষার সাহায্যে যে শর্তাধীন পরাবর্ত গড়া যায়, সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় — এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না। মানুষের সমাজজীবনে প্রতিনিয়ত অনুরোধ/আদেশ করা/ শোনা আর সেই অনুযায়ী সেগুলো রক্ষা/পালন করা— চব্বিশ ঘণ্টার অনেকটাই আমরা এই করে কাটাই। মুখের কথায় বা হাতের লেখায় যা করতে বলা হয়েছে সেই মতো চলাই সমাজের রীতি।

ভাষা বিষয়ে পাভলভ-এর ধারণার সমালোচনা, করে বলা হয়েছে: ভাষাকে শুধু শর্তাধীন পরাবর্ত বলে ধরলে তার প্রতি সুবিচার করা হয় না। যে-কোনো চুক্তিপত্র বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খাড়া করার সময়ে পরাবর্ত গড়া তার উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না।[২] ডেভিড গ্রে-র মনে হয়েছিল : মানুষের মন-এর একটা বস্তুবাদী ভিত্তি দেওয়ার জন্যেই পাভলভ এই তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন।

আসলে, ভাষার ক্ষেত্রে, স্তালিন যেমন বলেছিলেন, গোটা মানুষ-প্রজাতিই তার আলোচনার বিষয়। হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় ও উদ্যোগে তার এই দ্বিতীয় সঙ্কেততন্ত্র ব্যবহারে লেগেছে। তার ভূমিকা যত বিভিন্ন ও বিচিত্রই হোক, মূলে তার কাজ : এক-একটি জনগোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে সহযোগ গড়ে তোলা ও রক্ষা করা। এটি সৃষ্টি হয়েছে, শ্রেণীপূর্ব সমাজে। গোটা জনগোষ্ঠীর এটি সাধারণ (কমন) সম্পত্তি। পরে সমাজে শোষক-শোষিত শ্রেণীবিভাগ দেখা দিলেও, শ্রেণীপূর্ব সমাজের থেকে পাওয়া এই উত্তরাধিকার সমস্ত শ্রেণীর ওপরেই বর্তেছে। ভাষা সম্পর্কে যাবতীয় ইনফিলাবি মতবাদ খারিজ করে দিয়ে স্তালিন তাই বলেছিলেন : "ভাষায় ''শ্রেণীচরিত্র'' সূত্রটি ভুল ও অ-মার্কসবাদী।'[৩]

তবে এও ঘটনা যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ভাষা তথা সাহিত্য, শাঁখের করাতের মতো, দু দিকেই কাটে। ভাষা দিয়েই চলে শাসন-শোষণের নিভাতা প্রচার; আর সেই সঙ্গে, শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাকও দেওয়া হয় ভাষা দিয়েই। ভাষাই মানুষকে কল করার অন্যতম মাধ্যম; অন্যের হাতে সেটিই আবার বাঁধন কাটার অস্ত্র।

শ্রেণীসমাজের সঙ্গে মানুষকে খাপ খাওয়ানো আর তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো— দু কাজেই তাই ভাষার ভূমিকা অসীম। বক্তৃতা, ইস্তেহার ইত্যাদি দিয়ে যেমন সংকল্প করা হয়, সাহিত্যও তেমনি সে-কাজে লাগে। একদিকে তা মানুষকে স্থিতাবস্থা মেনে নিতে শেখায়, আবার যথাস্থিতিবাদের বিপক্ষে পরিবর্তনের বিপক্ষেও দাবি ওঠে ভাষা দিয়ে, বিপক্ষেও দাবি ওঠে ভাষা দিয়েই। সেই অনুযায়ী নন্দনতত্ত্বেও স্থিতি-গতির ধারণা মেয়।

আরিস্তোতল-এর ভাবমোক্ষন(কাথারসিস) তত্ত্ব এর এক চমৎকার নমুনা। কোনো শুরু গম্ভীর নাট দেখতে দেখতে দর্শকের মনে একই সঙ্গে ভয় ও করুণা (আর সেই সঙ্গে ঐ জাতীয় অন্যান্য অনুভূতি) জাগে। কিন্তু নাটকের শেষে ঐ বাড়তি ভয় করুণা ইত্যাদি বেরিয়ে যায় — মোক্ষন হয়, অর্থাৎ সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। — এই ছিল আরিস্তোতল -এর মত। আমাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই, জ্যোতি ভট্টাচার্য লিখেছেন:

ট্রাজেডি আবেগের উদ্গম ঘটিয়ে, উত্তেজনা জাগিয়ে তার নিষ্কাশনও ঘটায়। ফলে শ্রোতা, দর্শক বা পাঠকের মনে আসে এক আবেগমুক্ত স্থির শান্ত অবস্থা। এই অবস্থার নাম হল স্টাসিস (stasis), অচঞ্চল সমাহিত স্থিতি। একটু ভাবলে মনে হয় যে এরকম স্থিরত্বকে আরিস্টটল মঙ্গলকর ও সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। আমাদের এখনকার বিবেচনায় যে সমাজ সুস্থিত ও সুস্থ সেখানেই সামাজিক মানুষদের এরকম অচঞ্চল স্থিতি বাঞ্ছনীয় হতে পারে। কিন্তু যে সমাজ সংকটগ্রস্ত নানা বৈষম্যে, যে সমাজ ভারসাম্যহীন, প্রতিনিয়ত নানা অন্যায় ও অবিচার এবং অত্যাচার যে সমাজে ক্রমাগত অস্থিরতার জন্ম দেয়, সেরকম সমাজেও কি মানুষের ওরকম অচঞ্চল শান্ত অবস্থিতি বাঞ্ছনীয়? ও রকম সমাজে যে নাটক মানুষের 'ভয়, করুণা এবং ক্রোধ ইত্যাদি আবেগকে নিষ্কাশিত করে নির্বিকার নৈষ্কর্ম্যে স্থিত রাখার চেষ্টা করে, সে নাটককে রক্ষণশীল বললেও যথেষ্ট হয় না, প্রতিক্রিয়াশীল বলতে হয়। নাটক মানুষকে শুদ্ধ করে উজ্জীবিত করুক, সঞ্চালিত করুক, — এটাই আমরা চাইব।'

আরিস্তোতল-এর ধারণার দিক থেকে উল্টোদিকে ব্রেশ্ট্ এর কথা ভাবা যায়। মনকে শান্ত করা নয়, দ্বন্দ্বে মুখর আর সমাধানের সন্ধানে উদ্গ্রীব করে তোলাই ব্রেশ্ট্-এর, নাটকের লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে স্থিতি-র চেয়ে গতি, 'কাইনেসিস'-ই শিল্পের বাঞ্ছিত পরিণাম। নাটককে ব্রেশ্ট্ করতে চেয়েছিলেন এই লক্ষ্যমুখী।

শর্তাধীন পরাবর্ত-র মূল কথাই হলো: স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ছাড়িয়ে, নতুন সঙ্কেত দিয়ে নতুন পরাবর্ত গড়ে তোলা। নাটকে আবেগকে এ কাজ লাগানো হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। ব্রেশ্ট্ লক্ষ্য করেছিলেন, আবেগের টানে দর্শক নিজেকে এক করে ফেলে নায়ক-নায়িকার সঙ্গে (একে বলে: সমানুভূতি, এমপ্যাথি)। ধর্ম-র মতো শিল্পসাহিত্যও লোককে করে তোলে আবেগে উদ্বেল, তার পরেই আবার যে-কে-সেই।

ব্রেশ্ট্ তাই দর্শককে সজাগ রাখতে চাইলেন, তাঁর নাটকের আবেদন শুধু আবেগের কাছে, যুক্তির কাছে। বিচারবুদ্ধিতে আঘাত দিয়ে তিনি তাকে সচেতন করতে চাইতেন। দ্বিতীয় সঙ্কেততন্ত্র মারফত তার কাছে পৌঁছে দিতে চাইতেন স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে, পরিবর্তনের গতিময় বার্তা।

ব্রেশ্ট্ -এর লেখাপত্রে পাভলভ-এর দু-চারটি বিক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে।[১] পাভলভ-এর মতামত কতটা সচেতনভাবে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন তা আরও খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার। তবু, দুজনের মনোভাবে একটা মিল ধরা পড়ে— এই টুকুই দেখাব।

1. বিট্-টা ব্রেশ্ট্ : প্রয়োজনের নন্দনতত্ত্ব, কলকাতা :

অনুষ্টুপ, 1999. পৃ. 63 দ্র।

2. Geffrey A. Gray, *Pavlov*, London :

Fontana Paperbacks, 1979. P. 137

3. G. V. Stalin, *Marxism and Problems of Linguistics*, Peking : Foreign Languages Press, 1979. P. 20 এ ছাড়া Harry K. Wells, *Ivan P. Pavlov. Towards a Scientific Psychology and Psychiatry*, New York: International Publishers, [1956] PP. 77.87 দ্রা।

4. Aristotle, Poetics, ed. D. W. Lucas. Oxford : Clarendon Press, 1988, 6. 1449 b 28.

'কাথারসিস' বলতে আরিস্তোতল ঠিক কী বুঝিয়েছেন তাই নিয়ে অবশ্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও মতের মিল হয় নি।

5. জ্যোতি ভট্টাচার্য, নন্দন তত্ত্ব ও মার্কসবাদ, কলকাতা অগ্রণী বুক ক্লাব, 1995, পৃ 73-74

6. Bertolt Brecht, *Messingkauf Dialogues*, London: Methuen, 1965, 33; *On Theatre*, New Delhi : Radha Krishna Prakashan, 1979, P 50 দ্র।

পাভলভ : তাঁর জীবন ও মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা

জর্জ উইণ্ডহোল্ড

[আইভান পি. পাভলভ (1849 - 1936) 1860-এর দশকে যখন Riazen Ecclesiastic Seminary -তে পড়াশুনা করছিলেন, সেই সময় প্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য দেশের অগ্রগতির রুশিয়ান অনুবাদ, বিশেষ করে যেগুলো ডারউইনের মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল, তার দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই প্রভাবে তিনি চার্চের কেরিয়ার পরিত্যাগ করলেন। 1875 সালে তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গের ইম্পিরিয়াল মিলিটারী মেডিক্যাল একাডেমির শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। সেখানেই তিনি পরিপাকতন্ত্রের ক্রিয়ার উপর গবেষণা করেন (যার জন্য তিনি 1904 সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)। 1901 সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী 35 বৎসর প্রধানত লালাগ্রন্থির শর্তাধীন পরাবর্ত প্রক্রিয়া ব্যবহার করে তিনি একের পর এক পরীক্ষামূলক ফলাফল সংগ্রহ করলেন। উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপের তত্ত্ব গঠনের জন্য ঐ ফলাফলগুলি যথেষ্ট ছিল। ঐ তত্ত্বের দ্বারা বাইরের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে শরীরযন্ত্রের জটিল খাপখাইয়ের অভিযোজনের ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করা গিয়েছিল। মূলত মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব হলেও এটি নিজেকে বিবৃত করেছিল অপরিবর্তনীয় সহজাত প্রবৃত্তি, ব্যক্তিত্বের টাইপ, জ্ঞান- আহরণ প্রক্রিয়া এবং অভিযোজনের প্রকৃতিগুলোকে 'ডায়নামিক স্টিরিও টাইপের' বলে ব্যাখ্যা করা, তাছাড়া অস্বাভাবিক আচরণের প্রকৃতি, বাধাজনিত বৈশিষ্ট্য এবং স্নায়ুরোগ এবং উন্মাদরোগের উৎপত্তির ব্যাখ্যায়। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি তাঁকে কমিউনিস্ট রাজত্বকালের সমালোচনা করার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণের মানবিক অধিকার রক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদানের পক্ষ সমর্থনে সাহায্য করেছিল।]

1904 সালে দি ফ্যাকাল্টি অফ দি রয়্যাল ক্যারোলিনিয়ান মেডিক্যাল-সার্জিক্যাল ইনস্টিটিউট আইভান পি. পাভলভকে (1849-1936) শারীরবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে। এই পুরস্কার পাভলভের পরিপাক ক্রিয়ার উপর বৈজ্ঞানিক কাজের স্বীকৃতির জন্য। যদিও সেইসময় পাভলভ উচ্চতর স্নায়ীজগতের জটিল মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের দিকে আগ্রহী ছিলেন। তিনি নিজেকে শারীরবিজ্ঞানী বলেই মনে করতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর গবেষণা ছিল এক মনস্তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা।

পাভলভের বংশপরিচয় ও যৌবনকাল

পাভলভের পূর্বপুরুষ ছিলেন পাভেল নামে এক রাশিয়ান ভূমিদাস। তিনি ঐতিহাসিক রিয়াজান শহরের কাছে এক জমিদারের তালুকে বাস করতেন। পাভলভের প্রপিতামহ রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের একজন কর্মচারী হওয়ার পরে পাভলভের পরিবার ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পান। পরবর্তীকালে পাভলভ পরিবার সামাজিকভাবে এগিয়ে যেতে থাকেন, প্রতিটি প্রজন্ম চার্চের শ্রেণী কাঠামোর উপরের দিকে উঠতে থাকেন। পাভলভের পিতা পিটার যাজক হয়েছিলেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। পাভলভের মা, বারবারা ছিলেন যাজক কন্যা। তিনি নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁর তৃতীয় সন্তানের মৃত্যুর পর তিনি স্নায়বিক বিপর্যয়ে ভুগছিলেন। সম্ভবত পাভলভের মনস্তত্ত্বের প্রতি সমস্ত জীবনব্যাপী আগ্রহ তাঁর মা'র ঐ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। প্রথাগতভাবে যাজকদের পুত্ররা চার্চেই যোগ দেন। সুতরাং 1860-এর দশকে পাভলভ রিয়াজান একেলিয়াস্টিকাল সেমিনারীতে যাজকত্ব লাভের জন্য পড়াশুনা করেন। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে তিনি ভাল শিক্ষালাভ করেছিলেন, কারণ সেই সময়কার রাশিয়ান সেমিনারীগুলিতে ধ্রুপদী সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্বের উপর জোর দেওয়া হত। তারপর 1860-এর দশকে রুশ সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক কাজগুলি রুশভাষায় প্রকাশের অনুমতি দান করা হল। রিয়াজানের পাবলিক লাইব্রেরীতে পাভলভ শারীরবিজ্ঞানের সহজলভ্য সংস্করণ ও ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব পড়লেন। বহু বৎসর পরে তিনি স্মৃতিচারণ করেন যে ঐ বইগুলি পড়বার পরে তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। চার্চের কেরিয়ার পরিত্যাগ করে তিনি 1870 সালে সেণ্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অফ দি ফিজিক্যাল ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্সেস থেকে গ্র্যাজুয়েশন পাশ করেন। 1883 সালে তাঁকে ইম্পিরিয়াল মিলিটারী-মেডিক্যাল একাডেমির পক্ষ থেকে এম. ডি. ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

জীবনে কিছুটা পরের দিকেই (1890 সালে) 41 বৎসর বয়স্ক পাভলভ সেণ্ট পিটার্সবার্গের ইম্পিরিয়াল মিলিটারী মেডিক্যাল এ্যাকাডেমিতে ফার্মাকোলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে 1895 সালে শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অতঃপর 1901 সাল থেকে পরিপাকতন্ত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ লালাগ্রন্থির শর্তাধীন পরাবর্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ অনুসন্ধানের দিকে সঞ্চালিত হয়।

পাভলভের গবেষণাগারে লালা নিঃসরণের শর্তাধীন পরাবর্ত ক্রিয়া

পাভলভ বেশ কয়েকটি শারীরবৃত্তের গবেষণাগার পরিচালনা করেছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল সেণ্ট পিটার্সবার্গের ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন। 1897 থেকে 1936 সাল পর্যন্ত অন্ততঃপক্ষে 146 জন পাভলভিয়ান বা পাভলভের অনুগামী গ্রাজুয়েট ছাত্র এবং কয়েকজন স্থায়ী সহকর্মী, পশুর মস্তিষ্কের কার্যাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তাঁরা সাধারণতঃ পাভলভের নির্দেশ অনুসারে গবেষণা চালাতেন। পাভলভ নিজে খুব কমই গবেষণা করতেন, পরিবর্তে তিনি প্রতিটি গবেষকের কাজ তদারক করা বেশি পছন্দ করতেন। পূর্বনির্দিষ্ট গবেষণার ব্যবস্থাপত্র ভঙ্গ করলে তাঁর ক্রোধের উদ্রেক হত। যদিও পাভলভের অনুগামীদের স্মৃতিকথায় তাঁর প্রশংসা আছে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কিন্তু এই ঘটনাগুলিকে পাভলভের আবেগপ্রবণতার বিস্ফোরণ বলে উল্লেখ করেছেন। পাভলভ ডারউইনের 'অস্তিত্বরক্ষার জন্য সংগ্রামের তত্ত্ব' এবং এর প্রয়োগিক অর্থ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। 1890-এর বছরগুলিতে তিনি এই ধারণা করলেন যে প্রাণীদের পরিপাকতন্ত্রের উপরের অংশে বিশেষ খাদ্যের জন্য বিশেষভাবে সাড়া দেয়। যেমন ভেজা খাবার (মাংস) হলে কম লালা নিঃসরণ এবং শুকনো খাবার (রুটি জাতীয়) হলে বেশি লালা নিঃসরণ হয়। পাভলভের ছাত্র ভলফসন 1897-য় ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিনে এই ধরনের পরীক্ষা করেন। পাভলভের ধারণার স্বপক্ষে গবেষণামূলক সমর্থন পাওয়া ব্যতীত ভলফসন পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই লক্ষ্য করলেন যে ভিজে ও শুকনো খাবার গ্রহণের পরে যে সব কুকুরকে দূর থেকে ঐ সব খাবার দেখিয়ে লালায়িত করা হয়েছে তারা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়েছে, কিন্তু লালা নিঃসরণ কম হয়েছে। দূর থেকে দেখানো উদ্দীপকের প্রতি লালা নিঃসরণ ব্যতিক্রম বা নিয়মবহির্ভূত। কারণ কার্তেজীয় (Cartesian) পরাবর্তমূলক ধারণা অনুযায়ী প্রাণীর সংজ্ঞাবাহী গ্রাহকপ্রান্ত এবং বাইরের বস্তুর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রয়োজন। পাভলভ উপলব্ধি করলেন যে যদিও পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর অভিযোজনের পক্ষে লালা নিঃসরণের শারীরবৃত্তিক গুরুত্ব খুব কম, তা হলেও এটির উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়া বেশ মনোযোগ আকৃষ্ট করার মতই—যা কিনা মস্তিষ্কের স্নায়ুসংক্রান্ত প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ রূপকে প্রকাশ করে। স্বাভাবিক প্রাণীর গুরুমস্তিষ্কের কার্যপ্রক্রিয়ার সমীক্ষার জন্য যথাযথ এবং সংবেদী লালা নিঃসরণের মত শর্তাধীন পরাবর্তের ব্যবহারের বৈপ্লবিক গুরুত্ব ছিল। কারণ গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্ম অনুসন্ধানের জন্য আগে যে-প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হত তাতে অচেতন বা অবশ-করা প্রাণীর থেকে সেই প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হত।

উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলী সম্পর্কে পাভলভের তত্ত্ব

1897 থেকে 1936 সাল পর্যন্ত লালা নিঃসরণ-মূলক শর্তাধীন পরাবর্ত নিয়ে অন্ততঃপক্ষে 532 টি গবেষণাপত্র পাভলভের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়। এতে যা আবিষ্কৃত হল তার উপর ভিত্তি করে পাভলভ উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলীর তত্ত্ব গঠন করলেন। ক্রমঃপরিবর্তনশীল, বাইরের, বিশেষ করে সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের ফলে উচ্চতর প্রাণীদের মস্তিষ্কের জটিল কাজকর্ম ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছিল এই তত্ত্ব। বিপরীতক্রমে নিম্নতর প্রাণীদের স্নায়বিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রে আমরা তাদের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের সংহতি সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করতেই দেখে থাকি।

পাভলভ দাবি করেছিলেন যে তাঁর তত্ত্ব পুরোপুরি খাঁটি শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ-সঞ্জাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল এটি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত এক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব। প্রথমটি হল আচরণগত স্তর, যা বাইরের পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর দৃষ্টিগোচর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। দ্বিতীয়টি হল মনস্তাত্ত্বিক স্তর, যাতে আছে মস্তিষ্কের স্নায়বিক উত্তেজনামূলক ও নিস্তেজনামূলক ক্রিয়াকলাপের এক জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া, যা বিস্তৃত হয় ও তারপর মূল বিস্তরণের ক্রিয়াকেন্দ্রগুলিতে ঘনীভূত হয়। তৃতীয় স্তর হল সচেতন স্তর, যেটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে একীভূত হলেও প্রাণীটি তা বিষয়ীগতভাবে অনুভব করে।

পাভলভীয় পরীক্ষণ পদ্ধতি

1906 সালে কাজ আরম্ভ করেন ভলফসন। তাঁর শর্তাধীন প্রক্রিয়ার নাম ছিল স্বাভাবিক শর্তাধীন পরাবর্ত। অপরপক্ষে বন্‌দিরেভের শর্তাধীন প্রক্রিয়া ছিল কৃত্রিম শর্তাধীন পরাবর্ত। পাভলভের অনুগামীদের মতে ভলফসনের শর্তাধীন প্রক্রিয়ার উদাহরণ প্রণালীগতভাবে সীমাবদ্ধ। কারণ শর্তহীন উদ্দীপক (যেমন মুখে রুটি থাকা) এবং শর্তাধীন উদ্দীপক (রুটি দেখা) একই রকম, সুতরাং জটিল পরীক্ষাতে পরেরটিকে স্বাধীন Variable হিসাবে ব্যবহার সীমাবদ্ধ বা সীমিত। তবে বন্‌দিরেভ দেখেছিলেন যে কোন মৌলিক নিরপেক্ষ উদ্দীপক যদি ঠিক পরপর শর্তহীন উদ্দীপকে (যেমন খাবার জিনিষ) অনুষঙ্গিত হয় তবে তা শর্তাধীন উদ্দীপকে পরিণত হয়ে লালা নিঃসরণ করাতে পারে। বন্‌দিরেভ-এর লালা নিঃসরক শর্তাধীন পরাবর্তের উদাহরণ বহুমুখী ছিল, কারণ যে কোন সংবেদী ধারা থেকে আসা কোন পছন্দসই উদ্দীপক পাভলভের লালা নিঃসরক শর্তাধীন পরাবর্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে স্বাধীন Variable হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারত।

মোটের উপর পাভলভ বিশ্বাস করতেন যে প্রাণীর টিকে-থাকা নির্ভর করে ক্রমপরিবর্তনশীল পরিবেশের প্রতি তার শর্তহীন সাড়া দেওয়ার উপর। প্রজাতির টিকে-থাকা বেড়ে যায় ঐ পরিবর্তিত পরিবেশে শর্তাধীনভাবে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতার প্রয়োজন- মত গ্রহণ ও বর্জন দ্বারা। বোঝা যায় যে লালা নিঃসরক শর্তাধীন পরাবর্তের সাহায্যে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনকে সর্বাপেক্ষা ভালভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব। কেননা ল্যাবরেটরির বাইরের পরিবেশের প্রতি ক্রমাগত সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়ার গ্রহণ ও বর্জন এবং শর্তাধীন পরাবর্ত যে অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণ করা যায় ও সহজেই মুছে ফেলা যায়, গবেষণা দ্বারা লব্ধ সেই ফলাফল হল সমার্থক।

পাভলভের জীবনের শেষ ছয় বৎসর পাভলভের অনুগামীরা অন্তর্ভাবী মনস্তত্ত্বের বিষয়ে কেন কিছু পরীক্ষা সংঘটিত করেছিলেন। পাভলভ তাঁর ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মনোরোগ চিকিৎসকদের সহযোগিতায় এই গবেষণা পরিপূরণ করেছিলেন এবং লেনিনগ্রাডের দুটো ক্লিনিকে তিনি বায়ুরোগ ও উন্মাদরোগের ওপর কাজ করেন।এই পর্যায়ে তাঁর কার্যপ্রণালী ছিল রোগীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া এবং তাদের আচার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা।

পাভলভ লালানিঃসরক শর্তাধীন পর্রাবর্তের পরীক্ষার যাদের নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তারা ছিল অবশ্য কুকুর, কিন্তু 1930 সাল নাগাদ পাভলভের গবেষণাগারে দুটো শিম্পাঞ্জিও পাওয়া গেল। পাভলভ 'সমস্যা সমাধানে'র পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞানী কোয়েলারের স্বজ্ঞা প্রভাবিত ব্যাখ্যার সমালোচক ছিলেন। তিনি সফলভাবে কোয়েলারের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেন। এই পরীক্ষাতে একটা নরবানরকে বিভিন্ন আকারের বাক্স দিয়ে একটা মিনারের মত তৈরি করে ঝুলন্ত টোপের নাগাল পেতে হত। নরবানরটির ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে পাভলভ লক্ষ করলেন যে টোপের নাগাল পাবার সমস্যার সমাধানের পথ পেতে এর কেন কয়েক মাস সময় লেগেছিল। তাকে বাক্সগুলিকে সরাসরি টোপটার নিচে আনতে হল, কোনাকুনিভাবে ছোটগুলির নিচে বড়গুলিকে সাজাতে হল, তারপর ওটা মজবুত হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য সবচেয়ে উপরের বাক্সটির উপর উঠে সামনে পিছনে দুলে দুলে দেখতে হল। পাভলভ এই প্রক্রিয়ার নাম দিলেন 'বিশৃঙ্খলা প্রণালী'। তিনি মনে করলেন যে এই প্রক্রিয়া থর্নডাইকের 'প্রয়াস ও প্রমাদ' প্রণালীর সমতুল্য।

সহজাত প্রবৃত্তি এবং ব্যক্তিত্বের টাইপ

বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীন পরিবেশের উদ্দীপনায় প্রাণীর সাড়া দেওয়ার ওপরে বলা যায় সহজাতভাবে পূর্বনির্ধারিত আচরণ বা শর্তহীন পরাবর্ত। এগুলি জটিল হলে তাকে পাভলভ বলেন সহজাত প্রবৃত্তি। পাভলভ কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি সনাক্ত করলেন। এদের মধ্যে দুটি প্রবৃত্তি ব্যক্তির জীবৎকালে টিকে থাকার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল পৌষ্টিক বা খাবার সন্ধানী প্রবৃত্তি যা প্রাণীকে খাদ্যসন্ধান ও খাদ্যগ্রহণে প্রবৃত্ত করে এবং অন্যটি হল আত্মরক্ষামূলক প্রবৃত্তি যেটি ক্ষতিকর উদ্দীপক এড়িয়ে যেতে দেখায়। যৌনপ্রবৃত্তি প্রজাতির বংশগতিতে ধারাবাহিক ওপাকলী বজায় রাখার জন্য আবশ্যকীয়। গবেষণাগারের প্রাণীদের সার্বিক ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করার সময় পাভলভ প্রত্যেকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য (ব্যক্তিত্বের টাইপ) লক্ষ করলেন। ঐ ব্যক্তিত্বের টাইপের স্নায়বিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনটি মানদণ্ড ছিল— প্রথমত উত্তেজনা ও নিস্তেজনার গভীরতা বা শক্তির মাত্রা; দ্বিতীয়ত উত্তেজনা ও নিস্তেজনার মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তৃতীয়ত এই প্রক্রিয়াগুলির দ্রুত ছড়িয়ে

পড়ার ক্ষমতা। যদিও এই মানদণ্ডগুলির সহজ বিন্যাস করে অনেক রকম ব্যক্তিত্বের টাইপ তৈরি হতে পারে। পাভলভ তাঁর মতে চারটি টাইপ পর্যবেক্ষণ করলেন যা হিপোক্রেটিসের 'হিউমারের' সমতুল্য, - যেমন— কোলেরিক, মেলানকলিক, স্যাংগুইন এবং ফ্লেগম্যাটিক টাইপ।

প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র

পাভলভের তত্ত্বে প্রাণীদের শর্তহীন পরাবর্ত, যার উৎপত্তি হয় মস্তিষ্কের অধঃস্তর বা লঘু মস্তিষ্কের অঞ্চলে, সেটি বাইরের পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা তাৎক্ষণিক সংস্পর্শে এলে জেগে ওঠে। বিপরীতক্রমে শর্তাধীন পরাবর্ত, যার অবস্থিতি গুরু মস্তিষ্কের অঞ্চলে, সেটি জেগে ওঠে বাইরের পরিবেশ থেকে উদ্ভূত সংকেত দ্বারা, এবং সেই কারণেই প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র গঠন করে। যেহেতু পরিবেশ ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, পরিবেশ থেকে আসা সংকেতের প্রতি প্রতিক্রিয়ার গ্রহণ ও বর্জন দ্বারা প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র প্রাণীটিকে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে সাহায্য করে। যাই হোক, যেহেতু মানুষের পরিবেশ বেশির ভাগই সামাজিক, তাই অভিযোজনকে ভাষা বা দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রে বর্ধিত করা যায়। পাভলভের কথায় যা এইরকম : 'ভাষা, বিশেষতঃ বাক্‌যন্ত্রাদির যে kinesthetic উদ্দীপনা মস্তিষ্কে এসে পৌঁছায় তা হল দ্বিতীয় সংকেত, সংকেতের সংকেত। এগুলি বাস্তবের বিমূর্তীকরণ করে ও সামান্যীকরণ সম্ভব করে। যার ফলে আমাদের নিজস্ব, বিশেষ করে মানবিক উচ্চতর চিন্তা গঠিত হয়।'

পাভলভের মতে প্রথম অথবা দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের প্রাধান্য অনুসারে মানুষকে দুটি প্রধান টাইপে ভাগ করা যায়। প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রের প্রাধান্য যাদের বেশি তাঁদের বলা যায় আর্টিস্টিক বা শিল্পী টাইপ, যা তাদের আচরণে দেখা যায়। অপর পক্ষে দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের প্রাধান্য বেশি যাদের মধ্যে, তাঁরা হলেন বাগ্মিতা বা চিন্তাশীল টাইপ। প্রতিটি টাইপের পৃথক পৃথক স্নায়ুরোগের দিকে ঝোঁক থাকে।

স্বভাবী আচরণ : সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা

পাভলভের মতে পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা জটিল ব্যবহার অর্জিত হতে পারে অথবা সংশোধিত হতে পারে। 1930-এর বৎসরগুলিতে পাভলভ বললেন যে, এই ধরনের ব্যবহারগত ক্রিয়াগুলি গঠিত হয় বহুসংখ্যক উদ্দীপক দ্বারা—যে-উদ্দীপকগুলি ইন্দ্রিয়ে আঘাত করে এবং তারপর মস্তিষ্কবল্কলে প্রবেশ করে। "সেখানে তারা মুখোমুখি হয়, পরপর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, পারস্পরিক ক্রিয়া করে ও অবশেষে সুসম্বদ্ধ হয়, এবং শেষে 'ডায়নামিক স্টিরিওটাইপ' আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়।" ডায়নামিক স্টিরিওটাইপ তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন প্রতিটি উদ্দীপক এক-একটি শর্তহীন উদ্দীপক দ্বারা অনুসঙ্গিত হয়ে মস্তিষ্কবল্কলে খুব কম সময়ের মধ্যে পরপর প্রবেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপককে, যেমন শব্দ অথবা আলোকে জোরদার করার জন্য অন্য কোন শর্তহীন উদ্দীপককে সুসম্বদ্ধ ভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন ঐ উদ্দীপকগুলি স্নায়বিক স্তরে সুসন্নিবদ্ধ একক উদ্দীপক-সমষ্টি তৈরি করে। ডায়নামিক স্টিরিওটাইপের পরীক্ষা নিরীক্ষা হল এই রকম— ঐ উদ্দীপক সমষ্টির মধ্যে কোনো একটি উদ্দীপক কি সমষ্টির যাবতীয় সাড়া জাগাতে পারছে? যদি একটি উদ্দীপকই সমস্ত উদ্দীপক সমষ্টির সাড়া জাগাতে পারে, তবে ডায়নামিক স্টিরিওটাইপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা বলা যায়। যদি এটা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে প্রাত্যহিক জীবনে একজন ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া ডায়নামিক স্টিরিওটাইপের সমস্ত ব্যবহারগুলির অন্তর্গত। সুতরাং সুপ্রতিষ্ঠিত অভ্যাসই ডায়নমিক স্টিরিওটাইপ। উপরন্তু ব্যক্তির অভিযোজন ক্ষমতা বর্ধিত হয়, কারণ ডায়নামিক স্টিরিওটাইপ একটি পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অন্যটির থেকে সামান্যীকরণ করে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য নির্দেশ করে এবং স্টিরিওটাইপটি বর্জিত হয় যদি এর ক্রিয়াকলাপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা প্রণোদিত না হয়।

মস্তিষ্কবল্কলের উত্তেজনা প্রসার মানুষের ব্যবহারকে উদ্দীপিত করে ও বজায় রাখে। অপরপক্ষে বল্কলের নিস্তেজনার প্রসার মানুষের ব্যবহারকে উদ্দীপিত করে ও বজায় রাখে। অপরপক্ষে বল্কলের নিস্তেজনার প্রসার আচরণকে নিস্তেজ করে ও নিয়ন্ত্রণ বা অবদমন করে। উত্তেজনা ও নিস্তেজনার মধ্যে বিচারশীল পারস্পরিক প্রক্রিয়ার উপর স্বাভাবিক দৈনন্দিন ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সক্রিয় ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভরশীল। রোজকার কাজের সক্রিয়তার বিপরীত পর্যায়ে স্বাভাবিক নিদ্রা উদ্ভূত হয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বেশির ভাগ অংশের উপর নিস্তেজনার অধিকতর বিস্তার হওয়ার জন্য।

অনুবন্ধ দ্বারা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীকরণ এবং 'প্রয়াস ও প্রমাদ'

আগে যেমন বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রক্রিয়া, সে দৈনন্দিন জীবনের অভিযোজনই হোক কি জ্ঞানার্জন হোক অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হোক, অনুবন্ধের ওপর নির্ভরশীল। 13 ই নভেম্বর 1935 পাভলভের অনুগামীদের এক সাপ্তাহিক বুধবারের সভায় পাভলভ জোর দিলেন এই বক্তব্যের উপর : অনুবন্ধ গঠিত হয় অন্তত পক্ষে দুটো অবস্থায়, প্রথমত অভিযোজনের বিষয়টি, যা একটি বিশেষ ধাঁচে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্রন্দশী মাধ্যমে। প্রাণীর কাছে অভিযোজনের জৈবিক গুরুত্ব আছে। পরিবেশের সঠিক ঘটনা গুলির সংকেত দেওয়া হয় অর্জিত ক্ষণস্থায়ী সংকেত বা শর্তাধীন উদ্দীপক দ্বারা। দ্বিতীয়ত জ্ঞানার্জন, যেখানে দুই অথবা ততোধিক ঘটনাপ্রবাহ বিস্তারের সঙ্গে জটিলভাবে জড়িত, তা সে দৈনন্দিন জীবনেই অর্জিত হোক অথবা বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে পাওয়া যাক, তা 'প্রয়াস ও প্রমাদ' প্রক্রিয়া দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্ভব।

স্বতঃস্ফূর্ত অথবা তথাকথিত ঐচ্ছিক ব্যবহার

1920 সালের শেষের দিকে পেট্রোগ্রাডের ওয়ারশ-এর দুইজন চিকিৎসক ছাত্র জর্জি কনর্স্কি আর স্টিফান মিলার পাভলভকে তাঁদের মোটর কাণ্ডিশনিং-এর পরীক্ষার কথা জানালেন। তাঁদের একটি পরীক্ষা ছিল এইরকম—পরীক্ষিত কুকুরটিকে আলোর মত একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপক দেখানোর পর নিষ্ক্রিয়ভাবে তার সামনের একটি পা তোলা হল এবং শেষে খাবার দেওয়া হ'ল। দেখা গেল এই ভাবে শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনের পর আলোর উদ্দীপক ব্যবহার করেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ সামনের পা'টি উঠে আসছে। এই পরীক্ষা পাভলভের মনে প্রাণীদের তথাকথিত স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বৈচ্ছিক ব্যবহার সম্পর্কে বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে গেল। এর আগে পাভলভ মনে করতেন প্রাণীর কোন ধরণের স্বৈচ্ছিক ক্রিয়া আসলে একটি অধ্যাস। আমাদের সব কর্মক্রিয়াই পূর্বনির্দিষ্ট এবং প্রাণীটির স্নায়বিক সংগঠনের কর্মপ্রক্রিয়ার চেষ্টীয় বিশ্লেষক দ্বারা এই ধরনের স্বৈচ্ছিক ক্রিয়ার আচরণ প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কে আরও যে স্নায়বিক ক্রিয়ার বিশ্লেষকের সংগঠন রয়েছে, যেমন দৃশ্য ও শ্রবণ সংক্রান্ত, তাদের সঙ্গে চেষ্টীয় বিশ্লেষক সংগঠনের তফাৎ হল, গুরুমস্তিষ্কের চেষ্টীয় বিশ্লেষক সংগঠনে যুগপৎ অন্তর্বাহী (সংবেদনগ্রাহী) ও বহির্বাহী স্নায়ুসংযোগ থাকে। সুতরাং সংবেদনগ্রাহীর জন্য যে কোন উদ্দীপকই প্রাণীটি পাক্ না কেন, অভ্যন্তীকরণের মাধ্যমে তা ঐ চেষ্টীয় বিশ্লেষক ও বহির্বাহী স্নায়ু সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ করতে পারে। ছেলেবেলা থেকে বহুবরণের এমন উদ্দীপকের মাধ্যমে সংবেদনগ্রাহী (অন্তর্বাহী) ও চেষ্টীয় কেন্দ্রের (বহির্বাহী) মধ্যে মজবুত অভ্যন্তীকরণের ফলাফলের জন্যই আমরা পরবর্তীকালে প্রাণীটির আচার আচরণের এমন অসংখ্য স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বৈচ্ছিক ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ দেখতে পাই।

অন্তর্ভাবী আচরণ : স্নায়ুরোগ ও উন্মাদরোগ

1910 সালে পাভলভের একজন ছাত্র ফ্রেন্তভ্‌নিকোভার কুকুরদের ওপর বিভিন্ন দৃশ্যগত উদ্দীপক ব্যবহার করার অপ্রত্যাশিত ফল হল কুকুরদের বিশৃঙ্খল ব্যবহার। 1920 সাল নাগাদ পাভলভের যে সব ছাত্ররা ফ্রেন্তভ্‌নিকোভার কাজ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন তাঁরা পরীক্ষামূলকভাবে বায়ুরোগ সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করলেন। অর্থাৎ গবেষণাগারে পশুদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে যে সাধারণ স্বভাবী আচরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার থেকে তফাৎ হওয়া ব্যবহার সম্পর্কে তাঁরা অনুসন্ধান চালালেন, তারপর 1930-এর সময়কালে পাভলভ লেনিনগ্রাদের বায়ু ও উন্মাদরোগীদের ক্লিনিকগুলিতে মানুষের বায়ু আর উন্মাদ রোগের ওপর সমীক্ষা করলেন। তিনি দুটো প্রচেষ্টাকে যুক্ত করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলীর তত্ত্ব দ্বারা অন্তর্ভাবী আচরণকে ব্যাখ্যা করার মত যথেষ্ট তথ্য তাঁর হাতে এসেছে।

পাভলভের মতবাদ অনুযায়ী বায়ুরোগ হল "প্রাণীর উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের দীর্ঘমেয়াদী বিশৃঙ্খলা"। প্রাণীর উপর পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে বায়ুরোগ তখনই হয় যখন পরিবেশগত জোরালো শর্তাধীন উদ্দীপক, যা উত্তেজনাধর্মী প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, তার দ্বারা পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীটির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাহত হয়। এবং অন্যদিকে যখন পরিবেশগত চাহিদাগুলি নিষ্ক্রেজনাধর্মী প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, অথবা যখন বিস্তারধর্মী উত্তেজনা ও নিষ্ক্রেজনার মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হয়। অপরপক্ষে স্বাভাবিক 'ডায়নামিক স্টিরিওটাইপ' উত্তেজনা ও নিষ্ক্রেজনার ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কঠিন পরিবেশগত শর্তাধীন উদ্দীপকগুলি এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত ও কর্মজোরী করে ফেলায় তাদের ব্যবহার কম মানানসই ও কম অভিযোজিত হয়। কিছু কিছু ব্যক্তিত্বের বা মেজাজের টাইপে বায়ুরোগের প্রবণতা আছে, বিশেষ করে যারা "দুর্বল" টাইপের তারা কম শর্তাধীন

উদ্দীপক দ্বারা অভ্যস্ত হয়েছে ও বিশৃঙ্খল আচরণ করছে। নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে সাইকাসথেনিক নিউরোসিস চিন্তাশীল মস্তিষ্কের টাইপের দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের দেখা যায়। অপরপক্ষে হিস্টেরিক্যাল নিউরোসিস দেখা যায় আর্টিস্টিক টাইপের দুর্বল ব্যক্তিদের লোকেদের।

লেনিনগ্রাদের সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে পাভলভ মনোরোগের ব্যাপারে কাজ করেছিলেন। 1935 সালে পাভলভ স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন। যেসব দুর্বল মস্তিষ্কের লোক শৈশবে ঠিকভাবে বেড়ে ওঠেনি, তারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগেই অত্যন্ত কঠিন আঘাতকারী জীবন-অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলে স্কিজোফ্রেনিয়া হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এই পর্যায়ে নিস্তেজনাধর্মী প্রক্রিয়া ব্যক্তিকে ক্ষতিকারক অতিরিক্ত প্রয়াসের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। তার ফলে হয়তো তাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গুরুমস্তিষ্ক অঞ্চলে শারীরবৃত্তিক ক্ষতি সাধিত হয়। স্কিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা হিসাবে পাভলভ বিশ্রাম ও ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করে দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রার পরামর্শ দিয়েছিলেন। 1920 -এর বছরগুলিতে পাভলভ যখন বৃদ্ধ হচ্ছিলেন তখন নিজের এবং অন্যান্যদের মধ্যে বয়স বাড়ার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে বৃদ্ধত্ব সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তাঁর শিষ্যেরা বুড়ো কুকুরদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখালেন যে জীবনের প্রথমদিকে অর্জিত লালানিঃসরক শর্তাধীন সাড়া বৃদ্ধ বয়সেও থেকে গিয়েছিল। কিন্তু কুকুরগুলো সহজে নতুন কোন পরাবর্ত অর্জন করতে পারেনি। পাভলভ এখানে লক্ষ্য করলেন ডায়নামিক স্টিরিওটাইপের বিশৃঙ্খলা, দুর্বল অভিযোজন এবং কমে-আসা সংজ্ঞা -সঞ্চালক স্নায়ুর ক্ষমতা প্রক্রিয়া যা স্নায়বিক কার্মিক সংগঠনের সার্বিক দুর্বলতা প্রকাশ করে। এখানে উত্তেজনামূলক প্রক্রিয়ার চাইতে নিস্তেজনামূলক প্রক্রিয়ার কমে-আসা বেশি প্রবল— এই ঘটনার মধ্যে তিনি এই ব্যাখ্যা করলেন। এই অসঙ্গতি বয়স্ক লোকেদের বেশি কথা বলা বা বকবক করার মধ্যে প্রকাশ পায়। কারণ তখন উত্তেজনামূলক প্রক্রিয়া তাদের কথা বলা বাড়ায়, কিন্তু নিস্তেজনামূলক প্রক্রিয়ার প্রভাব আকস্মিক কমে-আসায় তাদের কথা বলাকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মানবিক অধিকার রক্ষায় পাভলভ

একজন মানুষকে পরিপূর্ণভাবে পরিমাপ করতে গেলে তার ব্যক্তিত্ব এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা উচিত। যদিও পাভলভ বিজ্ঞানেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করেছিলেন, তবুও রুশ দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও সক্রিয় ছিলেন। লেনিন যখন দেশত্যাগীদের দেশে আসার অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন তখন পাভলভ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাগুলিতে সোভিয়েত রাজত্বের এই ধরণের ধ্বংসাত্মক নীতিকে আক্রমণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা হচ্ছে, শুধুমাত্র এই সন্দেহের বলে মানুষজনকে বেছে বেছে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ঘটনায় ভয় না পেয়ে পাভলভ-- যিনি বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন— তিনি রুশ রাজত্বের এই কুৎসিত অপপ্রচার ও বদনাম দেবার নীতিকে নিন্দা করলেন এবং খোলাখুলিভাবে মানবিক অধিকার রক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে সমর্থন করলেন; এবং যদিও তিনি স্বয়ং ধর্ম-নিরাসক্ত ছিলেন, তবুও ধর্মসহিষ্ণুতার পক্ষ সমর্থন করলেন।

পাভলভের কৃতিত্ব ও তার ফলাফল

উডওয়ার্থ পূর্বেই মেনে নিয়েছিলেন যে পাভলভের গুরুমস্তিষ্ক সংক্রান্ত স্নায়বিক কার্যাবলী তত্ত্ব হচ্ছে মূলতঃ অনুবন্ধ শিক্ষণ প্রক্রিয়া, যা কিনা বিজ্ঞানী থর্ণডাইক এবং হলের তত্ত্বের কাছাকাছি রয়েছে। এখন এটি প্রধানতঃ ঐতিহাসিক আগ্রহের বিষয়। অপরপক্ষে পাভলভের লালানিঃসরক শর্তাধীন পরাবর্ত প্রক্রিয়া পরবর্তীকালের বহু অপারেন্ট কণ্ডিশনিং ব্যতীত অন্য প্রক্রিয়াগুলির আদর্শ উদাহরণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একইভাবে পাভলভের কিছু ধারণা, যেমন reinforcement extinction এবং সামান্যীকরণ, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অঙ্গচ্ছেদ অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য পাভলভীয় ধারণা, যেমন ডায়নামিক স্টিরিওটাইপ অথবা প্যারাডক্সিকাল এবং আলট্রাপ্যারাডক্সিকাল পর্যায় ইত্যাদি গভীর মনোযোগ এবং বিশদ পরীক্ষামূলক ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

আমেরিকান সাইকোলজিস্ট, 1997 সেপ্টেম্বর

অনুবাদ : শ্যামলী দাশগুপ্ত, নিবেদিতা বাগচী

পাভলভ - মনোরোগচিকিৎসার স্তব্ধ উজ্জ্বল পথ

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ তাঁর জন্মের দেড়শো বছরে এসে দাঁড়িয়ে প্রায় একশো বছর আগের কথা মনে হচ্ছে, যখন 1903 সালে পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তের (Conditioned Reflex) আবিষ্কার, দর্শন ও মনোবিদ্যার সাথে প্রকৃতি বিজ্ঞানের মেলবন্ধন গড়ে তুলল। প্রধিবিদ্যাভিত্তিক মনোবিদ্যার বিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের উত্তরণ ঘটল। মনের নানা ঘটনার নতুন নির্ভর যোগ্য ব্যাখ্যা এবং প্রমাণও মিলল : মনোবিজ্ঞানের নতুন যুগ শুরু হল। পরীক্ষাগারের পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যকে ভিত্তি করে মনোরোগেরও কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মিলল। কিন্তু পাভলভীয় বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে ফিজিওলজিভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিকশিত হলো না। পাভলভের মৃত্যুর পর তা বিকশিত হবার অপেক্ষায় রয়ে গেল আজও। কিন্তু কেন?

সেদিন ছিল ভাবনা কে ভাবনা দিয়ে বিশ্লেষণ করবার শাস্ত্র—সাইকোলজি। স্বাভাবিকভাবেই মত পার্থক্য; মতবিরোধে পরিপূর্ণ ছিল এই বিষয়। কারণ প্রতিটি মানুষের মনই পৃথক। ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রজাতির মনের বিশ্লেষণ-সব সময়েই subjective অন্যদিকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের নানা সূত্র ছিল মানবমনের বাইরের জগতে সীমাবদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর চারের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত ইতিহাসের এই সময়কালে রাশিয়ায় চলছিল মনোবিজ্ঞানী, প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও শারীরতত্ত্ববিদদের সুগভীর অনুসন্ধান। বিজ্ঞানী অরলোভস্কি (Orlovsky) ও বটকিন (Botkin) খুঁজে পেলেন শরীরের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাব। পরে পাভলভ তাকে আখ্যা দিলেন Nervism বা স্নায়ুময়তা। পিসারেভ (Pisarev) প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুবাদকে বিকশিত করে চললেন। মানবমন যে এই বিশ্বজগতের, এই প্রকৃতিবিজ্ঞানেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ অথচ বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে প্রকৃতির সাথে মনের যোগসূত্র কিভাবে রয়েছে - তখনও তা জানা নেই। অস্থির ভাবে চলছিল অনুসন্ধান। তাঁরা অনুসন্ধান করে চলেছেন, অনুমানও করছেন, কিন্তু প্রমাণ্য সূত্র খুঁজে পাচ্ছেন না। ইতিমধ্যে সেচেনভ (Sechenov) এর Reflexes of the Brain প্রকাশিত হল। ভাববাদীদের কাছে মানবমন ছিল বহির্বিশ্ব নিরপেক্ষ এক চিরকালীন সত্তা। এর অস্তিত্বের জন্য বস্তুগত আধার অনিবার্য নয়। বিজ্ঞানে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা অসম্ভব। একদিকে মানবমন ও মানবচেতনা, অন্যদিকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট সূত্র। এই Dualism -এর, দ্বৈত সত্তার বোধে বন্দী দার্শনিক জগতকে মুক্তি দিলেন পাভলভ ও সেচেনভ। বস্তু আর চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতা প্রমাণিত হল শর্তাধীন পরাবর্তে, 1903 সালে। শর্তাধীন পরাবর্তকে ভিত্তি করে সাইকোলজির নতুন বিভাগ খুলে গেল - Associative Psychology.

জন্মলগ্ন থেকে আমরা বহন করছি যে চিরকালীন প্রকাতাগুলো, যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তি, যৌনতা, বেঁচে থাকা, স্বাধীনতা ও অনুসন্ধান এই সব শর্তহীন পরাবর্ত বা Instinct গুলোই শুধু প্রাণীর বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পরীক্ষায় পাভলভ দেখালেন উচ্চতর কর্টেক্স-এর ব্যবচ্ছেদে, প্রাণীটি, গড়ে ওঠা অস্থায়ী শর্তাধীন পরাবর্তগুলি হারিয়ে ফেলায় শুধু নিম্নতর কর্টেক্স-এর সাহায্যে চিরকালীন শর্তহীন পরাবর্তগুলি অবলম্বন করে প্রাণীটি বেশিদিন বাঁচল না। বহির্বিশ্বের বস্তুজগত থেকে প্রতিনিয়ত শত সহস্র সংবেদ বা উদ্দীপক আছড়ে পড়ছে মস্তিষ্কে। চিরকালীন শর্তহীন পরাবর্তগুলি প্রাণীর অস্তিত্বের প্রয়োজনে বহির্বিশ্বের সংবেদগুলো চিনে চিনে নিজের স্নায়ুতন্ত্রের সাথে তাদের, নিজ অস্তিত্বের উপযোগী সম্পর্ক গড়ে চলেছে অবিরাম। এভাবেই সতত পরিবর্তনশীল বস্তু জগতের সাথে অজস্র অস্থায়ী শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠা এক ভারসাম্যের মধ্যে দিয়ে চলেছে প্রাণী। এই ভারসাম্যই হল Dynamic Stereotype বা যাকে মস্তিষ্কের গতিময় পুনরাবৃত্তি বলতে পারি। পরিবেশের উপযোগ্য পরিবর্তনে ভারসাম্য বজায় রাখতে মস্তিষ্ক নতুন অস্থায়ী শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তোলে, যাকে বলি New Dynamic Stereotype.

প্রতিনিয়ত যে সংবেদ বা উদ্দীপনা মস্তিষ্কে এসে পড়ছে তারা কেউ মস্তিষ্কে গড়ে তুলছে উত্তেজনা, আবার কেউ নিস্তেজনা। বাইরের অজস্র সংবেদের প্রতিফলনে মস্তিষ্কব্যাপী ছড়িয়ে থাকে উত্তেজনা-নিস্তেজনার নানা অঞ্চল। প্রত্যেক উত্তেজনার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে নিস্তেজনার এই ভারসাম্য বা Equalisation.- এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। সমগ্র মস্তিষ্কব্যাপী এই ভাবে ছড়িয়ে থাকে উত্তেজনা- নিস্তেজনার অজস্র ছোট বড় অঞ্চলের এক মোজাইকের চিত্র। উত্তেজনা অঞ্চলের সংবেদে প্রাণী সাড়া দিচ্ছে, নিস্তেজনা অঞ্চলের সংবেদে সাড়া দিচ্ছে না। এই Equalisation-এর ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটলে অর্থাৎ উত্তেজনা বা

নিস্তেজনা একক ভাবে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য বিস্তার করলে প্রাণীর মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, প্রাণীটি মানসিক দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোন্ সংবেদে উত্তেজনা আর কোন্ সংবেদে নিস্তেজনা ঘটবে, তাও পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিবেশের নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে শর্তহীন পরাবর্তের মাপকাঠিতে চিনে চিনে নির্ধারিত হচ্ছে আর গড়ে উঠছে শত সহস্র শর্তাধীন পরাবর্তের এক Hierarchy.

প্রকৃত পক্ষে বলা চলে শর্তাধীন পরাবর্তের আবিষ্কারে পাভলভের কাজ শুরু হল, যদিও বিশ্ববাসী মূলতঃ জানে এখানেই তাঁর কাজ শেষ হলো এবং তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। শর্তাধীন পরাবর্তকে ভিত্তি করে মনোজগতের নানা অবস্থা ও ঘটনার একের পর এক ব্যাখ্যা মিলতে লাগল তাঁর ফিজিওলজির সূত্র ধরে। জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে ব্যক্তিত্বের যে ধরণ গড়ে ওঠে তার ফিজিওলজিভিত্তিক ব্যাখ্যা দিলেন পাভলভ। ব্যাখ্যা করলেন মস্তিষ্কের টাইপ। হিপোক্রেটিসের পর্যবেক্ষণভিত্তিক ব্যক্তিত্বের শ্রেণী বিন্যাসের কেন কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা মিললো। মস্তিষ্কের উত্তেজনা, নিস্তেজনা ও তার গতি ও ভারসাম্যকে ভিত্তি করে মস্তিষ্কের শ্রেণী বিন্যাস করলেন তিনি। সবল মস্তিষ্ক উত্তেজনাকে গ্রহণ করতে পারে বেশি। দুর্বল মস্তিষ্কে উত্তেজনার আধিক্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে নিস্তেজনা। সিজোফ্রেনিয়া ও হিস্টিরিয়ার ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে। উত্তেজনার পাশাপাশি নিস্তেজনার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে সবল-ভারসাম্য-যুক্ত গতিময় এবং স্থিতিশীল দুই মস্তিষ্ক। হিপোক্রেটিসের ফ্লেগম্যাটিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে উত্তেজনা বিস্তারের গতি ধীর। এঁরা সবল-ভারসাম্য যুক্ত স্থিতিশীল মস্তিষ্কের মানুষ। স্যানগুইনাস্ ব্যক্তিত্বের মস্তিষ্কে উত্তেজনা বা নিস্তেজনা বিস্তারের গতি দ্রুত। তাই এঁরা সবল ভারসাম্য যুক্ত গতিশীল ব্যক্তিত্বের মানুষ। গতির অস্বাভাবিক আধিক্যে তৈরি হয় Explosive বা Impulsive ধরনের মানুষ। তাঁরা অতি সহজে সতর্ক, উত্তেজিত, অনুপ্রাণিত হন আবার অতি দ্রুত নিস্তেজিত, হতাশ বা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দুর্বল জাতীয় মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য হল-অতি সহজে ছড়িয়ে পড়ে বৈদ্যুতিক নিস্তেজনা। এদের মধ্যে অতি সহজেই নেমে আসে বিষাদ, হতাশা, অনুৎসাহ। হিপোক্রেটিসের মেলানকলিক ব্যক্তিত্বের এঁরা।

পাভলভ প্রমাণ করলেন মানসিক দিক থেকে অসুস্থ হবার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি, দুর্বল এবং সবল ভারসাম্যহীন মস্তিষ্কের। আবার পরীক্ষাগারে তিনি এও প্রমাণ করলেন মানসিক অসুস্থতার পেছনে জন্মগত প্রবণতাই একমাত্র কথা নয়। যে কোন প্রাণীর মধ্যেই নিউরোসিস সৃষ্টি করা সম্ভব, সে যত সবল মস্তিষ্কই হোক না কেন। অর্থাৎ পরিবেশের তীব্র প্রতিকূলতা এবং পরিবেশের দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন অর্থাৎ এক Dynamic Stereotype থেকে অতি দ্রুত মস্তিষ্কের অন্য Dynamic Stereotype এ পৌঁছতে সবল মস্তিষ্কেও নিউরোসিস দেখা দিতে পারে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে জন্মগত ও শৈশবলব্ধ যে নিউরোটিক বা সাইকোটিক কোরকে ভাগ্যনির্ধারক মনে করা হয়, পাভলভ দেখালেন তা অমোঘ নয়। মানুষ শৈশবের ততখানি বন্দী কখনোই নয়। পরিবেশের সাথে ক্রমাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আজীবন পরিবর্তনশীল এই মানবমন, অবশ্য যদিও তাতে শৈশবের প্রভাব অনেক গভীর।

মস্তিষ্কের টাইপের যে জন্মগত পটভূমি, তার ওপর দাঁড়িয়ে, নিয়তই পরিবর্তনশীল বহির্বিশ্বের শতসহস্র সংবেদের সাথে ভারসাম্য রেখে এগিয়ে চলেছে মানবমন। মস্তিষ্কের টাইপের সীমাবদ্ধতা আর পরিবেশের প্রতিকূলতার সমন্বয় ভারসাম্যের বিঘ্নে দেখা দিচ্ছে মানসিক অসুস্থতা। মানসিক অসুস্থতার প্রথম পরীক্ষাগারভিত্তিক ফিজিওলজি নির্ভর ব্যাখ্যা দিলেন পাভলভ। হিস্টিরিয়ার ক্ষেত্রে দুর্বল মস্তিষ্কে উত্তেজনার অল্প আধিক্যেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে নিস্তেজনা, মস্তিষ্কের দুর্বল কোরকে রক্ষা করবার স্বার্থে। ফলে সারা মস্তিষ্কের নিস্তেজনা-সঞ্জাত এক হিপনয়েড অবস্থায় রোগী নিস্তেজিত হয়ে থাকে। উচ্চ মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ থেকে আংশিক মুক্ত হয়ে নিম্ন মস্তিষ্ক ভারসাম্যহীন এলোমেলো আচরণ করতে থাকে, প্রধানত শর্তহীন পরাবর্ত বা Instinct -এর অধীন হয়ে উচ্চ মস্তিষ্কের চেষ্টার অংশে (Motor Cortex) বিচ্ছিন্ন উত্তেজনা চারপাশের নিস্তেজনায় বন্দী হয়ে থাকার ফলে অত্যাধিক শারীর সঞ্চালন ও পেশি সংকোচন ঘটতে থাকে।

প্যারানোইয়ার (সন্দেহ-ভ্রান্তি) ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো অনুভূতি বা ধারণা মস্তিষ্কের বিশেষ কোনো অঞ্চলে পুনঃ পুনঃ অনুরণিত হবার ফলে ঐ অঞ্চলের উত্তেজনায় এক Inertia তৈরি হয়। ঐ অঞ্চলকে ঘিরে ক্রমাগত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে নিস্তেজনা। মস্তিষ্ককে নিয়ে যায় এক হিপনয়েড অবস্থায়। চারপাশের নিস্তেজনার সমুদ্রে ডুবে যায় বহির্জগতের বাস্তবতা। আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ ঐ উত্তেজনা অর্থাৎ ভাবনা Excitative Inertia হয়ে ভেসে থাকে দ্বীপের মত নিস্তেজনার সমুদ্রে। বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে ঐ Inert অঞ্চলে জেগে থাকা অনুভূতিকে একমাত্র বাস্তব বলে মনে হয়। সেই অনুভূতি যুক্তি-বুদ্ধি-

বিবেচনার অতীত। আমরা যাকে বলি ডিলিউশান। সন্দেহ-ভাবি এই রকমই এক ধরনের ডিলিউশান, যার সত্যতা বহির্জগতে নয়, রোগীর মস্তিষ্কে।

অনেকটা একই রকমের ঘটনা ঘটে অবসেসিভ নিউরোসিসের ক্ষেত্রে। একই চিন্তা বা অনুভূতি মস্তিষ্কের একই অঞ্চলে পুনরাবৃত্তি হতে হতে উত্তেজনার এক Inert বা দ্বিতিশীল অবস্থা তৈরি হয়, বিশেষ অঞ্চলে। উত্তেজনার স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী এই উত্তেজনার Irradiation বা বিস্তার হয় না, ফলে আনুষঙ্গিক অন্যান্য উত্তেজনার সম্ভাবনাময় অঞ্চলগুলোও উদ্দীপিত হতে পারে না। পরিণতিতে উত্তেজনা নিস্তেজনার একাধিক অঞ্চলের সামগ্রিক ভারসাম্য অবস্থা তৈরি না হয়ে একটি উত্তেজনার অঞ্চল Inert হয়ে ওঠে, আর চারপাশে বিস্তৃত হতে থাকে নিস্তেজনার ব্যাপক অঞ্চল। রোগী বুঝতে পারলেও অন্যান্য চিন্তা বা ধারণাকে নতুন উত্তেজনার গ্রহণ কেন্দ্র দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ চারপাশের নিস্তেজনার ব্যাপ্তিতে নতুন কোন ভাবনার উত্তেজনা অঞ্চল তৈরী হতে পারে না। তবে Obsession এর ক্ষেত্রে নিস্তেজনা তত ব্যাপক না হওয়ায় সে বাস্তব জগতের বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না। নিজের অসহায়তাকে বুঝতে পারে। কিন্তু এই আবদ্ধ পুনরাবৃত্ত উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হলে ক্রমাগত মস্তিষ্কের অন্যান্য অঞ্চলের নিস্তেজনা সর্বগ্রাসী হতে থাকে। রোগী ক্রমাগত অবসেসন্ থেকে প্যারানোইয়ার দিকে যাত্রা করে। আর Obsession এর ধারণাকে ক্রমশঃ বাস্তব সত্য বলে মনে হতে শুরু করে যাকে আমরা বলি Delusion।

মনোরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও দীর্ঘকালীন অবসেসন্-এর রোগীর মধ্যে দেখা দিতে শুরু করে প্যারানোইয়ার লক্ষণ। পাভলভ পরীক্ষায় প্রমাণ করে দেখিয়েছেন পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে বহির্বিশ্বের সংবেদের সামগ্রিক জগত পাল্টে গেলে মস্তিষ্কের নতুন উত্তেজনার অঞ্চল তৈরি করে নতুন সংবেদ। নতুন নতুন উত্তেজনার অঞ্চল বিস্তার লাভ করে। Obsession -এর ভিত্তি সেই বন্দী অঞ্চলকে ব্যাপক নিস্তেজনার অঞ্চল থেকে মুক্ত করে তোলে। মনোচিকিৎসাতেও অবসেশানের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবেশ পরিবর্তন অনেকখানি নিরাময়ের কাজ করে।

সিজোফ্রেনিয়ার দুর্বল মস্তিষ্ক কোন জীবনের বড় কোন ঘটনা বা বড় কোন মানসিক উত্তেজনার ভার বহন করতে পারে না। মস্তিষ্ককে রক্ষা করতে ছড়িয়ে পড়ে নিস্তেজনা। এই নিস্তেজনা দীর্ঘকালীন ও এতখানি গভীর যে এর প্রকৃত অবস্থা এক প্রকার হিপনয়েড বা সম্মোহিত অবস্থার সমতুল্য। পাভলভ তাই সিজোফ্রেনিয়াকে এক ক্রনিক হিপনয়েড অবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছেন। হিপনয়েড অবস্থায় মস্তিষ্কে এক Paradoxical অবস্থা সঞ্চারিত হয়। এ অবস্থায় মস্তিষ্ক দুর্বল সংবেদে জোরালো ভাবে সাড়া দেয় এবং জোরালো সংবেদে সাড়া দেয় ক্ষীণ ভাবে অথবা নীরব থাকে। হিপনয়েড অবস্থার গভীরতা আরও বাড়লে সঞ্চারিত হয় Ultra Paradoxical অবস্থা। এ অবস্থায় ধনাত্মক সংবেদ নিস্তেজনা তৈরি করে আর ঋণাত্মক সংবেদ তৈরি করে উত্তেজনা। অর্থাৎ একেবারে বিপরীত অবস্থা। ফলে সিজোফ্রেনিয়া রোগীর নিজের নিকটতম আপনজনকে মনে হয় তার সবচেয়ে বড় শত্রু। সিজোফ্রেনিয়া চিকিৎসার ক্ষেত্রে পাভলভের এই সূত্র আধুনিক মনোরোগ চিকিৎসায় আজও প্রয়োগ হয়নি।

সিজোফ্রেনিয়া রোগীর মস্তিষ্কে নিস্তেজনার প্রাধান্য হলেও অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ছড়িয়ে থাকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত উত্তেজনার অঞ্চল। ফলে ভারসাম্যহীন অসংলগ্ন আচরণ প্রকাশ পায়। উচ্চ মস্তিষ্ক আরও ব্যাপক নিস্তেজনার আক্রান্ত হলে লাম্বমস্তিষ্ক (Limbic Cortex) উচ্চ মস্তিষ্কের শাসন মুক্ত হয়ে বল্গাহীন, উত্তেজিত আচরণ করে। কৃত্রিম উপায়ে সম্মোহিত অবস্থায় মস্তিষ্কের চেষ্টার অঞ্চলে (Motor Cortex) নিস্তেজনা নেমে এলে রোগীর অঙ্গসঞ্চালনের শক্তি থাকে না। যাকে হিপনোটিক প্যারালিসিস বলে। সিজোফ্রেনিয়ার ক্যাটাটোনিয়া অবস্থাতেও শরীরের সমস্ত অঙ্গসঞ্চালন স্থির হয়ে যায়, কিন্তু চেতনা জাগ্রত থাকে। সিজোফ্রেনিয়া ও কৃত্রিম উপায়ে সম্মোহিত অবস্থায় কতক গুলো একই রকমের ঘটনা ঘটে। যেমন Stereotype অর্থাৎ একই কথা বা আচরণ পুনঃ পুনঃ করে চলা এবং Negativism অর্থাৎ যা বলা হয় তার বিপরীত আচরণ করা এবং Echolalia অর্থাৎ যান্ত্রিক ভাবে অন্যের কথা প্রতিধ্বনি করে চলা। প্রচলিত মনোবিজ্ঞান ও মনোচিকিৎসাশাস্ত্রে সিজোফ্রেনিয়ার বিশ্লেষণ ও চিকিৎসা পরিকল্পনায় পাভলভের হিপনোটিক তত্ত্ব আজও ব্রাত্য।

আধুনিক মনোচিকিৎসাবিজ্ঞান মস্তিষ্কের অণুকোষ স্তরের তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে অতি দ্রুত। অনেক গ্রন্থের অন্ধকার নতুন উদ্ভাসের আলোয় আলোকিত হচ্ছে ক্রমাগত। মূলতঃ মস্তিষ্কের সংবেদ-সংবাহী রাসায়নিক 'নিউরোট্রান্সমিটার'-এর কার্যকলাপের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মনোরোগের বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া। সিজোফ্রেনিয়া ডোপামিনের প্রকল্প, ডিপ্রেশান বা অঞ্চলাল রোগে নর-

অ্যাড্রেনালিন ও সেরোটোনিনের ঘাটতি ইত্যাদি। নর-অ্যাড্রেনালিনের উৎস লোকাস্ সেরুলাস থেকে মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে নর-অ্যাড্রিনালিন বহনকারি স্নায়ুতন্তু। রেনফেটেনের র‍্যাফি নিউক্লিয়াস থেকে নিঃসৃত হচ্ছে সেরোটোনিন। সাবস্টানসিয়া নায়ারায় রয়েছে ডোপামিনের সংগ্রহশালা। আর এসব কিছুই হল এ শতাব্দীর আবিষ্কার। কর্টেক্স থেকে ট্রায়াটামগামী ডোপামিন বহনকারী স্নায়ুপথের পরীক্ষামূলক ছেদ ঘটালে প্রাণীর মধ্যে সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। আবার সিজোফ্রেনিয়া রোগীর ক্ষেত্রে থ্যালামাস থেকে কর্টেক্সগামী স্নায়ুপথের কার্যকারণগত অস্বাভাবিকতা পাওয়া গেছে।

মস্তিষ্কের উত্তেজনা-নিস্তেজনার বিষয়টির অণুকোষ স্তরের ও প্রান্তিক স্তরের চেহারা ও ধরা পড়েছে আধুনিক Molecular Biology-র পর্যবেক্ষণায়। যে তড়িৎ প্রবাহ বহন করে নিয়ে চলেছে নিউরোট্রান্সমিটার, তা স্নায়ুর সংযোগস্থল বা সাইন্যাপ্স অতিক্রম করে গ্রাহক বা রিসেপটারে সংবাহিত করে তড়িৎ সংবেদ। শেষ পর্যন্ত আন্তঃস্নায়ুবিক সংবাদ প্রবাহে অংশ নেয় এক ঘটনা পরম্পরা - জি. প্রোটিন, সেকেণ্ড ম্যাসেঞ্জার হিসাবে সাইক্লিক A.M.P., সাইক্লিক G.M.P. এবং প্রোটিন ফসফোরাইলেশন। মনকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা যখন শেষ পর্যন্ত এইভাবে এক অণুবীক্ষনিক অবস্থায় এসে পৌঁছই। তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক মানুষের সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভূতি শেষ পর্যন্ত কি তাহলে শুধুই রসায়ন? অনুধাবন করা যায় আধুনিক বায়োলজি মস্তিষ্কের কোটরের ভেতরে আলো জ্বালিয়েছে ঠিকই। কিন্তু বহির্জগতের আলোর সাথে মস্তিষ্কের কোটরের আলোর যোগসূত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। মস্তিষ্কের অণুকোষ স্তরের ছবি তৈরি হচ্ছে। রসায়নের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, কিন্তু মস্তিষ্কের বুকে বাইরের পৃথিবীর ছবি, তার সমাজ-সংস্কৃতি, মূল্যবোধের অনুলিখনের রহস্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। বহির্জগতের ঘটনার প্রতিফলনগত যে প্রতিবিম্ব তৈরি হচ্ছে মস্তিষ্কের ক্যানভাসে, চেতনার সেই সামগ্রিকতা ধরতে পারছে না Molecular Biology-র Concrete বা মূর্ত-বিজ্ঞান। তাই স্বভাবতই বারবার মনে হয় মন কি শুধুই রসায়ন?

মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠভিত্তিক অণু-পরমাণু নির্ভর আধুনিক স্নায়ু-মনোবিজ্ঞানের এই ধারায় বিকশিত হয়ে চলেছে শুধুই রসায়ন মনোচিকিৎসাবিজ্ঞান (Psychopharmacology)। মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিস্তেজনার প্রকৃতিও মস্তিষ্কের টাইপকে উপেক্ষা করে, অনেকটা যান্ত্রিক ভাবে ওষুধের প্রয়োগে সাময়িক আরোগ্য হলেও অসুস্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটছে অমোঘ ভাবে। দীর্ঘকালীন ওষুধের প্রয়োগে মস্তিষ্ক কোষের ক্ষতি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটছে কিছু কিছু। ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাভলভীয় সূত্র গ্রহণ করেনি আধুনিকবিজ্ঞান। পরীক্ষাগারে ব্রোমাইড প্রয়োগের পর পাভলভ দেখিয়েছেন— "However very strict dosage is essential. For the weak type, the dose of Bromide must be from 5 to 8 times smaller than that for the strong type.... . A large dose may cause serious injurious effect. General laboratory rule is, weaker the type of nervous system, smaller the dose should be." দুর্বল মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে ওষুধের পরিমাণ হবে অনেক কম। কিন্তু মস্তিষ্কের শক্তি নির্ধারণ আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ই হয়ে উঠতে পারে নি।

মস্তিষ্কে আগত বাইরের জগতের ছবি, সংবেদ ও উদ্দীপনাগুলো মস্তিষ্কে পৌঁছে, তার একেকটি, আমাদের বিভিন্ন জন্মগত চিরকালীন পরাবর্তের সংকেত (Signal) জানায়। মস্তিষ্কে তাদের সম্মিলিত অবস্থা তৈরি করে প্রথম সাংকেতিক স্তরে (First Signalling System)। আর ভাষা আরও প্রতীকি ভাবে এই প্রথম সংকেতের সংকেত জানায়। অর্থাৎ মস্তিষ্কের কাছে ভাষা হলো জন্মগত পরাবর্তের দ্বিতীয় সংকেত। ভাষা মস্তিষ্কে এই ভাবে তৈরি করে এক দ্বিতীয় সাংকেতিক জগৎ (Second Signalling System) বা একমাত্র মানবমনেরই বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের বিকাশেই মানুষ সমস্ত প্রাণীকে পেছনে ফেলে সভ্যতার বুকে এগিয়ে গেছে বহুদূর। সাংকেতিক স্তরের এই ধারণা পাভলভেরই কৃতিত্ব বলা যায়। তিনি দেখিয়েছেন হিস্টিরিয়া রোগীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের দুর্বলতার জন্য প্রধানত প্রথম সাংকেতিক স্তর দ্বারাই রোগী পরিচালিত হয়। অবসেসিভ নিউরোসিসের ক্ষেত্রে এই স্তরের মাত্রাতিরিক্ত প্রাবল্যে মস্তিষ্কে ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটায়। চিন্তাশীল মননশীল মানুষের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর অধিকতর শক্তিশালী। যদি সাইকোলজি-বিজ্ঞানে এই দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরেরই ব্যবহার হয়ে থাকে সাইকোথেরাপির মাধ্যমে, তবু তা অনেকটা সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে নয়। অন্যদিকে ওষুধের চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে ভাষা বা দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের ব্যবহার বিবর্জিত। অথচ পাভলভ দেখিয়েছেন চিকিৎসায় মস্তিষ্কের টাইপ অনুযায়ী ভাষা বা দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের ব্যবহারে প্রয়োজনীয় ওষুধের পরিমাণকে হ্রাস করা সম্ভব। পাভলভ নির্দেশিত সম্মোহন চিকিৎসায় ভাষার ব্যবহারই প্রধান। তাঁর পরীক্ষায় প্রমাণিত — সম্মোহিত অবস্থায় মস্তিষ্কে Paradoxical অবস্থা সক্রিয়িত হওয়ার ফলে দুর্বল

সংবেদে মস্তিষ্কে জোরালো ডাকে সাড়া দেয়। ভাষা যেহেতু সংকেতের সংকেত, প্রতীকি হবার ফলে সংবেদ হিসাবে সে দুর্বল। তাই ভাষাকে ভিত্তি করে রোগী যে পরামর্শ বা অভিভাষণ (Suggestion) তা সম্মোহিত মস্তিষ্কে শক্তিশালী নিয়ামকের কাজ করে।

রসায়ন চিকিৎসার সমান্তরাল চিকিৎসার আর একটি প্রধান ধারা হলো অনুমান ও ধারণা ভিত্তিক বা সাইকোলজি ভিত্তিক চিকিৎসা। ফ্রয়েডীয় ও নিও ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিগুলি এইধারার অন্তর্ভুক্ত। অনুমান ভিত্তিক হওয়ায় এদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধও উল্লেখযোগ্য। একদিকে মস্তিষ্কের অণুবীক্ষনিক পরিচয় ও রসায়নিক বিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে Molecular Biology-র মূর্ত (Concrete) বিজ্ঞান ভিত্তিক ওষুধের চিকিৎসা অন্যদিকে সমান্তরাল ভাবে মনন ভিত্তিক সাইকোলজি বিজ্ঞানের চিকিৎসার ধারা। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্যের চিহ্ন রাখলেও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই দুটি ধারাই সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ভাবে এগিয়ে চলেছে সমান্তরাল পথে। অথচ মস্তিষ্ক, মন ও বহির্বিশ্বের সমাজ-সংস্কৃতি কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে এক অখণ্ড সত্তা হয়ে।

পাভলভীয় বিজ্ঞান মস্তিষ্কের কোষে সমাজ-সংস্কৃতির সংবেদ ও উদ্দীপনার অনুলেখন পদ্ধতি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে করতে এগিয়ে চলেছিল দুই ধারাকে এক অখণ্ডতায় বেঁধে মনোরোগ চিকিৎসাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তুলতে ও পৃথিবী যদিও আজও জানে পাভলভের জীবনের কাজ শেষ হয়েছে কন্ডিশনড্ রিফ্লেক্সের আবিষ্কারে। আসলে এখানেই পাভলভের কাজ শুরু। এরপর মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের একের পর এক নতুন সিদ্ধান্তের উন্মোচন আর তার পেছনে পেছনে মনোরোগ চিকিৎসার নতুন দরজা খুলে যাওয়া। কিন্তু তারপরই পাভলভের মৃত্যু। নতুন দরজা খুললো ঠিকই, কিন্তু সুনির্দিষ্ট পথ তৈরি হলো না। তাঁর মৃত্যুর পর পাভলভীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আজ পর্যন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল বিকাশের অপেক্ষায়, সে পথ আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পথ বলে; সে পথ সহজ সংক্ষিপ্ত ও চমকপ্রদ পথ নয় বলে।

কিন্তু যেহেতু পাভলভের পরীক্ষায় প্রাপ্ত বিষয়গুলো মস্তিষ্কেরই ঘটনা, তাই মনোরোগবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরি করতে, সে পথ এড়িয়ে কোন বিকল্প পথ সম্ভব নয়। তাঁর জন্মের দেড়শতে বর্ষে পৃথিবীর মানুষ তাঁর প্রতি এই জবাবদিহিটুকু করতে পারে— আজ অতি সম্প্রতি পাশ্চাত্যের দেশে তাঁর পুনর্মূল্যায়ণ শুরু হয়েছে।

মনোরোগ ও মনোরোগীদের কথা

ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের

অন্যমন

বিজ্ঞান ও হিউম্যানিটিজ-এর সম্পর্ক নিয়ে একমাত্র বাংলা বই

আশীষ লাহিড়ীর

সংস্কৃতির দ্বিখণ্ডন

সামনের বইমেলায় আমাদের নতুন বই

ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের **গ্রামীণ স্বাস্থ্য**

ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের **প্রশ্নোত্তরে মন ও তার সমস্যা**

আশীষ লাহিড়ীর **বিজ্ঞানের দর্শন ও কার্ল পপার**

চিত্তবিদের ডায়েরি

চিত্তবিদ

মোহিতবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রী, মানসিক অস্থিরতার জন্য। মোহিতবাবুর বয়স 65 বছর এবং তিনি বছর পাঁচেক হ'ল অবসর নিয়েছেন। তাঁকে বাইরে রেখে তাঁর স্ত্রী দুঃখের কথা বলতে শুরু করলেন, 'কি বলব ডাক্তারবাবু, লোকটা যেন দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে।' অবসর নেওয়ার পর বছর তিনেক সবকিছু মোটামুটি স্বাভাবিক চলছিল. তবে কিছু কিছু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন তিনি গম্ভীর, স্বল্পভাষী, কিছুটা কনসেভেটিভ আর সারাজীবন খুব সৎ লোক বলে পরিচিত ছিলেন। এমনিতে শান্ত প্রকৃতির, বাড়িতে থাকতে ভালবাসতেন, মনে হবে একটু আত্মকেন্দ্রিক ধরনের। তাঁর কোনরকম নেশা ছিল না তবে একটা রোগ রোগ ম্যানিয়া ছিল। টি ভি দেখা, বই পড়া, গানশোনায় কোন আগ্রহ ছিল না। ওঁর বাবা মা স্বাভাবিক ছিলেন কিন্তু একটু 'এক্সেনট্রিক' ছিলেন।

আগের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর স্ত্রী খুব চমৎকার একটা বিবরণী দিলেন। যেমন আগে তাঁকে 5-30 টায় ডেকে তুলতে হ'ত এখন সারারাত সম্ভবত ঘুমান না, 10-30 কি 11 টায় শুয়ে 3 টা 3-30 নাগাদ উঠে পড়েন আর খেয়ালখুশিমত ব্যায়াম করতে শুরু করেন। আগে লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করতেন না, লোকজন এড়িয়ে চলতেন, কথাও বলতেন খুব কম। এখন কথা বলার অভ্যাস বেড়েছে যথেষ্ট পরিমাণে চেনাজানা সবার সাথেই অনর্গল কথা বলেন। বাড়িতে বাবহার আগে খুব ভাল না হলেও অধিকাংশ সময় নির্লিপ্ত থাকতেন, বাইরে গিয়ে ঘরের নিন্দা কখনো করেননি। আর এখন পরিবারের লোকের সঙ্গে রুক্ষ বাবহার করেন, তাদের শত্রু ভাবেন, এমনকি বাইরের লোকের কাছে ঘরের নিন্দা করে আসেন। আগে তিনি শান্ত স্বভাবের ছিলেন, এখন সবসময় চঞ্চলভাব, কোন কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারেন না। অকারণে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, প্রচণ্ড গলা চড়িয়ে একটানা কথা বলে যান। একগুঁয়েমি-ভাব আগেও ছিল, তবে তা কখনও সমস্যায় পর্যায়ে যায় নি। আর এখন এমন হয়েছে, কোন কথাই তাঁকে বোঝানো বা শোনানো যায় না। আগে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া পছন্দ করতেন না, আর এখন নিজেই তিনি যখন খুশি বেরিয়ে যান, কোন কথা বলে যান না— এমনকি জিজ্ঞাসা করলেও বলেন না। তাঁকে জীবনে কোনদিন কেউ বেহিসাবি হতে দেখেননি বাজে পয়সা খরচের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর এখন যথেচ্ছভাবে দামী দামী পেন, চাবির রিং, টব, গাছ - এইসব কিনে যথেষ্ট পয়সা খরচ করছেন, এমনকি ধার দেনা পর্যন্ত করছেন। উত্তেজনাকর কথাবার্তা আগেও বলতেন, কিন্তু এখন যেন বেশিবেশি আর সবসময় মারব-ধরব ভাব।

স্বভাবের এইসব পরিবর্তনের জন্য একের পর এক অশান্তি উনি টেনে আনছেন, তাতে পাড়ার লোকের সঙ্গে অশান্তি হচ্ছে, রাস্তাঘাটে অশান্তি হচ্ছে, নিজের পরিবারের মান-সম্মান রাখা দায় হয়ে পড়েছে। তাঁর স্ত্রী খুব বিমর্ষভাবে বলেন, 'কত ভাল মানুষ ছিল ডাক্তারবাবু। যদিও চিরকাল কেরানির কাজ করেছেন, কিন্তু দৈহিক পরিশ্রম নির্ভর কাজে ওঁর বরাবর উৎসাহ ছিল। বাড়িতে শখ করে কেনা আছে প্রচুর যন্ত্রপাতি আর হাতের কাজও করতে পারেন- তাক তৈরি, মই বানানো, জলচৌকি এইসব। এখন সেসব অভ্যাসও নেই।' জিজ্ঞাসা করি, 'তাহলে এখন সারাদিন করেনটা কি।' 'কি যে করেন তা আমরাও জানি না। ঘর থেকে বেরিয়ে যান, কাউকে কিছু না বলে সারাদিন বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়ান। যত নীচুশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে ভাব। জমি, বাড়ির দালালি ধরনের কিছু একটা করেন বুঝতে পারি, কেননা বাড়ি চড়াও হয়ে লোকে গালাগালি করে যায়, অপমান করে যায়। আমি মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করি। দুটি বড় বড় মেয়ে আমার, তাদের বিয়ে দিতে হবে। এতো অসহায় লাগে ডাক্তারবাবু আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু বলতে গেলে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করেন সেই লোক যিনি আগে কোন কথাই বলতেন না। চেহারাটাও অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি আলাপ আলোচনা করে, ওর একটা কেমন 'অপরাধি মন' তৈরি হয়েছে যার ফলে ও এইসব করছে।

এইবার রোগীর সঙ্গে কথা বলা দরকার। বড় কালো, রোগা চেহারার প্রৌঢ় মানুষটি অদ্ভুত শান্ত ধীর স্থির। কে জানবে তিনি বাড়িতে এমন কুৎসিত পরিবেশ রচনা করতে পারেন। কেননা তাঁর স্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন এমন ভাবার কোন কারণ নেই। আমাদের মা কাকিমারা অবশ্য বাইরের লোকের কাছে স্বামী ছেলেমেয়েদের নিন্দা করবেন এটা মানতে পারা যায় না। আবার ভদ্রলোককে এইসব কথা সরাসরি জিজ্ঞাসা করাও অস্বস্তিকর কাজ। তাই কিছু গল্প জুড়লেই হ'ল— সারাদিন কি করেন, দিনকাল কেমন পড়েছে, তাঁদের দিনের সঙ্গে আজকের দিনের পরিবর্তনটা কেমন মনে হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। খুব শান্ত ধীর স্থির গলায় উনি উত্তর দিচ্ছিলেন এবং বোঝার উপায় নেই যে তাঁর কোন জ্বালা উত্তাপ আছে। এমনকি ওঁকে যে এখানে আনা হয়েছে সে ব্যাপারেও তাঁর কোন আগ্রহ নেই বা অভিযোগ নেই। তবে তাঁর সবকিছুর মধ্যে একটা নির্লিপ্ত উদাসীনভাব আছে, অন্তত আপাতভাবে। এরপর সরাসরি বাড়ির লোকেদের অভিযোগের কথা তুলতেই হ'ল। এর জবাবও তিনি দিলেন নিস্পৃহভাবে, 'আসলে এরা ঠিক আমাকে বুঝতে পারে না। দেখুন চিরকাল ছোটলোকদের সঙ্গে কারখানায় কাজ করেছি, এখনও ছোটলোকদের সঙ্গেই আমার থাকতে ভালো লাগে আর গলাটাও সেজন্য একটু চড়া। বাড়িতে অন্য জায়গা তার ওপর মেয়ে কোচিং সেন্টার খুলেছে ফলে বাইরে বেড়িয়ে পড়ি। ওরা কেমন ভুল বোঝে দেখুন। আমার অম্বলের ব্যথা আছে তাই কোন কোন সময় বমি হয়, তাতে ওদের অভিযোগ হচ্ছে আমি বাইরে আবোলতাবোল খেয়ে আসি তাই ঘরে কিছু খাই না আর বমি করি। আমি বাড়ির দালালি আমি আগেও করতাম, এসব কাজে একটু রিস্ক নিতেই হয়, তাছাড়া পয়সা কড়ি রোজগারের জন্য একটা কিছু করতেই হয় এখন রিটায়ার করেছি।' তার কথার প্রতিবাদ করি, 'কেন আপনার স্ত্রী যে বললেন আপনার মেয়েরা যা রোজগার করে তাতে আপনার আর রোজগারের দরকার হয় না, স্বচ্ছলভাবেই সংসার চলে যায়।' উনি মৃদু হেসে বলেন, ' ওসব মেয়েদের কথা বাদ দিন ওরা সংসারের কি বোঝে।' বাইরের আপাতত ব্যবস্থাপত্র দিয়ে তাকে তিন সপ্তাহ পর আসতে বলা হ'ল। কিন্তু তারপর তাঁর স্ত্রী যখন তাঁকে নিয়ে এলেন তখন তাঁর কথা শুনে যথেষ্ট বিচলিত বোধ করলাম।

তাঁকে আলাদা ঘরে বসিয়ে স্ত্রী বলতে শুরু করলেন, আমার বলতে খারাপ লাগছে তবু আপনাকে বলছি ও অনেক বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে করছে আমাদের জব্দ করার জন্য। আর আমাদের ওপর ওঁর যেন একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা রয়েছে, যেটা আমরা ধারণ করবো সেটাই বেশি বেশি করে করবে। ওঁর বাইরের ব্যবহার দেখলে বোঝার উপায় নেই যে ও ভেতরে ভেতরে এতখানি ষড়যন্ত্র করার মত চিন্তাভাবনা করতে পারে। ও বড় মেয়েকে ভীষণ ঈর্ষা করে। যা করলে তাদের অশান্তি হয় উনি তাই করেন। যেমন বড়মেয়ে যখন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াবে তখন উনি ইচ্ছাকৃতভাবে ছোটখাটো বিষয়কে ছুতো করে চিৎকার করবেন, চেঁচামিচি করবেন, ছাদে গিয়ে বাঁশ কাটবেন, দরজা জানালার ছিটকানি সোজা করবেন, সে নানান কিছু করে সারা বাড়ি মাথায় করবেন। হয়তো ছোট মেয়ে পড়ছে, তখনও আওয়াজ করে তার পড়ার ডিসটার্ব করবেন— এমন অবস্থা যে তাঁর উৎপাতে কোন সুস্থ মানুষ পাগল হয়ে যাবে। আমাদেরতো ওঁনার কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হচ্ছে উনি সুনিপুণ অভিনয় করে চলেছেন। কেননা বাড়িতে আমাদের সঙ্গে এইরকম আচরণ করছেন আর বাইরের লোকের সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্যরকম ব্যবহার করছেন, যদি অসুস্থই হবেন তাহলেতো সবার সঙ্গে একই ব্যবহার করবেন।'

এবারেও মোহিতবাবুর সঙ্গে কথা বলে নতুন কিছু পাওয়া গেল না। উনি যেন আরও একটু শান্ত, শুধু অল্প কয়েকটা কথায় জানালেন ঘুমটা ভাল হচ্ছে, আগে যেমন ঘুম ভেঙে যেত মাঝরাতে সেটা হচ্ছে না। তবে অম্বলের সমস্যাটা রয়েই গেছে। এরপর বাড়ির লোকেদের অভিযোগের কথা বলতে চুপ করে রইলেন। শুধু জানালেন ওষুধ তাঁর কাছে থাকে, তিনি নিজেই ওষুধ খান।

মোহিতবাবুকে নিয়ে তাঁর বাড়ির লোক সত্যিকারের সমস্যার মধ্যে পড়লেন। সমস্যা আরও বেড়েছে বাড়িতে আর কোন পুরুষ সদস্য না থাকায়। মেয়েরা এবং স্ত্রী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, সেটাই স্বাভাবিক । চাকরি থেকে অবসর নেবার আগে তিনি ভালো মানুষ ছিলেন আর অবসর নেবার পর একেবারে বিপরীত মানুষ হয়েছেন। কোন কারণ ছাড়াই এমনটি হতে দেখলে অসুস্থতা ছাড়া অন্য কোনভাবে এই ঘটনা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ির লোকের সঙ্গে শত্রুতা করছেন এমনটি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অন্তমহিলা আরও একটা কথা বলেছেন। ওষুধ খাবার পর কোন পরিবর্তনই তাঁর

হয়নি, উল্টে সমস্যা বেড়েছে। আর গত রাত্রে তিনি বিছানায় পেচ্ছাব করে দিয়েছেন নিজের অজান্তে। এই সব শুনে অকালজরার কথাও মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনা যাইহোক ভদ্রলোক অসুস্থ এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাঁর অসুখটা ঠিক কী সেটাই আমাদের চিন্তার বিষয়।

অবসর নেবার আগে তিনি তুলনামূলকভাবে একটা পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতেন এবং বাড়ির লোকজনের প্রতি যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন, সেটা তাঁর স্ত্রীর কথা থেকেই জানা যায়। এখন যে তিনি বাড়ির কর্তব্য পালন করেন না এমন নয়, কিন্তু যা করেন তার চেয়ে বেশি উৎপাত করেন, বা বলা যায় বাড়ির লোকেদের যথেষ্ট অপমানজনক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এটা অনুমান করা যায় যে বাড়ির লোকজন ধৈর্য ধরে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করেছেন তারপর অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে এসেছেন। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এই ধরনের রোগের শ্রেণীবিভাগ করা শক্ত, কেননা কয়েকটি রোগের রোগলক্ষণ এর মধ্যে মিশে আছে। তবে প্যারানইয়া রোগের লক্ষণ বেশি বেশি মাত্রায় রয়েছে। অন্যান্য শারীরিক রোগের তুলনায় মানসিক রোগের নিরাময়ের একটা বড় সুবিধা আছে। শারীরিক রোগগুলির নিরাময়ের হার অল্পবয়সে অনেকগুণ বেশি, অন্যদিকে বড় মনোরোগগুলি অল্পবয়সে হলে সেরে ওঠা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বেশি বয়সে মনোরোগ হলে সাধারণত নিরাময় সম্পূর্ণ হয়, যদি না তা অকালজরাজাতীয় কোন স্নায়ুরোগ হয়।

মোহিতবাবুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কিছু গোলমাল থাকা অস্বাভাবিক নয় যা আগেও ছিল, এখন হয়তো তা পরিমাণে বেড়েছে এবং অনেক বেশি প্রকট হয়েছে। এখন তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব কোন নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক কাজে প্রকাশিত হবার সুযোগ না থাকায় এইসব অস্বভাবী আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর আর একটা দ্রুত নিরাময়ের অনুকূল দিক হল তাঁর বাড়ির লোকেদের সহানুভূতিশীল ব্যবহার। কিন্তু সুস্থ হলেও সারাদিন পরিকল্পিত কাজের মধ্যে মোহিতবাবুকে নিযুক্ত থাকতে হবে, নইলে সারাদিন তেমন কোন কাজ না থাকায় শূন্যতা হয়তো তাঁর অসুস্থতা নিরাময়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

মনোরোগীদের চিকিৎসার জন্য

যোগাযোগ করুন

পাভলভ মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার

98, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - 7

ফোন : 241-2935

(সোম থেকে শনি বিকেল 3 থেকে রাত্রি 8 টা, রবি সকাল 10 থেকে 1 টা)

পাভলভীয় কন্ডিশনিং-এর ওপর সমকালীন গবেষণা

একটি 'নতুন' কার্যিক বিশ্লেষণ (ফাংশোনাল অ্যানালিসিস প্রক্রিয়া)

বে এল. হুলিস

যে পাভলভের কন্ডিশনিং তত্ত্বের ওপর বিপুল সংখ্যক সমকালীন গবেষণা হয়ে চলেছে যা প্রকৃতিক পরিবেশে প্রাণীর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতকে গ্রহণ করেছে এবং যার উদ্দেশ্য হল কন্ডিশনিং আচরণের কার্যকারণ সম্পর্ক ও কার্যিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে একীভূত করা।

কিন্তু প্রাণীর শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিতে কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা, যা এতদিন প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তার কি পরিণতি হল? যদিও কিছু গবেষক শিক্ষাগ্রহণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে কাজ করতে করতে জৈবক্রিয়া সংক্রান্ত কাজকর্মকে উপেক্ষা করেছেন তবে অনেকেই একে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ধীরে কিন্তু অনমনীয়ভাবে পশুর শিক্ষাগ্রহণ তত্ত্বের কার্যিক বিশ্লেষণের বিষয়টি 'পষ্ট লক্ষ্য হিসাবে থেকে গিয়েছিল। কেননা এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী-কার্যকারণ পদ্ধতির আলোচনায় জ্ঞানাত্মক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ধরে রাখা বহু যোগসূত্র দেখিয়ে দিল। আমি ডিকিনসন-কে অনুসরণ করে এর নাম দিতে চাইছি 'জ্ঞানাত্মক ক্রিয়াকলাপের পরিপ্রেক্ষিত' যা আলোচনা করবে মানুষের বিভিন্ন ঘটনা, দেশকাল, সময় ইত্যাদির কার্যকারণ সম্পর্ককে খুঁজে দেখার বিষয় টিকে।

এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে উঠে আসা উত্তেজনাপূর্ণ গবেষণার কয়েকটি দিক নিয়ে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব। যদিও সামগ্রিকভাবে কোন সুসংহত পর্যালোচনার সুযোগ এই লেখায় পাওয়া যাবে না। তৎসত্ত্বেও যে গবেষণার বিষয়টি এখানে উল্লেখ করব বলে ঠিক করেছি তা "পাভলভীয় কন্ডিশনিং" এর ওপর সমকালীন গবেষণা অর্থাৎ নতুন কার্যিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত আলোচনায় উঠে আসা ধারণার পুনর্গঠনের ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ।

প্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিত

কিভাবে পাভলভের কন্ডিশনিং প্রাণীর খাদ্যসংগ্রহের ক্ষমতা, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করার ক্ষমতা, শিকারিকে এড়িয়ে চলার ক্ষমতা এবং সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে? গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক ঘটনা পূর্ব সংকেতে সাড়া দিয়ে একটি প্রাণী কিভাবে সুবিধা লাভ করতে পারে? পাভলভের লেখায় বার বার প্রাণীর জৈবিক ক্রিয়াকলাপের কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। যেমন তিনি বলছেন একটি প্রাণী খাদ্যের পরিবর্তে সাড়া দেয় তার অস্তিত্ব রক্ষার কারণেই। যদিও যে কেউ স্বীকার করবেন যে সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষার পরিবর্তে প্রাণীর "অভিযোজিত ওলাবলী" তার জিনগত কাঠামোর সংরক্ষিত হয় অসংখ্য নকলের মধ্যে। একে নব্যডারউইনপন্থীদের তত্ত্বে স্বীকার করলে মনে রাখতে হবে পাভলভের 'প্রাণীর আচরণের উদ্দেশ্যমুখীনতার প্রকাশ' -এর অনেক কাছাকাছি। বাস্তবিক পাভলভ খাদ্যের ব্যাপারে সাড়া দেবার যে কার্যিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন এটি বর্তমান কালের অনুমানভিত্তিক সাড়া দেবার একটি উদাহরণ এবং বর্তমান আধুনিক চিন্তা ভাবনা করার অনেক আগেই তিনি এই চিন্তা করেছেন। অতএব এটা বিস্ময়ের নয় যে যে সব গবেষকরা প্রাণী আচরণকে প্রকৃতিক পরিবেশে পরীক্ষা করার পরিপ্রেক্ষিতে কন্ডিশনিংকে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা এই জৈবক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সংকেত পদ্ধতি (যা পাভলভ ব্যাখ্যা করেছেন) তাঁদের ঐ কাজকর্মের স্বাভাবিক পরিণতিতে রস্তু ছুঁতে সাহায্য করে ইত্যাদি বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করেছেন। পরের অধ্যায়ে এ বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

আন্তঃপ্রজাতি আত্মরক্ষা: পুরুষে পুরুষে প্রতিদ্বন্দ্বীতা

1960 এর শেষভাগ এবং 1970 -এর শুরু থেকে শুলপন্থী প্রাণী, পাখি এবং মানুষের আক্রামক আচরণের ওপর যে গুরুত্বপূর্ণ কন্ডিশনিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল - এই গবেষণার স্রোত পরবর্তী পদক্ষেপে প্রাণীর অভিযোজন প্রক্রিয়ার দিকে পৌঁছাল। 'দা বেস্ট ডিফেন্স ইজ এ গুড অফেন্স' বই-এ আমি লিখলাম যে পুরুষ নীল গোরামি মাছ আমার পাভলভীয় আক্রামক সংকেত বুঝতে পারে সে অনেক ভালো

ধরবে অন্য পুরুষ মাছের তুলনায় নিজের অঞ্চল রক্ষা করতে পারে। তাছাড়া তারা আক্রামক আচরণের থেকে বিরত থাকে. এই সংকেতগুলিকে সেক্সেত্ব শর্তাধীন উদ্দীপনা বলা যায়। এর ফলে যে জায়গায় বা যে সময়ে দখলদার আসার সম্ভাবনা নেই সেখানে বা সেই সময় ঐ অঞ্চল রক্ষা করার কাজ থেকে পুরুষরা অব্যাহতি পায়।

আমার পরীক্ষাগারে সাম্প্রতিককালে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে পাভলভের সংকেত পদ্ধতিতে যে প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ এনে দেয় তা আমার পূর্বের অনুমানের তুলনায় অনেক ফলপ্রসূ থাকে। আক্রমনের সংকেত পেয়েছে এমন কয়েকজন পুরুষের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করে দেখা গেছে প্রত্যেক বিজয়ী এবং পরাজিত পুরুষ তিন দিন পরও সংকেত-বিহীন আক্রমনে একটি নতুন পুরুষের কাছ থেকে তার নিজের জায়গা দখল করতে বাধা হয়েছে। যে পুরুষ ক্লপদী পদ্ধতিতে কন্ডিশনড হয়েছে, যাকে প্রথম যুদ্ধটির ক্ষেত্রে সংকেত দেওয়া হয়েছে, সেই পুরুষ অন্য পুরুষদের তুলনায় প্রতিযোগীকে অতি সহজে পরাস্ত করেছে। প্রথম আক্রমনে পরাজিত সবাই দ্বিতীয় আক্রমনে পরাজিত হয়েছে।

গবেষণার এই ফলকে আমি এবং আমার ছাত্ররা নাম দিয়েছি, 'বিজয়ীরা জয়ী হবে এবং পরাজিতরা পরাজিতই থাকবে।' অঞ্চল দখলে রাখার ক্ষেত্রে পুরুষ প্রজাতির ইঁদুর, পাখি, টিকটিকি, বাঁদর ও মানুষের মধ্যে আক্রামক প্রতিযোগিতার জয় ও পরাজয় এই দুই ব্যাপারেই বেশ পরিচিত স্নায়ু-হরমোন পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের এই গবেষণার ফলের যথেষ্ট মিল রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় ঐ স্নায়ু হরমোন গবেষণার মধ্যে আমরা পাই যে বিজয়ীদের দেহে তাদের প্রতিপক্ষের তুলনায় নিচুমাত্রার কর্টিকোস্টেরয়েড এবং উঁচুমাত্রায় পুরুষহরমোন দেখা যায়। অন্যদিকে যে সব পুরুষরা পরাজিত হয় তারা aggressive stress syndrum -এ ভোগে।

বেশিরভাগ গবেষক যাঁরা 'জয়-পরাজয়' ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তারা মনস্তত্ত্ব পড়েন নি ফলে তাঁরা তাঁদের গবেষণা পদ্ধতিতে পাভলভের আকস্মিকতার ব্যাখ্যাকে বুঝতেই পারেন না। যেমন তাঁরা একই বিবাদক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাগুলিকে পরপর সাজিয়ে দেখতে পারেন না। তবে উইলিয়াম ও তার সহকারিরা পরাজিত ইঁদুরের ক্ষেত্রে কন্ডিশনিং এর ভূমিকাকে সরাসরি পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন পরাজয়ের সঙ্গে জড়িত ঘ্রানেন্দ্রিয়ের সংকেত পরাজিতদের মধ্যে নানা ধরনের তীব্র অভিযোজন প্রতিক্রিয়া তৈরি করে যার মধ্যে রয়েছে কন্ডিশন প্রক্রিয়া নিষ্ফল হওয়া ও বশ্যতা স্বীকার করা আচরণ। যদিও কেউ সরাসরি দেখেন নি কিভাবে পাভলভের সংকেত পদ্ধতি, পূর্বের বিজিতের পরবর্তী আচরণকে প্রভাবিত করে যার ফলে 'জয়ীরাই জয়ী হবে' এই ঘটনাই ঘটতে থাকে। একটি পরীক্ষায় যেখানে একধরনের অঞ্চলরক্ষাকারী সিরাজিম মাছের আচরণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে পুরুষরা সেইসব অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে যেখানে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আগে তাদের লড়াই হয়েছে এবং মাঝে মাঝে 'তফাৎ যাও' এই ধরনের আচরণ প্রদর্শন করে।

প্রতিপক্ষদের এড়িয়ে যাওয়া ও নিজের জাতের মধ্যে যে বেশি আধিপত্যকারী তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করা ছাড়াও কেউ কেউ বিপদজনক জড় পদার্থগুলিকে এড়িয়ে যেতে তাদের সন্তানদের এগুলি চিনতে শেখায়। এই ধরনের কন্ডিশনিং গবেষণায় দেখা গেছে এইরকম পীড়নমূলক উদ্দীপনাগুলি প্রাণীটির মধ্যে তীব্র অভিযোজন, প্রতিক্রিয়া গঠন করে ফলে এই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হলেই সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে টানটান মনোযোগের মধ্যে থাকে হয়, পরিবেশটিকে ঘ্রানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করে ও শেষে তাকে সমাধিস্থ করে।

এই অধ্যায়ে দেখিয়েছি আত্মরক্ষামূলক আচরণের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রাণীরা প্রকৃতিক পরিবেশের মধ্যে একগুচ্ছ পীড়নজাত উদ্দীপনায় নিজেদের মানিয়ে নেয়। যদিও গবেষকরা এই সব ধরনের আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতিকে পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করতে চান তবে তাঁরা সকলে স্বীকার করেন যে এইসব পীড়নজাত উদ্দীপনাগুলি প্রাণীটির মধ্যে প্রাথমিকভাবে ভয়ের উদ্রেক করে এবং এই ভাবে ভয়কে বিভিন্ন ধরনের সংকেতের মধ্যে সহজেই কন্ডিশনড করা যায়। গবেষকদের এই স্বীকারোক্তি অনেককে প্রাণী আচরণের এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ কিন্তু গুনগুলিকে অনুসন্ধান করতে সাহায্যে করেছে। উদাহরণস্বরূপ learned helplessness প্রতিক্রিয়ার প্রভাবকে আমরা পুনঃবিশ্লেষনের জন্য রাখতে পারি। এখানে অনিবার্য আঘাতের সম্মুখীন হলে প্রাণী তার পালানোর আচরণের পূর্বশিক্ষাকে ব্যবহার করতে সম্মুখীন হলে প্রাণী তার পালানোর আচরণের পূর্বশিক্ষাকে ব্যবহার করতে অসমর্থ হয়। এক্ষেত্রে ঘ্রানেন্দ্রিয়ের কন্ডিশনিং সংকেত যা নিজেদের জাতের মধ্যে পরাজয়ের ক্ষেত্রে প্রাণীদের আচরণের বিষয় মধ্যস্থতা করে ঐ সংকেতই learned helplessness প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বিচারশীল হয়। একইরকমভাবে বশ্যতা স্বীকার করা ও শরীর অবশ হয়ে যাওয়া এই দুটি বিশিষ্ট আচরণ যা ইঁদুরের learned

helplessness ঘটনায় দেখা যায় তার সঙ্গে অল্পুত মিল রয়েছে শেখানো অসহায়ত্বের দ্বারা পরিচিত হবার ঘটনাগুলোর। পরিশেষে বলা যায় উইলিয়ামস একটি বস্তুনিষ্ঠ মডেলের প্রস্তাব দিয়েছেন যেটা সাধারণভাবে পাভলভীয় কন্ডিশনিং প্রক্রিয়াকে চর্চা করতে সুবিধা হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে প্রাণীটির স্বয় সংরক্ষণ ধারণীয় আচরণ ; যেমন নিজের জাতের ক্ষেত্রে লড়াই, তেমনি খাদকের সঙ্গে লড়াই ইত্যাদি বিভিন্ন আত্মরক্ষামূলক আচরণ।

আত্মরক্ষামূলক আচরণ

প্রকৃতিক পরিবেশে প্রাণীর শিকারগ্রহণ আচরণের চর্চায় সঠিক ক্ষেত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে থোলস-এর মত ক্ষমতাসম্পন্ন কেউ ছিলেন না। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে পরিবেশের অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের ঘটনাবলীতে প্রাণীদের যে সহজাত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় পরিবেশজাত অর্জিত শিক্ষা প্রাণীর সহজাত প্রতিক্রিয়াকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে হয়তো পুরোপুরিভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ইঁদুর জাতির কয়েকটি নির্দিষ্ট আত্মরক্ষা মূলক আচরণ আছে যেমন নিশ্চল হওয়া, লড়াই করা, পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এবং যখন তারা কোন ধরনের ভয়ের সংকেত পায় তখন ঐ নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই তাদের আচরণ সীমাবদ্ধ থাকে। থোলের এই 'প্রজাতি নির্দিষ্ট' আত্মরক্ষামূলক আচরণ-এর তত্ত্বকে ভিত্তি করে কেনসলো একটি 'আচরণ পদ্ধতি' গঠন করেছেন যা বিরূপ মনোভাবজাত প্রতিক্রিয়ার আচরণে পরিলক্ষিত হয়। এই 'আচরণ পদ্ধতি' ই হল সেই আচরণ পদ্ধতি যা প্রাণীশিক্ষা গবেষণার পূর্বসূরীরা প্রাণীর প্রজননসংক্রান্ত আচরণের বিশ্লেষণে দেখিয়েছিলেন। যার মধ্যে রয়েছে পর পর ঘটে যাওয়া একধরনের আচরণ যা তার ফল ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রাণীর নিজের মধ্যে নিহিত উদ্দীপনা দিয়ে এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে চলে এবং প্রাণীটি নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠে। কেননা দেখিয়েছেন শিকারজীবী প্রাণীর বিপদ সন্নিকট হলে প্রাণীরা নিজের নির্দিষ্ট আত্মরক্ষামূলক আচরণ ছাড়াও আরও নানা ধরনের আচরণ ব্যবহার করে। যেমন শিকারজীবীর বিপদ থাকলে ইঁদুর একেবারে অনেকখানি খেয়ে নিয়ে বেশি সময় কাটানোর চেষ্টা করে বা শিকারজীবীর সম্মুখীন হলে ইঁদুরেরা সক্রিয়ভাবে বেশি আত্মরক্ষামূলক আচরণ করে যার মধ্যে রয়েছে লাফানো, কামড়ানো, ভয়ার্ত ধ্বনি প্রকাশ ইত্যাদি।

অতএব আচরণ পদ্ধতির কৌশল সমূহের ওপর আলোকপাত করে দেখা যাচ্ছে 'আত্মরক্ষা' যেন একটি পৃথক আচরণধারা নয় এর মধ্যে রয়েছে পর্যবেক্ষণের সাজানো অনেকগুলি কার্যকর্মের সমাহার। একটি বিশেষ পরিবেশে তাকে প্রাণী কন্ডিশনিং পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করা গেল কি গেল না এবং তার কিভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এটা বিস্তারিতভাবে বোঝার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী কেনসলো যথেষ্ট সফল লাভ করেছেন প্রাণীর আত্মসংযোগের ব্যবস্থার মধ্যাহ্নতায় আত্মরক্ষামূলক আচরণগুলিকে পরপর সাজিয়ে দেখানোর ক্ষেত্রে। এই লেখার শেষের দিকে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রাণীর আচরণ ব্যবস্থার পদ্ধতিকে বুঝে ওঠার ক্ষেত্রে কন্ডিশনিং এর চর্চা কতখানি সহায়ক।

পূর্বরাগ ও প্রজনন

1964 সালের শুরুতে কেরিস দেখালেন যে পুরুষদের তুলনায় নারীদের পূর্বরাগে এগিয়ে আসার কোন বাড়তি সংকেত পাওয়া যাচ্ছে না। পাভলভীয় সংকেত পদ্ধতির কথা মাথায় রেখে দেখা গেল জাপানী পুরুষ তারই পাখির ঔর্ধ্বপ্রজনন ত্বরান্বিত হচ্ছে। বৃদ্ধাঙ্গুলমে কেরিসের এই হয়তো ঔর্ধ্বপ্রজনন ত্বরান্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে কন্ডিশনিং পূর্বরাগকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা জানা গেল না। এটা বাদ যাওয়ার ফলে সেইসবরকমের জীববিজ্ঞানের চিন্তা ভাবনার ধারায় কার্যিক বিশ্লেষণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হল না। অথচ গত 12 বছর ধরে পাখি, ইঁদুর, মাছ ইত্যাদির মধ্যে গবেষণার একই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এখন বোঝা যাচ্ছে, সহজ সরলভাবে শুধুমাত্র প্রজনন সংক্রান্ত আচরণকে বোঝার ক্ষেত্রে নয় তত্ত্বের দিক থেকে প্রজননসংক্রান্ত আচরণে কন্ডিশনিং এর প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত।

ইদানীংকালের যৌন আচরণ কন্ডিশনিং এর ক্ষেত্রে দুটি গবেষণা কর্মসূচিকে প্রধানা দেওয়া হচ্ছে। এর একটি জোয়ন্সনের জাপানি পুরুষ তারই পাখির আচরণগত পদ্ধতি ব্যবহার মধ্যে যৌন আচরণের বিষয়টি। এটাকে কেনসলো-র উল্লেখিত আত্মরক্ষামূলক আচরণের মত একধরনের পরীক্ষা বলা যায়। এখানে জোয়ন্সন দেখিয়েছেন পুরুষ তারই পাখির যৌন আচরণের ক্ষেত্রে পাভলভীয় কন্ডিশনিং -এর সংকেত পদ্ধতি কিভাবে কার্যকরী উদ্দীপকগুলিকে নির্দিষ্ট করে ও নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যৌন আচরণ সংক্রান্ত কন্ডিশনিং যৌন নিয়ন্ত্রণকারী উদ্দীপনার সংখ্যাকে পরিমাণে ও গুণে বৃদ্ধি করে যদিও তারই পাখি গুরুতে স্ত্রীদের গানকলাকৌশলের বৈশিষ্ট্য সংকেতে সাড়া

দেয় না. কিন্তু কয়েকবার যৌন অভিজ্ঞতার পর তারা এই সংকেতগুলিতে কন্ডিশনড হয় ও পরবর্তী এই উদ্দীপনায় যৌন আচরণে সাড়া দেয়। একই রকম ভাবে প্রকৃতিক পরিবেশে পুরুষরা স্ত্রীদের পাওয়ার জন্য যে প্রসঙ্গিক অর্থপূর্ণ সংকেতদ্বারা কন্ডিশনড হয় সেগুলি তাদের প্রজাতিবিশেষের নির্দিষ্ট সংকেত হিসাবে স্ত্রীদের খুঁজে বার করা ইত্যাদি যৌন আচরণের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রকৃতিক পরিবেশে প্রাণীর আচরণ-এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় তাদেরই পাখির যৌন আচরণ সংক্রান্ত কার্যকলাপ পাভলভীয় কন্ডিশনিং-এর মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার প্রাণীদেহে অবস্থিত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোটি বুঝে উঠতে সাহায্য করে। এই কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে বাধা সৃষ্টি করা, কন্ডিশনড নিস্ক্রিয়তা, ইশারায় অনুসরণ করা ইত্যাদি।

আমার মনে একটু অন্যধরনের চিন্তা ছিল। যেমন আমি জানতে চেয়েছিলাম স্ত্রী ও পুরুষদের এই কন্ডিশনিং পদ্ধতিতে যাওয়ার জন্য বিশেষ প্রজনন সংক্রান্ত সুবিধা কি হয়। নীল পেরাকিস মাছের যৌন আচরণের কন্ডিশনিং খুঁজে দেখার জন্য আমি ও আমার ছাত্ররা কাজ করছিলাম। আমাদের পরীক্ষায় দেখলাম, পাভলভীয় কন্ডিশনিং -এর ফলে পরিচিত একটি যৌন আচরণ যেমন স্ত্রীরা তাদের অঞ্চলে প্রবেশ করলে প্রথম প্রথম পুরুষদের যে আক্রমণ আচরণ দেখা যেত তা কমে যায়। এখানে স্ত্রীরাও পুরুষদের মুখোমুখি হবার সংকেতগুলি অনুমান করে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু স্ত্রী তাদেই পাখির তুলনায় এখানে একটা তফাৎ দেখা যায় যে এখানে স্ত্রী ও পুরুষ গোরমিস মাছ উভয়েই একাধিক সঙ্গী পছন্দ করে।

সম্প্রতি আমি ও আমার ছাত্ররা ক্লপসী কন্ডিশনিং এর জন্য সরাসরি প্রজনন সংক্রান্ত আচরণের যে সুবিধা হয় তা পরীক্ষামূলকভাবে দেখাতে পেরেছি। একটি পুরুষ সংকেতে অভ্যস্ত হলে ওষুধের যে স্ত্রীদের অন্য পুরুষের আক্রমক আচরণকে প্রতিহত করে তাই নয় তাদের ঐ স্ত্রীদের মধ্যে নিষিক্ত ডিম্বাণু উৎপাদনে বেশি সহায়তা করে। ক্লপসী কন্ডিশনিং -এ থাকার ফলে পুরুষরা বাসা তৈরিতে বেশি সময় দেয়, স্ত্রীর সঙ্গে বেশি মাত্রায় সহবাস করে এবং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারা অনেক বেশি মজবুত সন্তান সন্ততি প্রতিপালন করে যা কন্ডিশনিং না হওয়া পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

আমাদের পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সঙ্গে গ্রাহাম ও ডেসজারডিন-এর গবেষণার মিল রয়েছে যেখানে তাঁরা দেখাচ্ছেন যৌন হরমোন নিঃসরণের ক্ষেত্রে ক্লপসী কন্ডিশনিং করা যায়। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যৌন আচরণের সমস্ত অংশটিতে ক্লপসী কন্ডিশনিং ঘটলে তা সবদিক থেকে মজবুত ও সুবিধাযুক্ত হয়। এই তত্ত্ব কাজে প্রকৃতিক পরিবেশের আচরণবিদদের কাছে প্রাণীর সঙ্গীর বাইরে সময় করার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎবাণী কি করা সম্ভব—এই ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধিৎসা গড়ে তোলে। প্রজননসংক্রান্ত আচরণকে আরও সফল করার জন্য জোর সঙ্গী ছাড়া অন্য সঙ্গীর সঙ্গে সহবাসের ক্ষেত্রে পাভলভীয় কন্ডিশনিং -এর ওপরই প্রাণীটিকে বেশি করে নির্ভর করতে হয়।

খাবার চেনার প্রবৃত্তিজাত শিক্ষা

মৌমাছি থেকে মানুষ অবধি খাবার চেনার প্রবৃত্তিজাত শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাভলভীয় কন্ডিশনিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন কোন প্রজাতির প্রাণী ছোট বয়েস থেকেই খাবার চিনতে শেখে অর্থাৎ কোনটা খাবার যোগ্য এবং কোনটা নয়। ঘুঘু, মুরগির ছানা ইত্যাদি প্রাণীদের খাবার চেনার আনুষঙ্গিক পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে যথাযথভাবে চর্চা করা হয়েছে। দেখা গেছে মুরগির ছানার খাবার চেনা খুব সোজাসুজি অনুষঙ্গিত হয়, শুধু খাবার ঠোকর দিয়ে খেলার পর্যায়টুকুই এখানে শেখার বিষয়। তুলনায় ঘুঘুর ছানারা যখন নির্ভরশীল অবস্থা থেকে স্বনির্ভর হয় এই উৎক্রমনের সময়ে খাবার চেনার জন্য অনেক শিক্ষার দরকার হয়।

জন্মের পর প্রথম তেরো দিন ঘুঘুর ছানারা মা, বাবার ওগলানো খাবার খেয়ে বড় হয় যার মধ্যে মা বাবার গ্রাসনালীর উঠে আসা মৃদু কেরাও থাকে। এই খাবার দেওয়া তিন দিন থেকে শুরু হয়? এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাসনালীর কোষের পরিমান কমে ও খাবারের পরিমান বাড়ে। শুরুতে মা-বাবা নিয়মমত খাওয়ানোর পরে পরে ৯-10 দিনের মধ্যে ছানাদের খাবারের চাহিদা বাড়ে বিশেষ করে মা বাবা যখন তাদের বাসায় ছেড়ে যায়। 13 থেকে 15 দিনের মাথায় তারা খাবার ঠোকরাতে শুরু করে তখন থেকেই মা-বাবার ওগলানো খাবার দেওয়া আরও কমে যায় এবং 21 দিনের মাথায় কোন ওগলানো খাবার মা-বাবা দেয় না।

বালসাম ও তাঁর সহকর্মীরা দেখিয়েছেন খাবার চেনার এই নির্ভরশীলতা থেকে স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবার আচরণ মধ্যস্থতা করে। মা-বাবার ওগলানো খাবারের মধ্যে শস্যদানার সঙ্গে গ্রাসনালীর মৃতকোষ থাকে এবং এর সংবেদনে অভ্যস্ত হয়ে ছানারা শস্যদানা

মাঝে মাঝে গোটা গোটা নিয়ে শুরু করে ফলে ঐ ওগলানো খাবারের হদিশ ও ঠিল খুঁজে পায়। পরে পরে মা-বাবা ওগলানো খাবার কমিয়ে দিলে তারা শস্যদানার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়। দেখা যায় খাবার চোকরানোর মধ্যে দিয়ে ছানারা পাওলভীয় অনুখন পদ্ধতি তৈরি করে নেয় এবং গ্রাস করা শস্যদানার ফলাফলের অনুভূতির সঙ্গে তাকে অনুখন্ধিত করে। যদিও বালসায় ও তার সহকর্মীরা দেখিয়েছেন পাওলভীয় কন্ডিশনিং পদ্ধতিই একমাত্র মাধ্যম নয় যার দ্বারা ছানারা খাবার চিনতে শেখে কিন্তু কোনটি খাবার এবং কোনটি খাবার নয় এটা চেনার ক্ষেত্রে পাওলভীয় কন্ডিশনিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাসায়নোত্তর রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা

আকস্মিকভাবে রাসায়নোত্তর রোগপ্রতিরোধব্যবস্থার আবিষ্কার এখন পাঠ্যপুস্তকের চলতি বিষয়। সাইক্লোফসফেমাইড নামক একটি ক্যানসারের ওষুধে স্বাভাবিক রসায়নোত্তর কন্ডিশনিং নিয়ে চর্চা করছিলেন বিজ্ঞানী এফের। সাইক্লোফসফেমাইড ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কেননা এটি একটি শক্তিশালী রোগপ্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণকারী যৌগ। এই ওষুধ ব্যবহার করার পর যে বমির ভাব হয় তাকে কন্ডিশনিং করা সম্ভব। এফের তাঁর কাজের ক্ষেত্রে যে সমস্যায় পড়েছিলেন তা হল ইঁদুরের মধ্যে স্যাকারিন রসের বিরূপ কন্ডিশনিং কাটাতে গিয়ে তিনি তাদের জের করে স্যাকারিন মেশানো জল খাওয়াতে শুরু করলেন। ফলে দেখা গেল ইঁদুরগুলি মরে যাচ্ছে। এর খুব সহজ ব্যাখ্যা করা হল যথা: ছাল ও ওষুধের ডোজ বদলের ফলে স্যাকারিন হয়ে দাঁড়াল অতিশক্তিশালী রোগপ্রতিরোধব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী একটি যৌগ। এর পরের অংশ ইতিহাস।

ওপর এই আবিষ্কারের পর এফের ও কেন্দ্রের দেখালেন এই রসায়নোত্তর কন্ডিশনিং রোগপ্রতিরোধব্যবস্থা রসায়নকারী রোগ লুপাস এরিথেমেটোসাস রোগের ক্ষেত্রেও সাইক্লোফসফেমাইড ব্যবহার করে করা যায়। এরপর এফের এই তত্ত্ব চালু করলেন যে কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকারক সাইক্লোফসফেমাইড জাতীয় ওষুধ ব্যবহার না করে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে কন্ডিশনিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

রোগপ্রতিরোধব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষেত্রে প্রয়োগ ছাড়াও রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা উজ্জিবীত করার জন্যও কন্ডিশনিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। ক্যানসারের ক্ষেত্রে মানবদেহে যে ক্ষতিকারক পদার্থগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেমন ন্যাচারাল কিলার সেল, কন্ডিশনিং পদ্ধতিতে সেই অবস্থাকে আরো ভালো করা যায় এবং সেখানে ওষুধের কাজও আরও মজবুত ও তরান্বিত হয়। অবশেষে রাসেল দেখালেন কন্ডিশনিং পদ্ধতির সাহায্যে দেহের মধ্যে হিস্টামিন নিঃসরণ করানো সম্ভব যেটা সেই ঘটনার ব্যাখ্যা দিল যাতে ।৪৪৬ সালে একজন আমেরিকার চিকিৎসক লিখেছিলেন যে একটি প্লাস্টিক গোলাপের গন্ধ শুঁকলেও এক রোগীর হাঁচি হয়।

ভেষজ সহনক্ষমতা এবং শারীরনির্ভরতা

যদিও পাওলভ তাঁর পরীক্ষাগারে ইনজেকশান দিয়ে ওষুধ সংক্রান্ত কন্ডিশনিং তৈরি করেছিলেন কিন্তু কিভাবে ওষুধের সহনক্ষমতা ও শারীরনির্ভরতার ওপর কন্ডিশনিং পদ্ধতি কাজ করে এ সম্পর্কে বিস্তারিত, সম্পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করলেন সিগেল। খুব সংক্ষেপে বললে, বিশেষ সংকেত দিয়ে আফিমজাতীয় ওষুধ, অ্যালকোহল, বেনজাইট্রিডিন, বেনজোডায়াজেপিন, হ্যালোপেরিডল, কেফিন ইত্যাদি খাইয়ে বা ইনজেকশন করে এইসব ভেষজের বিরুদ্ধেই আচরণগত ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া· সম্বন্ধে কন্ডিশনিং করা সম্ভব হয়েছে। এটা যে সম্ভব হয়েছে তা শরীরের সহনক্ষমতার জন্য যেখানে দীর্ঘদিন একটি ওষুধ ব্যবহার করার পর ওষুধের বিক্রিয়া কমাবার জন্য শরীর সেটিকে দ্রুত ভেঙ্গে দেবার পদ্ধতি তৈরি করে ফলে অল্পমাত্রায় সেই ওষুধটি আর আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয় না। কন্ডিশনিং মডেল হবার জন্য এর থেকে নিম্নলিখিত পূর্বানুমান করা সম্ভব। 1. ভেষজ সহনক্ষমতা নির্দিষ্ট পরিবেশ পরিস্থিতিতে দেখা যায়। 2. উপযুক্ত সংকেত দিয়ে সহনক্ষমতা শিখিয়ে দেওয়া যায় যাকে পরে ভেষজটির সঙ্গে অনুখন্ধিত করা যায়। 3. কোন কোন সময় ওষুধমাত্র সংকেত ব্যবহার করে সহনক্ষমতা নির্বাপিত করা যায়। 4 হঠাৎ করে অল্প উদ্দীপনার সমাবেশে সহনক্ষমতা 'উধাও' হয়ে যেতে পারে যেমন হঠাৎ করে তৈরি হওয়া যে কোন পরিচিত উদ্দীপনার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। এই ঘটনাই পাওলভের ভাষায় 'এক্সটারনাল ইনহিবিশন'।

ডেবক অপব্যবহারের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটে তার অনেকগুলি পাভলভীয় কন্ডিশনিং মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন ডেবকের মত শর্তহীন উদ্দীপনা না নিয়ে তার অনুরূপিত সংকেত ব্যবহার করেই প্রত্যাবর্ত -প্রতিক্রিয়া ঘটানো যায়। এখানে নেশাখোর, শর্তাধীন উদ্দীপনার সবলশক্তিটুকু অনুভব করে। ডেবকের জন্য শারীরনির্ভরতা বলা হয় তখনই যখন ঐ ডেবক ছাড়া কোনভাবে প্রত্যাবর্তন প্রতিক্রিয়া কমানো যায় না। ক্রমাগত ওষুধ ব্যবহারের ফলে এক আশ্চর্যরকম বেশিমাত্রার ওষুধ যা হয়তো শুরুতে তার বিষক্রিয়া ঘটাতো, নেশাখোর সহ্য করতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টে গেলে এই ডেবকের মাত্রাও কমে যায় এর থেকে বোঝা যায় নতুন পরিস্থিতিতে কন্ডিশনিং পাল্টেযায় যা ওষুধের মাত্রা কমিয়ে নেশাখোরটিকে অতিমাত্রার ওষুধের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করে। দেখা গেছে পরিস্থিতি পাল্টে গেলে পূর্বের মাত্রায় হেরোইন, অ্যালকোহল, কোনোবারবিটেন, মরফিন ইত্যাদি ডেবক নতুন পরিস্থিতিতে বিষক্রিয়া মাত্রায় পৌঁছয়। সুতরাং বলা যায় ডেবক-কন্ডিশনিং -এর অনুরূপ একটি ঘটনায় দুটি দিক থেকে বাঁচার একদিকে তার সহনক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় অন্যদিকে নেশা ছাড়তে সাহায্য করে। আর অন্য কোন ক্ষেত্রে কন্ডিশনিং -এর প্রভাব এত নাটকীয়ভাবে ঘটে না।

জ্ঞানাত্মক পরিপ্রেক্ষিত

1950 ও 1960 সালে যে সব প্রাণীর শিক্ষাগ্রহণ চর্চারত মনোবিজ্ঞানী গবেষণা করছিলেন তারা খোঁজ করছিলেন প্রাণীর আচরণের এমন কতকগুলি সাধারণ সূত্র যা দিয়ে গবেষণাগারে বন্দী থাকা পরীক্ষিত ও অপরীক্ষিত প্রাণীদের মধ্যে একইরকম ভাবে প্রয়োগ করা যায়। এইধরনের কাজ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশ্ববিদ্যাসারসংগ্রহের পরিমাণে কন্ডিশনিং এর ঘটনা জড়ো করে ফেললেন কিন্তু যা অভাব ছিল এই সব তথ্যগুলিকে কোন সাধারণ তত্ত্ব বা প্রকল্প দিয়ে বেঁধে ফেলা। বহিরোক 1960 সালের শেষের দিকে দুটি গবেষণা দিয়ে শুরু করে ক্রমশ একটা তত্ত্বপ্রকল্প দানা বাঁধতে শুরু করে তা হল পাভলভীয় কন্ডিশনিং এর মাধ্যমে প্রাণীরা কোন ঘটনার পূর্বানুমান করতে পারে। অন্য কথায় বলা যায় কন্ডিশনিং এর দ্বারা কার্য কারণ সম্পর্কের অর্থ উদ্ধারে যথেষ্ট সাহায্য করে। অবশ্য এখন এইসব পূর্বানুমানের কথা বললে কেউ 'মানসিক' ইত্যাদি ছাপ দেবে না কিন্তু শুরুতে প্রচলন অনুযায়ী এই পূর্বানুমান পদ্ধতিকে গ্রাহ্য করা হোত না। এখন একটা দরজার ঢোকার মুখে যেন একটা পা আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি এবং শুধুমাত্র তথ্য আহরণ না করে সেই তথ্য থেকে জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার একটা সুসংহত চর্চার দিকে আমরা যাত্রা করেছি।

এই নতুন জ্ঞানাত্মক পরিপ্রেক্ষিত মানিয়ে নিতে হচ্ছে খুব দ্রুত লয়ে। তবে 1980 সালের শুরুতেই এই রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছে যখন এই প্রকল্পের নাম হয়েছে জ্ঞানাত্মক পরিপ্রেক্ষিত এবং কি বিষয় নিয়ে চর্চা হবে তাও নির্দিষ্ট হয়েছে। যদিও ডিকিনসন, রেসকোলা প্রায় একই মতামত রাখছেন যে পাভলভীয় কন্ডিশনিং তার পরিচিত গণ্ডির বাইরে কতখানি গভীর ও ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে।

আরো বেশি করে আমি জ্ঞানাত্মক পরিপ্রেক্ষিতের গবেষণার বিষয়টিতে আলোকপাত করতে চাই কেননা এর মধ্যে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বোঝার জিনিষ রয়েছে যা পূর্বেকার অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলি বুঝতে সাহায্য করবে। আমার মতে এটা করবেই কেননা প্রাণীর শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ার গবেষকরা বাধ্য হচ্ছেন কন্ডিশনিং প্রক্রিয়াকে স্বীকৃতি দিতে। এটা এইজন্য যে প্রাণীরা কোন যুক্তিতে এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে এটা ভাবা বা বলার কোন সুযোগ নেই কেননা এই যুক্তির মর্মবস্তু হল প্রকৃতিক নির্বাচন এই সত্যটা সবাই মেনে নিয়েছেন। নীচে যে প্রশ্নটা আমি করতে চাইছি এই অংশটি সুসংগঠিত করার জন্য তা সেই পুরানো বিষয় যা ম্যাকিনটশ্ বহুবছর আগে তুলেছিলেন। যদিও জ্ঞানাত্মক পরিপ্রেক্ষিত এবং তার কার্যকারীতার বিষয়টি স্বীকার করলে প্রশ্নটির উত্তর হবে গভীর ও ব্যাপক।

শর্তাধীন ও শর্তহীন উদ্দীপক কিভাবে অনুরূপিত হয়

আধুনিক কালের চিন্তাভাবনায় পাভলভীয় কন্ডিশনিংতত্ত্বের ওপর দুটি পরীক্ষা মোড় ঘুরিয়ে দেয়। রেসকোলা 1968 সালে দেখালেন যে সহজভাবে শর্তহীন ও শর্তাধীন উদ্দীপক পাশাপাশি এসে গেলেই এদের মধ্যে অনুরূপ গড়ে ওঠে না। কারণ প্রাণীটি এই সম্ভাব্যতার শিক্ষা গ্রহণ করে যে ঐ আনুষ্ঠানিক উদ্দীপকটি থাকলে বা না থাকলে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে। অন্যকথায় বলতে গেলে প্রাণীটি একটি শিক্ষারীতীতীয় ধরার পড়েছে কিনা তা কোন আওয়াজের মধ্যে যোগাযোগ যথেষ্ট নয় যদি না সে আওয়াজ সম্পর্কে প্রাণীটির নির্দিষ্ট কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা

যাচ্ছে। ঠিক এইরকম অন্য আর একটি পরীক্ষায় কেমিন দেখালেন যে শর্তাধীন উদ্দীপনার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যায় কোন একটি শর্তহীন উদ্দীপনার জোরালো অনুষঙ্গ তৈরি হওয়ার থেকে যখন ঐ শর্তাধীন উদ্দীপকটিকে আগে থেকেই কোন জোরালো সংকেত দিয়ে অনুষঙ্গিত করা হয়। এই দুটি পরীক্ষা থেকেই জন্মা তোল কন্ডিশনিং এর মধ্যে প্রাণীদের যে শিক্ষাগ্রহণ হয় তাতে ঘটনাগুলির বৃদ্ধি সম্বন্ধে অর্থ কারণ সম্পর্ক রয়েছে।

প্রাণীর শিক্ষাগ্রহণের তাত্ত্বিক গবেষকরা যখন এই ধরনের কন্ডিশনিং এর ধারণা গ্রহণ করলেন এটা তাঁদের নতুন তত্ত্বগঠনে উদ্বুদ্ধ করলো যেখানে প্রাণীর মধ্যে কিভাবে বৃদ্ধির সম্পর্কগুলি প্রোথিত হয়ে রয়েছে। এইসবে একগুচ্ছ চর্চা পথে তোলার চেষ্টা চললো যাতে দেখা যাবে শর্তহীন ও শর্তাধীন উদ্দীপনার মধ্যে প্রাণীটি কি ধরণের শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। যেমন প্রাণীটির যে প্রাসঙ্গিক পরিবেশে শর্তহীন ও শর্তাধীন উদ্দীপনাগুলি দেখা যায় তাকে সে শিক্ষা করার চেষ্টা করে। এবং এই প্রাসঙ্গিক পরিবেশ প্রাণীটির আচরণ নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টি করে। আবার প্রাণীটি শর্তাধীন উদ্দীপনা থেকে একেবারে নির্দিষ্ট কোন কিছু পাবার আশা করে। আকাঙ্ক্ষাগুলি এইরকম, যা অনেকে বলে থাকেন যেমন যাতে যথাযথভাবে প্রাণীটি শর্তহীন উদ্দীপনার সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। শেষে এবং বিশেষ ভাবে যেটা বলার কথা তা হল এখন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে প্রাণীরা ক্রমোচ্চবাদের পরিবেশের অনেক জটিল সংকেত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে সমর্থ।

এই ক্রমোচ্চবাদের প্রাণী শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়ার লক্ষ্য করার মত উদাহরণ হল পর পর সাজানো ঘটনা বা একটি ঘটনার অপরটিতে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা - এইসব ক্ষেত্রে একটি শর্তাধীন উদ্দীপনা শুধু একটি সংকেত নয় একাধিক শর্তহীন উদ্দীপনার সংকেতের অনুষঙ্গ হিসাবে কাজ করছে। উদাহরণ স্বরূপ একটা টোন শর্তাধীন উদ্দীপনা হয়েও সেটি অন্য একটি শর্তাধীন উদ্দীপনা যেমন আলোর সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে যা প্রাণীটিকে খাবারের সংকেত দিতে পারে। এক্ষেত্রে খাবার আগে আলো বা টোন যে কোন একটি উদ্দীপক একই প্রতিক্রিয়া ঘটাবে। আগে যেমন ভাবা হত তার থেকে তুলনামূলকভাবে নতুন কিছু ঘটনার প্রকাশ 'পরিবেশ-সাজানো' গবেষণার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে যাতে মনে হচ্ছে কন্ডিশনিং এর আরো অনেক বেশি ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কোন কোন গবেষক জানাচ্ছেন যে নিরন্ত্রিত পরিবেশ-সাজানো ক্ষেত্রে এবং প্রাসঙ্গিক অবস্থার ক্ষেত্রে আচরণের মিল হয়েছে ফলে প্রাসঙ্গিক অবস্থার নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি পুনর্মূল্যায়ন করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। অন্য কিছু গবেষক মতামত দিচ্ছেন যে পরিবেশ-সাজানো অবস্থাটিতে মূলতঃ কন্ডিশনিং -এর নির্দেশনা প্রক্রিয়া কাজ করছে, যেখানে একটি শর্তাধীন উদ্দীপনার পরই একটি শর্তহীন উদ্দীপনা দেওয়া হচ্ছে। এটার ব্যতিক্রম ঘটছে শুধুমাত্র যেখানে শর্তাধীন উদ্দীপনাটি নঞর্থক উদ্দীপনা হিসাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্য যদি সঠিক হয় তাহলে প্রাণীরা কিভাবে ঘটনাগুলিকে সংকেত সম্পর্কের মধ্যে ধরে রাখে সে বিষয় সম্পূর্ণ নতুন রকম চিন্তাভাবনা করতে হবে। এক ধাঁচ থেকে উপযুক্ত অন্য ধাঁচে বিশ্লেষণের ফলাফল যাইহোক না কেন পরিবেশ-সাজানো গবেষণা প্রক্রিয়া সম্পর্কে চর্চা আমাদের এই শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে আগেকার বোঝাপড়ার অনেক পরিবর্তন ঘটাবে এবং কি করে শর্তহীন ও শর্তাধীন উদ্দীপনা দুটি অনুষঙ্গিত তা জানাতে সাহায্য করবে।

এই একই প্রশ্ন-কিভাবে শর্তহীন ও শর্তাধীন উদ্দীপনা অনুষঙ্গিত হয় এ ব্যাপারে জানতেঅনেক গবেষক এখন অন্বেষণশীলপ্রাণীদের নিয়ে কাজকর্ম শুরু করেছেন। যাইহোক এই গবেষণা কর্মসূচির প্রচেষ্টা দুটি প্রশ্নকে বিশ্লেষণের জন্য আনছে। একদিকে যেন কিছু গবেষক যারা বিভিন্ন ধরনের অন্বেষণশীল প্রাণী নিয়ে কাজকর্ম করছেন যেমন কিতা কৃমি, ফলের মাছি, ছোক ইত্যাদি তাঁরা দেখাবার চেষ্টা করছেন জন্তুদের স্তরে অনুষঙ্গের শিক্ষা কিভাবে একে অপরের জন্য মধ্যস্থতা করছে। অনেক গবেষণাগার থেকে এই রকম বহু তথ্য আসছে যে পাভলভীয় কন্ডিশনিং স্নায়বিক গঠনীয় কার্যিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে যেমন স্নায়ুসন্ধির আগে ক্রিয়ানির্ভর তৎপরতার ঘটনা। ফলে এইসব পর্যবেক্ষনের মধ্যে আমরা কানেকসেনিস্ট মডেলিং-এর ধারণার আরও ঝুঁকে পড়ছি যাতে অন্তর্নিহিতার গঠনের মধ্যে স্নায়বিক জালিকার পরিকাঠামোকে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই সবকিছুই পাভলভীয় কন্ডিশনিং ঘটনার বহু ব্যাপক বিচিত্র ক্ষমতাকে পূর্বানুমান করার ক্ষমতা দিচ্ছে।

অন্যদিকে বিচারমান ও কৌতূহলী অন্বেষণশীল প্রাণীদের কন্ডিশনিং সম্পর্কে ভিন্ন উদাহরণ সহযোগে দেখাচ্ছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ধরনের পাভলভীয় কন্ডিশনিং-এর ঘটনাকে পরীক্ষা করে দেখা বিশেষ করে মধুমাছিদের ক্ষেত্রে। যেখানে অনুসন্ধী ও অন্বেষণশীল প্রাণীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার পার্থক্য ও মিলগুলি প্রকাশ পাবে। আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে অমিল খুব সামান্যই মিলই বেশি। এই

মিল ও অমিলের বিষয়টি একদিকে জীবের বিবর্তনে উঠে আসা আচরণের সাদৃশ্যের তুলনামূলক আলোচনায় সাহায্য করছে অন্যদিকে শর্তহীন ও শর্তাধীন উদ্দীপনা অনুসৃত হওয়ার জন্য গবীয়ে কোন কোন বিষয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে সে ব্যাপারেও নতুন করে আলোকিত করছে।

শর্তাধীন উদ্দীপনায় সাড়া দেবার এই প্রকৃতির নির্ণায়ক কে?

পাভলভ বিশ্বাস করতেন শর্তাধীন উদ্দীপক, শর্তহীন উদ্দীপকের প্রতিনিধি বা পরিবর্ত সুতরাং সাধারণ প্রকৃতি ও আকৃতির দিক থেকে শর্তাধীন ও শর্তহীন ভাবে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল থাকবে। বাইরোক প্রাকৃতিক পরিবেশে , জৈবিকভাবে অর্থপূর্ণ ঘটনাগুলি অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের প্রতীক ব্যবহার করে সংকেত জানায় এবং প্রাণীদেরও প্রস্তুত থাকতে হয় এই সব প্রতীকগুলিকে বিভিন্ন ভাবে যাতে কাজে লাগাতে পারে। যেমন খাবার গর্তের মধ্যে আবার ঢোকাতে হবে এর জন্য সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে তাকে কাঠের গুড়ির তলায় সেটিকে লক্ষ্য করে বা কোপের মধ্যে শিকার যে শব্দ তৈরি করছে তাকে নির্দিষ্ট করতে হবে-খাবারের এই সংকেতগুলি বিভিন্ন হওয়ায় তার জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে সাড়া দিতে হবে। ইঁদুর, দেখা ও শোনা উদ্দীপকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সাড়া দেয় ও আচরণ করে। যেমন শব্দ করে কোন খাবার উদ্দীপনা ইঁদুরের সামনে এলে সে চমকে ওঠে কিন্তু মাথার ওপর এমন কোন উদ্দীপনার কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হলে সে পেছনের পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে। তুলনায় শর্তাধীন উদ্দীপকটি সংকেত দিলে ইঁদুর এগিয়ে যায়, সেটা শোঁকে এবং তা নিয়ে আর পাঁচজনকে ডাকে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে তৈরি কোন শর্তাধীন উদ্দীপনা দেখে ফিরে এসে সে এক বিশেষ ধরনের সামাজিক আচরণ প্রদর্শন করে বিশেষত খাবার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে।

বোধ হয় টিনবারগেনের কাজ থেকেই আমরা সবচেয়ে বেশি উত্তর পাচ্ছি এই প্রশ্নের যে প্রকৃতিতে শর্তাধীন ভাবে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে প্রাণীদের কোন্ ঘটনা নিয়ন্ত্রন করে। টিনবারগেনের কাজ ছিল ইঁদুরের খাবার নেবার আচরণ সম্পর্কে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে যে ইঁদুররা খাবার সামনে আসার পূর্বানুমান করেই যে শুধুমাত্র বিভিন্নভাবে আচরণ করে তাই নয় অন্যদিকে একই শর্তাধীন-শর্তহীন উদ্দীপক জোড়ের প্রতিক্রিয়ার কিরকম ভাবে সে সাড়া দেবে তা নির্ভর করে কত সময় অন্তর তার কাছে শর্তাধীন ও শর্তহীন উদ্দীপকগুলি হাজির হচ্ছে। যেমন খাবার নাড়াচাড়া করা এবং গ্রহণ করার প্রক্রিয়াটিতে দ্রুত কন্ডিশনিং ঘটে বিশেষত শর্তাধীন উদ্দীপক জানায় যে খাবার সামনেই রয়েছে। অন্যদিকে কাছেপিঠে ও দূরে কোথাও খাবার খোঁজ করার বিষয়টি কন্ডিশনিং হতে যথেষ্ট সময় লাগে। গবেষণার এই ফল দেখে বোঝা যাচ্ছে যে শর্তাধীন-শর্তহীন জোড় উদ্দীপকের ব্যবধান সময় বেশি হলে দুর্বল অনুষঙ্গ গঠিত হবে-আগেকার এই সাধারণ তত্ত্বকে নতুন করে কার্মিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে।

কার্যকরী শর্তাধীন ও শর্তহীন পরাবর্ত কিভাবে তৈরি হয়?

প্রথমতঃ শর্তাধীন ও শর্তহীন উদ্দীপনাকে একে অপরের কিছারে অভিনব হতে হবে। এর অর্থ হল শর্তহীন উদ্দীপকের সঙ্গে জোড় না বেঁধে শর্তাধীন উদ্দীপককে হাজির করা যাবে না। অথবা শর্তাধীন উদ্দীপক আগে না হাজির করে শুধু শর্তহীন উদ্দীপক দিয়েও কোন কাজ হবে না। এমন পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রাণীরা শর্তাধীন উদ্দীপকে সাড়া দেবার শিক্ষা খুব মন্থর গতিতে পায়। পরীক্ষার এই ফলাফলগুলি সহজেই জ্ঞানাত্মক পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করা যায়। যদি পাভলভীয় কন্ডিশনিং কার্যকারণ সম্পর্কের সংকেত লিপির অর্থোদ্ধারের প্রক্রিয়া হয় তাহলে এর মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা থাকবে যার দ্বারা সে প্রকৃতিতে ত্রুটিপূর্ণ সংকেতকে এড়িয়ে যেতে পারবে কেননা প্রকৃতিতে কার্য ও কারণ পরপর বিশ্বস্ততার সঙ্গে জানা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাগ্রহন প্রক্রিয়া দ্রুততর হয় যদি শর্তাধীন ও শর্তহীন উদ্দীপনা একইসঙ্গে উপযুক্ত ও মানানসই হয়-এই ঘটনা প্রথম প্রদর্শন করেন গার্সিয়া ও কোয়েলিং। তাঁদের প্রথম পরীক্ষায় ইঁদুরদের দুটি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। এর একটি স্বাদের এবং অন্যটি দৃশ্য ও শ্রবণের শর্তাধীন উদ্দীপনা। ঠিক এর পরেই হয় তাদের 'শক' দেওয়া হল বা অসুস্থ করে তোলা হল। ইঁদুরদের মধ্যে যারা 'শক' পেল তারা স্বাদের উদ্দীপনার ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করল। তুলনায় দৃশ্য ও শ্রবনের উদ্দীপনার ইঙ্গিত অনুসৃত হল যাদের 'শক' এর সঙ্গে পরিচয় ছিল। অন্যদিকে যে সব ইঁদুরদের অসুস্থ করা হল তাদের ক্ষেত্রে উল্টো ঘটনা ঘটল। এই ঘটনার একটি কার্মিক বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে দেখা গেল যে সব প্রাণীর স্বাদের সংবেদ যথেষ্ট শক্তিশালী যেমন ইঁদুর, মানুষ তারা খাদ্যে বিষক্রিয়ার ইঙ্গিত অনেক ভালোরকম পায় অন্য কোন বাইরের

ঘটনার তুলনায়। আর ব্যথা পাওয়ার পরিবেশ কিরকম হতে পারে তা একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়েই ধরে নেওয়া যায়। এই কার্মিক বিশ্লেষণ, প্রাণীদের একধরণের তুলনামূলক পূর্বানুমানের ব্যাপারে করা যায় বিশেষতঃ যারা খাবার বাছাই করার জন্য ঘ্রাণের ওপর নির্ভর করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অধিকাংশ পাখির পরিপাক তন্ত্র ততখানি উন্নত নয় এবং তারা খাবার বাছাই এর জন্য ঘ্রাণের তুলনায় পর্যবেক্ষনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। সুতরাং তাদের মৃদু উদ্দীপকে বিরূপতা অনেক বেশি হবে স্তন্য ও ঘ্রাণের উদ্দীপকের তুলনায়। ঠিক এর উল্টো ঘটনা ঘটে ইঁদুরদের ক্ষেত্রে। মুরগির ছানা ও তিতির পাখির ওপর গবেষণা করে এই অনুমান নিশ্চিত করা গেছে। এছাড়া কন্ডিশনিং-এর জৈবিক প্রাসঙ্গিকতার এপর ধারাবাহিক, দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে লো লোর্ডো এবং তাঁর সহকর্মীরা পায়রার ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে শুধুমাত্র দৃশ্যসংক্রান্ত উদ্দীপক খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার আবিপতাবিস্তার করে তাই নয় তাকে কোনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ জৈবিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক দৃশ্যসংক্রান্ত উদ্দীপক খাদ্যগ্রহণ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তা এমন অবস্থায় করে যখন অন্য মাধ্যমের উদ্দীপনায় খাবারের পূর্বানুমান করা যাচ্ছে। এইসব ও অন্যান্য উপযুক্ত ও মানানসই ক্ষেত্রে, এইসব ঘটনাকে যা আখ্যা দেওয়া হয়, তাতে ভালভাবে বুঝিয়ে দেয় কার্যকারণ সংক্রান্ত কার্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এরা কত অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার

স্থানাভাবে গবেষণার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক আমি এখানে জানাতে পারলাম না। তবে আমি আশা করি যে আমি দেখাতে পেরেছি যে জৈবিক কর্মক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে পাভলভীয় বৈজ্ঞানিক ধারণা আগে গড়ে উঠেছিল যাকে আগে 'বিজ্ঞানসম্মত নয়', 'অপ্রাসঙ্গিক' ইত্যাদি বলে বাতিল করা দেওয়া হয়েছিল। এখন তা আবার নতুন করে সংযোজিত হচ্ছে ফলে সাইকোলজিস্টদের পাভলভীয় কন্ডিশনিং সম্পর্কে ভাবনা চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। রেসকোলা 1988 সালে ইস্টার্ন সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে একটি লেখা পাঠ করেন এই নামে "পাভলভীয়ান কন্ডিশনিং : ইট ইজ নট হোয়াট ইউ থিঙ্ক ইট ইজ" তিনি নথিভুক্ত করেছেন গত 20 বছরে এই ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন ঘটেছে। আমি এই লেখায় যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছি তা হল শুধুমাত্র এই পরিবর্তনগুলি অতীত থেকে কার্মিক বিশ্লেষকদেরকে এক নতুন ছকে এনে দিয়েছে তা নয় পরিবর্তে বলা যায় প্রাণীর শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ার মনোবিজ্ঞানের ভবিষৎ বৃদ্ধি ও বিকাশ নির্ভর করছে এই কার্যকারণ সম্পর্ক ও কার্মিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিষয়গুলির ধারাবাহিক সুসংহত বিকাশের ওপর।

আমেরিকান সাইকোলজিস্ট

সেপ্টেম্বর 1997

অনুবাদ: তাপসী বিশ্বাস

মনোজগত — প্রশ্নোত্তর

(উত্তরদাতা — ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রশ্ন— 1

প্রশ্নোত্তর বিভাগের উত্তরদাতা মাননীয় চিকিৎসককে জানাই-জুলাই '99 -এর মর্মস্পর্শী প্রশ্ন এবং তার উপযোগী উত্তর জীবন ভালো লেগেছে। কিন্তু এপ্রিল '99 -এ নতুন প্রজন্মকে সামগ্রিক ভাবে কেন কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন ? এ কথা সত্যি আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের কারণে আজকের প্রজন্ম আগের প্রজন্মের থেকে অনেকটাই আলাদা। কিন্তু তার মানে কি এই যে আজকের প্রজন্মের সকলেই impulsive এবং আত্মসর্বস্ব ? ব্যতিক্রম কালও ছিল আজও থাকছে। সুতরাং কোন বিবেচক ব্যক্তির কাছে এই আশাই কি করব — গোটা প্রজন্ম সম্পর্কে নেতিবাচক উপসংহার টেনে তাদের বিরুদ্ধে একীভূত করবেন ? কিছু মানুষ তো নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা আজকের প্রজন্মের দোষ-ত্রুটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের সঠিক পথ চেনাতে পারেন। মনে হয় না তাতে আজকে দেশের যা পরিস্থিতি, ভবিষ্যতে তার থেকে খারাপ কিছু হবে।

শ্রীরূপা গঙ্গোপাধ্যায়
কাঁচরাপাড়া

উত্তর— 1

মাননীয়া শ্রীরূপা

গত এপ্রিল'99 সংখ্যার প্রশ্নোত্তরে আমার দিক থেকে যদি একটি সমগ্র প্রজন্মকে ছোট করা হয়ে থাকে, তাহলে সত্যিই আমি আন্তরিক ভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। উত্তরে আমি যা বোঝাতে চেয়েছিলাম তা হল নতুন প্রজন্মের এই বৈশিষ্ট্যতা আমরা পূর্ব সূরীরাই গড়ে তুলেছি। কোন বিশেষ একটি প্রজন্ম কখনোই দোষী হতেপারে না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয় সামাজিক সংকটের চারা গাছ। কোন একটি প্রজন্মে এসেই সেটা মহীরুহ হয়ে ওঠে। আর তাছাড়া সকলে কখনোই নয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিশেষ কোন একটি প্রজন্ম ব্যাপক সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত তো হতেই পারে। নইলে সে ব্যাধিকে আর সামাজিক ব্যাধি বলব কেন। আত্মকেন্দ্রিকতা আর আত্মসর্বস্বতা গড়ে ওঠার কারণগুলো যদি সমাজে জোরালো ভাবে বিরাজ করে তাহলে তার গড়ে ওঠাটাই তো প্রাকৃতিক ভাবে সত্য। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, ইংরাজী মাধ্যমে পড়া, বাণিজ্যভিত্তিক সংস্কৃতি, আমাদের সামাজিক যোগসূত্র গুলোকে খণ্ডিত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। অস্তিত্বের সংকটে প্রতিযোগিতায় সামিল হয়ে নিজের জায়গাটুকু করে নিতে হচ্ছে,— এ ঘটনা তো ঘটছেই। আগের প্রজন্মের যাঁরা আজ মা-বাবা তাঁরাও তো আক্রান্ত, সন্তানকে সামনের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনে। তাই শুধু এ প্রজন্মই আত্মসর্বস্বতায় ভুগছে না। হঠাৎ করেই কোন এক প্রজন্মে কোন একটি গুণ তো শুরু হয়ে যেতে পারে না। হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু যেহেতু শৈশব ও কৈশোর—ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সবচেয়ে মূল্যবান সময়—এ প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ সেই সময়টা এই সামাজিক সংকটের ভেতর দিয়ে পার হবার পথে আত্মসর্বস্ব হয়ে পড়েছে আরও বেশি। তাদের সামনে আদর্শের প্রতি অনুরাগ মানবিক মূল্যবোধ এসবের উদাহরণ বা অনুপ্রেরণার কোন মাইলস্টোন থাকছে না। পরিবেশ নিরপেক্ষভাবে কোন একটি প্রজন্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তো কখনোই বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। অবশ্য একটি মাত্র উজ্জ্বল দিক গড়ে উঠেছে এ প্রজন্মের ক্ষেত্রে তো হলো বাইরের পৃথিবীর সাথে ব্যাপক যোগাযোগ কিন্তু তাও দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রধানতঃ প্রতিযোগিতা আর ব্যক্তিস্বার্থের পটভূমিতে।

প্রশ্ন— 2

এপ্রিল '99 সংখ্যার মানবমনের প্রশ্নোত্তরে, শৈশব-কৈশোর সমস্যার ক্ষেত্রে আপনি ইংরাজী মাধ্যমে শিক্ষাকে দোষারোপ করেছেন। আমি কিন্তু আপনার এই মত মানতে পারছি না। ইংরাজী তো আজকের পৃথিবীর প্রধান আন্তর্জাতিক ভাষা। আজকের এই Globalisation -এর যুগে মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফলে পৃথিবী কিন্তু ক্রমশঃ একটি ভাষার উপর দাঁড়াতে চলেছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা সে ভাষা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে পৃথিবীর সামগ্রিক অগ্রগতি থেকেই পিছিয়ে পড়বে না কি? আজ শুধুমাত্র ইংরাজী জানবার সুবাদেই দেশের বিভিন্ন সংস্থার ও প্রতিষ্ঠানে সহজেই কর্মসংস্থান হয়ে যায়।

আমার ছেলেটিকে ইংরাজী থেকে দূরে সরিয়ে রেখে উচ্চ শিক্ষা ও সামগ্রিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিপদ সংকুল পথে এগিয়ে দেব কেন? আর তাছাড়া ইংরাজী আমাদের জাতিকে, দেশের বাইরের যে পৃথিবী তার সাথে তো একাত্মীকরণ ঘটাচ্ছে!

অনন্যা চক্র
সোদপুর

উত্তর— ?

প্রকৃত Globalisation কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের এক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। বিভিন্ন জাতিসত্তার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব সত্তা বজায় রেখেও একটি অখণ্ড সত্তার অংশ হয়ে ওঠা। এতো বহুকাল, বহুযুগ ব্যাপী মানবসভ্যতার এক অনন্তধারা। এক ধরনের রাজনৈতিক Globalisation -এর চেষ্টা হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধের ভয়াবহ রক্তপাতের মাধ্যমে বিভিন্ন যুগে। যেমন আলেকজান্ডার করতে চেয়েছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার পৃথিবীকে জার্মানীর পদতলে আনতে চেয়েছিলেন। এ তো Globalisation নয় আধিপত্য, ঠিক এমনিই এক Globalisation এর নামে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চলেছে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর। জাতিসত্তার Globalisation নয়। এ হল অর্থনৈতিক Globalisation.

আরও লক্ষ করবার বিষয় হলো এই Globalisation-এ আদান প্রদান হয় না। হয় এক পক্ষিক চাপিয়ে দেওয়া। এক পক্ষের আধিপত্য, অন্যের বশ্যতা। অনুকরন করতে বাধ্য করানো। ভারতের দুর্বল অর্থনীতির অনুকূল পরিবেশ শক্তিশালী পশ্চিমের চাপিয়ে দেওয়া ভাষা ও সংস্কৃতি নিজেদের বাজার তৈরির লক্ষ্যে।

যে ভাষার মধ্যে দিয়ে শিশু-কিশোর তার পৃথিবীকে চেনে, তার আবেগের সাথে জড়িয়ে পড়ে সে হল মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় দুর্বল মানুষ দেশের ও জাতির আবেগ অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ক্রমাগত, নিজের জাতিসত্তাই যার কাছে অচেনা থেকে যায়, দেশকে সে আর এগিয়ে নিয়ে যাবে কি ভাবে। একমাত্র মাতৃভাষাতেই সে তার সম্পূর্ণ খাঁটি আবেগ দিয়ে নিজের মাটি ও জাতিকে, তার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর ইতিহাসকে অনুভব করতে পারে, ঠিক ঠাক চিনতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কথাটা খুব মনে পড়ছে এই সময় — ইংরাজী হচ্ছে কাজের ভাষা, আর বাংলাটা হলো ভাবের ভাষা। ভাবটা শূন্য হয়ে গেলে কাজটা তো তাহলে অকাজ হয়ে উঠবে।

ইংরাজী ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আমাদের মাতৃভাষাভিত্তিক জীবন্ত ও আন্তরিক শিক্ষার সাথে বহির্বিশ্বের সাথে যোগসূত্র তৈরি করবে। যার মধ্যে দিয়ে দেশ, বাইরের সংস্কৃতির সাথে Globalisation এর পথে পা বাড়াতে পারবে। অন্যথায় ভেতরটা শূন্য হয়ে গেলে কোন্ শক্তি দিয়ে আমরা বাইরের ঘটনায় অংশ নিতে পারবো? আর কর্মসংস্থান? সে প্রশ্ন একটু অন্যরকম। আমরাই সম্মিলিত ভাবে পারি একে প্রতিরোধ করতে । সবার সাথে আপনাকেও সামান্য ও সাময়িক কিন্তু পার্থিব ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ শুধু নয়, আপনার নিজের অস্তিত্বের কথা ভেবেও। কারণ ইংরাজীতে শিক্ষিত আপনার ছেলে তার অতীতকে তার মায়ের মুখকে, মায়ের সমরকে স্বীকার করবে না, কেননা, সে সবই যে বাংলা ভাষায় রচিত।

চিঠিপত্র

মানবমনের সাথে আমার পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়। প্রথম যখন এটি হাতে পাই তখন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মৃত্যু শয্যায় এবং পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীও সম্ভবতঃ কিছুটা মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিক্ষুব্ধতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। দেখে ভাল লাগছে পত্রিকাটি ধীরে ধীরে আবার সুবিন্যস্ত হচ্ছে সুচিন্তিত ভাবনার প্রকাশ-স্বরূপ। তবে বিষয়ের নির্বাচন মাঝে মাঝে অবাক করে। যেমন এপ্রিল '99 সংখ্যার 'ব্যাকরণ মানি না' প্রবন্ধটি। নিঃসন্দেহে অনেক পরিশ্রম করে সুন্দর বাঁধুনী দিয়ে বক্তব্যটি পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না এমন একটি বিষয়কে এত গুরুত্ব দেওয়া হল কেন। লেখক কি চান এই বিশ্বায়নের (globalisation) যুগে আমরা আঞ্চলিক ভাষা আঁকড়ে ধরে শুধু নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে ভাব বিনিময় করি? ব্যাকরণ না মেনে লিখলে তাঁর বক্তব্যই কি পরিষ্কার হত পাঠকবর্গের কাছে?

'মানবমন'- এর কাছে অবশ্যই আশা করি না সব লেখাই সবার বোধগম্য হবে। কিছু বিষয়ভিত্তিক লেখা ছাপার দরকার নিশ্চয়ই আছে — অন্তত পাঠক কূলের একটা অংশের কথা ভেবেও। 'মানবমন' - এর নিয়মিত বিভাগগুলির মধ্যে 'চিত্তবিদের ডায়েরী' এবং 'প্রশ্নোত্তর বিভাগ' দুটি একই সঙ্গে মূল্যবান এবং চিত্তাকর্ষক। তবে প্রতি সংখ্যার প্রশ্নোত্তর বিভাগে আরেকটু বেশি জায়গা দিয়ে আরো বেশি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যায় না কি? মনে হয় তাতে অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হবেন।

পরিচালকমণ্ডলীকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই এপ্রিল '99 সংখ্যায় স্টিফেন লেভিনের 'সেরে ওঠা কাকে বলে' শীর্ষক অ-সাধারণ নিবন্ধটি এবং তার পরিপূরক ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'মৃত্যুর যন্ত্রণা-অন্যজীবন' নিবন্ধটি ছাপার জন্য। লেভিনের বক্তব্যের যত গভীরে প্রবেশ করেছি ততই সেরে ওঠার dynamic definition বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। একথা সত্যি শারীরিকভাবে আমরা সবাই cancer -এর শিকার নই ; কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে যে অবক্ষয়ের বাসা বেঁধেছে এবং আমরা প্রত্যেকে যে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারি না - এই বক্তব্যে নিশ্চয়ই বিতর্কের অবকাশ থাকে না। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অনুভূতিশীল মন শিকার হয় হতাশা আর বিষাদের। মন যুদ্ধ করতে থাকে নানা দ্বন্দ্বের সাথে, বিঘ্নিত হয় ভারসাম্য। এই প্রেক্ষাপটে হ্যাজেলের "একই সঙ্গে যন্ত্রণাকাতর দশহাজার জন" - এর সাথে নিজের ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে সর্বজনীনতায় উত্তীর্ণ করা এক অনন্য উপলব্ধির সৃষ্টি করে। 'বেদনার স্পন্দনের মধ্যে জীবনের পুনর্মূল্যায়ন', 'মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, প্রতিটি নিঃশ্বাসই একবার করে বাঁচা' প্রভৃতি উক্তিগুলি মনে বহুক্ষণ অনুরণিত হতে থাকে। 'নিজের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং বেঁচে থাকার অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া -যা আগে নিজের অগোচরে ছিল' - এই বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করার পর মনে এক ধরণের শান্ত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে। আর এখানেই বোধ হয় মানবমনের সার্থকতা।

ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছান্তে,

শ্রীরূপা গঙ্গোপাধ্যায়
কাঁচড়াপাড়া
উত্তর 24 পরগণা

মানবমন-এর 'পাঠক-সভা'য় আমি উপস্থিত ছিলাম। তবে শুধুই শ্রোতা হিসেবে । সেদিন আলোচনা শুনে আমার যা মনে হয়েছে তা লিখিতভাবে জানালাম। যদি প্রয়োজন মনে করেন, ছাপাবেন। আজ প্রায় 10 বছর ধরে পত্রিকাটি আমার লেখা লেখির কাজে, সংগঠনিক কাজে তথ্য প্রদান করেছে; আমার শিক্ষকের কাজ করেছে। আজও করছে। তাই ব্যবস্থাপকদের আলোচনায় যখন নীতির প্রশ্নে তাঁদের মধ্যেকার চিন্তার ভিন্নতা প্রকাশ পেল তখন এমন একটি মূল্যবান পত্রিকা প্রকৃত সংকটে পতিত হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

পত্রিকার সমস্যা বিষয়ে ব্যবস্থাপকদের আলোচনায় যে ক্ষেত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছে বলে আমি বুঝতে পেরেছি সেগুলি হল—

1. নীতির প্রশ্ন (এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের মধ্যেই মতভেদ আছে)। 2. পত্রিকার প্রচার ও বিক্রয়। 3. পত্রিকা প্রকাশনা ও মুদ্রণের সমস্যা। 4. দূরত্বতা। 5. ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তা। 6. আর্থিক অবস্থা (যদিও আপনি বর্তমানে আর্থিক সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন)। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত রাখছি। পূর্ণ বা আংশিক, গ্রহণ বা বর্জন আপনাদের ইচ্ছাধীন।

১. নীতির প্রশ্ন

ক) পত্রিকার নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে যদি পাঠকদের মতামতই চূড়ান্ত নির্ণায়ক হয় তবে কখনই কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাবে না এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আপনাদেরই নিতে হবে এবং সেটাই হবে চূড়ান্ত।

খ) এতদিন প্রয়াত ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশাল ব্যক্তিত্ব সমস্ত ব্যবস্থাপকগণকে আবৃত করে রেখেছিল। তাঁর অবর্তমানে একসঙ্গে অনেক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমন্বয় ঘটাবার মত সাংগঠনিক দক্ষতা ব্যবস্থাপক বা পারিচালকমণ্ডলীর কাছ থেকে পাঠকরা আশা করে। এটা যুগের দাবী। কাজেই সমস্ত ব্যবস্থাপকদের কাছে নীতি স্বচ্ছ ও দ্বিধাহীন থাকবে এবং কাজে ও চিন্তায় সমন্বয় থাকবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে চলা হবে এটাই কাম্য। এবং এই লক্ষ্যেই ব্যবস্থাপকদের স্থির থাকতে হবে।

২. পত্রিকার প্রচার ও বিক্রয়

পত্রিকার প্রচার ও বিক্রয়ের কী ব্যবস্থা আছে, জানিনা। তবে অন্য অনেক অনামী পত্রিকার প্রচার যেভাবে চোখে পড়ে এই পত্রিকার ক্ষেত্রে তাও চোখে পড়েনা। প্রচারের এলাকা এখনই গ্রামমুখী করে হয়ত লাভ হবে না, তবে কলকাতা ছাড়াও মফস্বল শহর ও অন্যান্য শহরে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে এক্ষেত্রে :

ক) স্কুল কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পোস্টার ও স্টিকার লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) সংক্ষিপ্ত আকারে ইস্তাহার ছেপে শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে হবে।

গ) বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

ঘ) পরবর্তীকালে আকাশবাণী ও দূরদর্শনে বিজ্ঞাপন।

ঙ) বর্তমান গ্রাহকদের কাছে বিক্রয় বৃদ্ধিতে সাহায্য চেয়ে পত্র দ্বারা উৎসাহিত করা। যাতে লেখা চিঠিতে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বেশি উৎসাহের সৃষ্টি করে।

চ) জায়গায় জায়গায় আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা ও পত্রিকার পক্ষ থেকে তথায় বিশেষজ্ঞ প্রেরণ।

(উপরোক্ত কাজের সময়ে সময়ে মূল্যায়ন করা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন ।)

৩. পত্রিকা প্রকাশনা ও মুদ্রণের সমস্যা

ক) এ সমস্যাটা একান্তই আভ্যন্তরিক। দক্ষ ও নিষ্ঠাবান লোক না পাওয়া পর্যন্ত এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাবে না। আংশিক হারের সাময়িক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারলে এ সমস্যা সমাধানের সুযোগ বাড়বে।

খ) সম্ভাব্য স্থলে ছবির সাহায্য নিলে ভাল হয়।

৪. দুরূহতা

দুরূহতা এই ধরনের পত্রিকার ক্ষেত্রে এড়ানো সম্ভব নয়। তবে কোন কোন সময়ে কোন কোন লেখকের পাণ্ডিত্যের গভীরতা দেখানোর উদ্দেশ্যে দুরূহতার আশ্রয় নেবার প্রবণতা দেখা গেছে। এটা সর্বদা বর্জনীয়। সহজ করতে গিয়ে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার সাবলীলতা হারানো বা দুরূহ করার জন্যই দুরূহ করা— কোন পদ্ধতিই ঠিক নয়। এদিকটা সম্পাদক দেখবেন। সেদিন সভায় সম্পাদক যে বক্তব্য রেখেছিলেন "....পাঠককেও নিজেকে তৈরি করে নেবার দায়িত্ব নিতে হবে"....তার এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত । সকলকেই মনে রাখতে হবে এই পত্রিকা প্রাথমিক স্তরের পাঠকদের জন্য নয়; কেন কিছুটা এগিয়ে থাকা পাঠকদের জন্য।

৫. ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তা

হিন্দিতে একটা প্রবচন আছে— "গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠে বিকায়ে"। প্রবচনটি তুলসীদাসের না কবীরের ঠিক মনে নেই। যাঁরই হোক প্রবচনটির নিগূঢ়ার্থ— দুগ্ধওয়ালাকে গলি গলি ঘুরে ঘুরে দুধ বিক্রি করতে হয়, কেননা দুধ মানুষের মঙ্গলে লাগে। অথচ সুঁড়ি মদ নিয়ে দোকান খুলে বসে থাকে, মাতালরাই তা ক্রয় করতে নিজে হাজির হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আপনার পত্রিকার ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তা তো আপনাদের ভাবার বিষয় হবার কথা। আপনারা তো সুরা বিক্রেতা নন, দুধ বিক্রেতা! ক্রিকেটের মাদকতা, সিনেমার মাদকতা, খেরিয়ার তৈরির মাদকতা, ভোগ্যপণ্য সংগ্রহের মাদকতা, সব প্রতিযোগিতায় জেতার মাদকতা, স্টাটাসের মাদকতা, নীতিবিহীন রাজনীতির স্রোতে ভেসে চলার মাদকতা, অর্থের মাদকতা, জাতীয়তা- জাতপাত-আঞ্চলিকতার মাদকতা— অর্থাৎ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানবচেতনাকে মাদকাসক্ত করে তুলতে যে ভাবে সফল হয়েছে (আপাততঃ) সেই মানবচেতনার স্তরে দাঁড়িয়ে আপনি পাঠক পাবেন কোথায়? আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আপনাদের পত্রিকার প্রথম চাইল্ড এর পিতা-মাতার কাউন্সেলিং এর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো। কলকাতার প্রথম চাইল্ডের অভাব না থাকলেও যার বিনা পয়সায় দেওয়া সেবা ক'জন পিতা মাতা নিতে আগ্রহী হয়েছিলেন? সেদিনের সভায় আপনার বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছিল যে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (বর্তমানে মন্ত্রী) এই পত্রিকা ঘাড়ে করে নিয়ে বাজার করতেন। আপনাদের পত্রিকা থেকে তাত্ত্বিক জ্ঞান, তাঁর হয়ত যথেষ্ট সংগ্রহ করতে পেরেছেন কিন্তু তাঁর বর্তমান ব্যবহারে সেই তত্ত্বের কোন প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় কী? আসলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীটাই পাল্টে যাচ্ছে। রক্ষণশীলতার প্রতি ঝোঁক বেড়েছে। বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বুদ্ধিকে পণ্যে পরিণত করে ফেলেছেন। প্রতিবাদী কণ্ঠগুলি তাদের সাহস হারিয়ে ফেলেছে। ঝুঁকি নেবার ইচ্ছা কমে যাচ্ছে।

কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। বৈচিত্রহীন ভোগবাদের সীমাবদ্ধতা এবং তার অসারতা মানুষকে ক্লান্ত করে তুলেছে। সে কারণেই আপনাদের নেমে যাওয়া 22 জন গ্রাহক থেকে আবার 300-তে পৌঁছিয়েছে। প্রতিক্রিয়ার যুগে নিজেদের দায়িত্ব এভাবেই পালন করতে হবে। নিরবচ্ছিন্নভাবে।

এছাড়া পাঠক সংখ্যা কমে যাবার জন্য যে কারণগুলি আমার অনভিজ্ঞ নজরে ধরা পড়েছে সেগুলি হল—

ক) পত্রিকাটিতে সমাজবাদী ভাবধারার প্রচারের পাশাপাশি তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুজুড়ে যে বিচ্যুতি ঘটেছে সেগুলিও বিশ্লেষণ করা হয়েছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তবুও পত্রিকাটি বুদ্ধিজীবীদের অলঙ্কার হিসাবে যতটা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সমাজবাদী আন্দোলনের অগ্রচারী বাহিনীর হাতিয়ার হিসাবে ততটা পারনি। পত্রিকার মূলনীতিকে আপোষহীনভাবে অক্ষুন্ন রেখে এটি যাতে অগ্রচারী বাহিনীর হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে সে পথ নির্ধারণের দায়িত্ব ও কৌশল ব্যবস্থাপকদেরই গ্রহণ করতে হবে। এখানেই পত্রিকাটির সার্থকতা।

খ) একে তো বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের পথেই অন্তরায় স্বরূপ। তার উপর বাঙালীর মুখ থেকে বাংলা ভাষাকে কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র অত্যন্ত গভীর এবং এই ষড়যন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশীদার বাঙালীদেরই এক শক্তিশালী অংশ। বাড়িতে পত্র পত্রিকা রাখা এখন যতটা না পাঠের জন্য তার থেকে অনেক বেশি স্ট্যাটাস-সিম্বল-এর জন্য। প্রকাশকরাও এটা বোঝে বলেই লেখার সঙ্গে পাঠকদের যে অংশটা গেলাতে চায় সেই অংশটা দৃষ্টি আকর্ষণী করে আলাদাভাবে পুনরুক্তি করে দেয় যাতে ব্যস্ত বা অমনোযোগী পাঠক এটুকু গিলেই বোদ্ধা হয়ে উঠতে পারে। তার বেশি কিছুতেই নয়।

এই অবস্থায় বাংলাভাষায় প্রকাশিত সমাজপ্রগতির দিশারী এইরূপ এক পত্রিকা যদি 38 বছর চালু থাকতে পারে, সমাজের প্রয়োজনেই তা বেঁচে থাকবে। তবে প্রয়োজনটা যাদের তাদের খুঁজে বার করার কৌশল স্থির করতে হবে।

6. আর্থিক অবস্থা

সভায় যদিও সম্পাদক জানিয়েছেন যে পত্রিকার আর্থিক অবস্থা এখন মজবুত, তবুও, আমার মতে, তাকে দৃঢ়তর করে রাখা সুবিবেচনার কাজ হবে। তাছাড়া পত্রিকা প্রকাশের কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠকদের অংশগ্রহণ তাদের উৎসাহী এবং দায়িত্বশীল করে তুলবে এবং পত্রিকার সঙ্গে তারা আত্মীয়তা অনুভব করবে। সেই হিসাবে আমার প্রস্তাব —

ক) গ্রাহকদের চিঠি দিয়ে এবং সাধারণ ভাবে মানবমন-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠকদের কাছে দাম হিসাবে সাধ্যমত অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাতে হবে। অর্থ পেলে পত্রিকায় নাম প্রকাশ করে এবং চিঠির মাধ্যমে প্রাপ্তি স্বীকার করে তাদের সম্মানিত করতে হবে।

খ) পত্রিকার দাম বাৎসরিক 60 টাকা এবং তিনবছরের জন্য 170 টাকা করতে হবে।

গ) পাঠক/গ্রাহক যাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহের সুযোগ আছে তাদের কাছে বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করতে হবে।

অনেকদিন ধরে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। আপনারা চিঠি দিয়ে এই সুযোগ করে দিয়েছেন। এজন্য ধন্যবাদ। ভাল হোক, মন্দ হোক আমার ভাবনা আমি পেশ করলাম। উপযুক্ত-অনুপযুক্ত বিচার করা এবং প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জনের বিষয়টি আপনাদের এক্তিয়ার। আপনারা মতামত চেয়েছেন, তাতে সাড়া দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করছি।

পত্রটির প্রাপ্তি স্বীকার বা আপনাদের অভিমত জানতে পারলে খুশী হব। আপনাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকুক আন্তরিকভাবে এই কামনা করছি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

প্রসাদ ভট্টাচার্য
ন'পাড়া,
হুগলী

পুস্তক আলোচনা

লাল কাচের ভেতর থেকে পাভলভকে দেখা

নির্বাচিত রচনাবলী - পাভলভ (মস্কো)

জে গিবনস দ্বারা সম্পাদিত

এস বেলস্কি অনূদিত

[ডাঃ গ্যান্ট 1922 সালে পেট্রোগ্রাদে আমেরিকান রিলিফ এডমিনিস্ট্রেশন-এর একজন অজ্ঞাত গবেষক চিকিৎসক- শিক্ষানবীশ হিসাবে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি পাভলভের দল পান। তিনি লিখেছেন—'শর্তাধীন পরাবর্তের গবেষক হিসাবে পাভলভের স্বচ্ছ ধারণা এবং বুদ্ধিদীপ্ত উদ্ভাবন কুশলতা আমার চিন্তাশক্তি কল্পনা ও আগ্রহকে এমন প্রজ্বলিত করেছিল যে আমি স্থির করলাম বাল্টিমোর থেকে তাঁর পদ্ধতি শিখে ফিরব'। তিনি পাভলভের সঙ্গে 1929 অবধি কাজ করেছিলেন, রুশ ভাষা শিখেছিলেন এবং 1928 সালে পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তের ওপর বক্তৃতাগুলিকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। 1929 সালে আমেরিকায় ফিরে গিয়ে এড্রলফ্ মেয়ারের আমন্ত্রণে তিনি হপকিন্সের 'ফিপস সাইকিয়াট্রি ক্লিনিকে' পাভলভীয়ান ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেন। সম্প্রতি এই পরীক্ষাগার রজত জয়ন্তী উদযাপন করল। ডাঃ গ্যান্টকে বলা হয় একজন আমেরিকাবাসী পাভলভপন্থী তিনি এই লেখায় ইংরাজীতে অনূদিত পাভলভের বিখ্যাত নির্বাচিত রচনাবলী সম্পর্কে নিম্নলিখিত আলোচনা করেছেন।]

এই বইটির বিভিন্ন অধ্যায় আছে— তার মধ্যে 30 পাতা জুড়ে আছে পাভলভের জীবনী, 3 পাতা পাভলভের আত্মজীবনী, 21 পাতা জুড়ে রয়েছে পাভলভের জীবনের শেষ 2 বছরে লেখা চিঠি এবং বক্তৃতা (একটি বাদে)। এছাড়া রয়েছে পৌষ্টিকতন্ত্র, রক্তসংবহন ও স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে একটি অধ্যায় (পৃঃ 65-74), পরিপাকক্রিয়ার ওপর বক্তৃতা (পৃঃ 83-129), শুরুমস্তিষ্কের স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপ এবং শর্তাধীন পরাবর্তের ওপর বক্তৃতা (পৃঃ 151-542), জীবনের শেষ কয়েক বছরে সাপ্তাহিক আলোচনাসভায় পাভলভের মন্তব্য (টীকাযুক্ত) (পৃঃ 551-619) ইত্যাদি। বইটি বহুমাত্রিক ও বহু-অংশে-সম্পাদিত হওয়ার জন্য এর প্রত্যেক অধ্যায়কে পৃথকভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন। পাভলভের জীবনী এবং জীবনের শেষ দুই বছরের বাদ্যই করা তাঁর চিঠি এবং বক্তৃতাগুলোকে একত্রে আলোচনা করা যায়।

জীবনীতে পাভলভের কাজ এবং জীবন সম্বন্ধে চমৎকার কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এটাও উল্লেখের বিষয় যে এই অধ্যায় এবং শেষ একশ পৃষ্ঠার অংশে যে রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা হয়েছে তা বোঝাতে চেয়েছে যে পাভলভ শুধুমাত্র একজন বড়মাপের বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তাঁর ধ্যানধারণায়, কাজকর্মে, চিঠিপত্রে ও আলোচনাসভায় মন্তব্যতে ধরা পড়ে যে তিনি বস্তুবাদী, পাশ্চাত্য বিরোধী আর্দশবাদের অর্থাৎ রাশিয়ার দর্শনের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন।

পাভলভের নিজের লেখা জীবনী পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর দৃষ্টিভঙ্গীতে পরস্পর বিরোধিতা আছে। সংক্ষিপ্ত চরিত কথা থেকে এটি সামান্য বড়, তৎসত্ত্বেও এটি পাভলভের জীবনের দ্বার খুলে দেয়। এর বাহুল্যবর্জিত বাক্‌কুশলতা দৃষ্টি আর্কষন করে। তাঁর শিক্ষকদের কাছে, স্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং বৈজ্ঞানিক জীবনের সাফল্যতে তাঁর সুখপ্রাপ্তি — এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এতে সাম্রাজ্যবাদী সরকার বলশেভিক সরকারের রাজনীতি সম্বন্ধে একটি কথাও লেখা নেই।

বইটির বেশি অংশেই পূর্বে প্রকাশিত পাভলভের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা আছে, যেমন পরিপাকতন্ত্রের কাজ (1898), শর্তাধীন পরাবর্তের ওপর বক্তৃতা (1928), শর্তাধীন পরাবর্ত ও মনোরোগ চিকিৎসাবিদ্যা (1941) ইত্যাদি। এই বিষয়গুলোর সবই ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ হয়নি, তবে এগুলি যথেষ্ট ভালভাবেই রাশিয়ার লেখকদের দ্বারা অনূদিত হয়েছে (রাশিয়ার অন্যান্য গ্রন্থের অনুবাদের তুলনায় অনেক ভাল)। যদিও পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তের ওপর বক্তৃতা (ভলিউম-1) এবং 2,

(ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স) ইংরাজী ভাষায় (ডবলিউ বি কানন ও বর্তমান লেখকের অনুবাদ) পাওয়া যায়, সংবেদন ও বুদ্ধিকারক স্নায়ুতন্ত্র এবং পরিপাক ক্রিয়ার ওপর তাঁরা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। এই বইতে প্রায় 500 পৃষ্ঠায় 1875 থেকে 1935 পর্যন্ত পাভলভের নিজের ভাষায় নিজের কাজের ক্রমবিকাশের সঠিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বই-এর এই অংশটির ওপর আমার মন্তব্য হবে শারীরবিজ্ঞান ও সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাভলভের অবদানের মূল্যায়ন। আমি স্বীকার করছি যে আমি প্রথমভাবে আমার মন্তব্যের প্রতি একপেশে মনোভাব রেখেছি। 1922-23 সালে রাশিয়ার দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্যে পাভলভের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি যেহেতু আমেরিকার ত্রাণকাজের প্রশাসনে মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত ছিলাম, তাই কয়েকমাসের মধ্যেই পাভলভের পরীক্ষাগারে গবেষণার কাজ শুরু করি। এই কাজ পরবর্তী ছয় বছর ধরে চালিয়ে নিয়ে গেছি। এরজন্য আমি পাঁচ বছর ধরে রাশিয়ান ভাষার অক্ষর থেকে শুরু করে সবটুকু শিখেছিলাম এবং তারপর পাভলভের দুটি বই ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলাম।

এই খণ্ডে পাভলভের যে ব্যক্তিগত চিত্র দেওয়া হয়েছে তা রাশিয়ার কাছে বোধগম্য হলেও সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসঙ্গত নয়। 'সিলেক্টেড ওয়ার্কাস' প্রকৃতপক্ষে একটি উপযুক্ত নাম, কারণ এর মধ্যে পাভলভের জীবন ও কর্ম ভালভাবেই বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। বাছাই করা কতকগুলো চিঠি ও কথোপকথনগুলো পড়ে মনে হবে তিনি একজন রাজনৈতিক দলের সমর্থক, একজন বস্তুবাদী ও পাশ্চাত্যবিরোধী ব্যক্তি। যে বড় খণ্ডটি রাশিয়াতে পাওয়া গেছে তা বাদ দেওয়া হয়েছে এখানে। তাতে প্রমাণ আছে পাভলভ বিজ্ঞানে রাজনৈতিক প্রভাবের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন—তা সেই রাজনীতি জার-এর হোক বা কোন দলনেতারই হোক। তিনি ছিলেন একজন উদ্যমশীল, উৎসাহী, অনুসন্ধানী বিজ্ঞানী যিনি সহকর্মীদের সঙ্গে কখনও সহমত ও কখনও ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সেই সহকর্মীরা রাশিয়ার হন বা ভিন্নদেশের হন, এটা নির্ভর করবে কোন তত্ত্বের ওপর তাঁরা কাজ করছেন তার ওপর। এই বই-এ তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের ভয়ানক লড়াই-এর উল্লেখ নেই। যে লড়াই তিনি করেছেন রাশিয়ার বিপ্লবের সময়ের আগে এবং জার-এর অধীনে ইমপেরিয়াল মেডিক্যাল একাডেমীতে কমরেড- এর সঙ্গে, ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে কমিউনিস্ট তত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন বলশেভিক বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে, এবং লেনিন ও স্টালিনের সঙ্গে।

পাশ্চাত্য আদর্শবাদ- এর প্রতি পাভলভের বিরূপতা দেখানোর জন্য, মার্ক্সবাদী তত্ত্বগুলোর প্রবক্তা হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করার জন্য তাঁর "বংশগতির অর্জিত বৈশিষ্ট্য"- এর তত্ত্বকে বিপরীত করে দেখানো হয়েছে।

নির্বাচিত রচনাবলী 34 নম্বর পৃষ্ঠার মন্তব্যে পাভলভ, এডিনবরার 1923-তে "বংশগতির অর্জিত বৈশিষ্ট্য" - এর বিষয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন তা আছে, কিন্তু পরে নিজেই তিনি সে কথা পরিহার করেছিলেন— তার উল্লেখ নেই। অপরপক্ষে বইতে আছে- "আমেরিকার জীনতত্ত্ববিদ মরগান 1924 সালে এই গবেষণা করেছিলেন এবং পাভলভের তত্ত্বের বিরোধীতা করেছেন" — যদিও বাস্তবে পাভলভ নিজেই তা করছিলেন, 1927 সালে তাঁর পূর্বের গবেষণাকে খুঁটিয়ে দেখার পর।

পাভলভ আমাকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক ভুল হল "অর্জিত অভ্যাসগুলো বংশগতিতে গৃহীত হয়"- এই তত্ত্ব প্রকাশ করা। বংশগতি সম্বন্ধে এই তত্ত্ব তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন যখন আসল গবেষণাটিকে আরও ভাল করে যাচাই করে নিয়ে ছিলেন, যদিও পাভলভের পক্ষে একবার জনসমক্ষে দেওয়া মতামতকে ভুল স্বীকার করা কঠিন কাজ ছিল।

তাই বলা যায় পাভলভের যে চিত্র এই বই - এ দেওয়া হয়েছে তা বিকৃত এবং অসম্মানজনক। তিনি যে কোন উৎস থেকেই উঠে আসা সত্য ও তত্ত্বকে গ্রহণ ও বর্জন করার মত নমনীয়তা দেখিয়েছেন আর ন্যায়নীতি ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সংগ্রাম - কোনটাই এই বই - এ প্রকাশিত হয় নি। পাশ্চাত্য দেশের চোখে তাঁকে রাশিয়ার সরকারের হাতের পুতুল হিসাবে দেখানো হয়েছে। অপরদিকে রাশিয়ার চোখে তিনি একজন সাধারণ নাগরিক যিনি একটিমাত্র ঘৃণের আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত। যতদূর আমি দেখেছি, এই বই-এ তাঁর ভুল মন্তব্যের পরিবর্তে কতকগুলি বাছাই করা মন্তব্য তুলে দিয়ে তাঁর চরিত্রের বিকৃত রূপ দেখানো হয়েছে। জীবনের শেষ দেড় বছর তিনি রাশিয়ার সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন তাদের বিজ্ঞানের প্রতি সমর্থনের জন্য। তিনি জানিয়েছেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়া বিজ্ঞানের বিষয়ে অনেক বেশি সাহায্য করবে। তাঁর এই

উক্তিকে আমি প্রায় সঠিক বলেই মনে করি, কারণ লেনিন- এর নীতিবাক্য ছিল যে একটি কমিউনিস্ট দেশে বিজ্ঞান সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পাবে, এবং পাভলভ ছিলেন রাশিয়ার একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক—যদিও কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নন।

রাশিয়ার বিজ্ঞানের প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর শেষ জীবনের মন্তব্যের বিপরীতে 1920-33 সালে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তা হল- "আমিও একজন পুরোহিতের সন্তান, তোমরা যদি পুরোহিতের সন্তানদের তাড়িয়ে দাও, আমিও চলে যাব" (পুরোহিতের সন্তানদের মেডিক্যাল কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করার প্রতিবাদে 1925 সালে যখন তিনি মিলিটারী মেডিক্যাল অ্যাকাডেমির শারীরবিজ্ঞানের চেয়ারটি পরিত্যাগ করেছিলেন)। "কারণ এই রকম গবেষণার জন্য আমি একটি ব্যাঙের পেছনের পাও বিসর্জন দিতে রাজি নই" (বিপ্লবসংক্রান্ত সামাজিক পরীক্ষানিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে 1923 সালে সর্বসমক্ষে তিনি এইরকম বক্তৃতা দিয়েছিলেন)। "যা তোমরা বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপারে করছ তার জন্য আমি রাশিয়ার নাগরিক বলে নিজেকে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করছি" (স্ট্যালিনকে 1927 সালে লেখা চিঠি)। এই তিনটি উদ্ধৃতি আমি আমার অপ্রকাশিত লেখা থেকে নিয়েছি।

আর বেশিদিন নেই যখন 20 কোটি রাশিয়ার নাগরিক এবং সব দেশের বৈজ্ঞানিকরা এই বিজ্ঞানীর (পাভলভ) সাহসিকতার গর্ব বোধ করবে, যে সাহসিকতায় তিনি বহু বাধা অতিক্রম করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। (যখন তাঁরা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হবেন তখন তাঁরা দেখতে পাবেন বিশে শতাব্দীর ধ্বজাধারী রাজনৈতিক দেশদ্রোহী তাঁবেদারদের গাড়িতে বসা জবরদখলকারী বিজ্ঞানীদের পরিবর্তে যেন গ্রানাইট পাথরে খোদাই করা তাঁর মূর্তি)।

পাভলভের বিকৃত ছবি যা রাশিয়ার গোড়া দল এই বই- এ প্রকাশ করেছে। তা যোক্তিসঙ্গত হলেওসম্পূর্ণরূপে মার্জনীয় নয়। কিন্তু ভালভাবে সম্পাদনা না করে প্রকাশ করা অবশ্যই অন্যায় হয়েছে। এটি রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের গ্রন্থানুভবতা ও সহনশক্তির অগৌরব প্রকাশ করেছে। অপরদিকে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের ব্যক্তিগত মতামতের প্রতি রাশিয়ার সরকারকেও সহনশীলতার জন্য যথেষ্ট খ্যাতি দিতে পারেনি। সরকারের উচিত পাভলভের ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া।

পাছে আমাকে দোষী করা হয় যে আমি কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়ছি, তাই এটা জানিয়ে দেওয়া ভাল যে আমাদের দেশেও বহু শতাব্দী ধরে গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও অবিচার, ভুল তথ্য প্রকাশ করা, সংবাদ- মাধ্যমের বিকৃতি দেখা যায়। আমার রাশিয়ান "ফিজিওলজি" এবং "প্যাথলজি" বই - এ আমি দেখিয়েছি যে রাশিয়ানদের নিন্দা করতে গিয়ে আমরাও সেই ভাল করে না জেনে কারও সম্বন্ধে মন্তব্য করা - র দোষে দুষ্ট।

•

কনটেমপোরারি সাইকোলজি

Vol. 2. Nov. 1975 No. 11

অনুবাদ: তাপসী বিশ্বাস

Oh world some power be giftie gie us

To see ourselves as other see us

রবার্ট বার্নস

With Best Compliments from:

TRIKO PHARMACEUTICALS

Makers of

CHLOROTAME
Tablets
CHLORPROMAZINE HCl I.P. 100 mg
TRIHEXYPHENIDYL HCl B.P. 2 mg

TRIKOTAME-5
Tablets
TRIHEXYPHENIDYL HCl B.P. 5 mg

SEIZOTOL-200
Tablets
CARBAMAZEPINE I.P. 200 mg

CLOMIDEP
Tablets
CLOMIPRAMINE HCl B.P. 10, 25 & 50 mg

ZECALM
Tablets
ALPRAZOLAM U.S.P. 0.25 & 1 mg

TRICAB-300
Tablets
LITHIUM CARBONATE I.P. 300 mg

MANABMON
R. N. No. A57062
Registered with the Registrar of Newspapers for India
WB/CC/0141/2010
শ্রাবণ ১৪১৭

With Best Compliments from

MICRO LABS LTD.

SYNAPSE DIVISION

No. 3, Queens Road, Bangalore

Our Specialities

Zotral
(Sertraline 50/100 mg)

Dothip
(Dothiepin HCl 25/75 mg)

Rispond
(Risperidone 1/2/3/4 mg)

Fludawn
(Fluoxetine 20 mg)

Nimocer
(Nimodipine 30 mg)

Lithium-SR (400mg)
&
(Lithium 300 mg)

Petril
(Clonazepam 0.5/2 mg)

[illegible]